লোকসঙ্গীত চর্চা

শীতল চৌধুরী

রূপা প্রকাশনী
৩৭/৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯

এই লেখকের অন্য গ্রন্থ ঃ

প্রবন্ধের বই ঃ

জীবনানন্দ অন্বেষা

আধুনিক বাংলা কবিতার নিবিড় পাঠ

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যভুবন

মোহিতলালের কবিতা ও তাঁর কাব্যের ঘর-উঠোন

নজরুল ও সঞ্চিতা ঃ বোধে ও মননে

রূপসী বাংলায় জীবনানন্দ ঃ ধ্যানে-চেতনায়

আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ বিচার-বিশ্লেষণ

কবি-আত্মা বিভূতিভূষণ ঃ শিল্প ও নির্মাণে

বাংলা ছোটগল্প ঃ মননে-দর্পণে

সম্পাদিত বই ঃ

আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ পাঠ-প্রস।

কবি ও কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য

কবিতার বই ঃ

একাকী অলৌকিক ক্রন্দন

সরল দর্পণে অঙ্গ

মহাকালের জানালা

নাচে বীজ কৃষ্ণপ্রেমে

সূর্যের বর্ণমালা

ছোটদের বই ঃ

উলান বেতুর

জাতকের সেরাগল্প

লেখকের কথা

আমার এ গ্রন্থটি কোনও গবেষণার ফসল নয়। তের-চোদ্দ বছর পূর্বে একসময় হঠাৎই লোকসঙ্গীতের নানান বই পড়তে পড়তে লোকসঙ্গীতের প্রেমে পড়ে যাই। মনের ভালো লাগা থেকেই আমার এ গ্রন্থ রচনা। পান্ডুলিপিখানা বার বছর ধরে বাক্সবন্দী হয়ে পড়েছিল। রূপা প্রকাশনীর চিরঞ্জীববাবু আগ্রহ প্রকাশ করাতে এবং তাঁরই নিষ্ঠায় পান্ডুলিপিটি গ্রন্থাকারে রূপ পেল। এ জন্য আমি উঁনার কাছে কৃতজ্ঞ।

আমার এ গ্রন্থখানা পাঠ করে কেউ যদি লোকসঙ্গীত চর্চায় নিষ্ঠাবাণ হয়ে কোনও গবেষণাধর্মী কাজে ব্রতী হন, তাহলে আমার এ 'লোকসঙ্গীত চর্চা' গ্রন্থটিব প্রকাশ সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আশা করি, আমার এই 'লোকসঙ্গীত চর্চা' গ্রন্থখানি লোকসঙ্গীত-প্রেমীদেব একেবারে নিরাশ করবে না। তাঁরা খুঁজে পাবেন এক নতুন মনের খোরাক - লোকসঙ্গীতের এক চিরন্তনধারা কিভাবে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি নিয়ে আবহমান কাল ধরে ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধের সঙ্গে পরিবর্তিত ও পরিশীলিত করে চলেছে।

শীতল চৌধুরী

সূচিপত্র

হাপু গান

হাপু গান হলো বীরভূম জেলার এক লোকসঙ্গীত। হাপু গানের ব্যাপক প্রচলন জেলায়-জেলায় না থাকলেও এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। 'ছত্রাক' পত্রিকার টুসু সংখ্যায় (১৩৮৮) মুহম্মদ আয়ুব হোসেন "রাতের হাপু গান" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে হাপু গানের নামকরণ সম্পর্কে বলেছেন, 'হা' আর 'পু' এই দুটি মাত্রার বিশেষ ব্যবহার হয় এই গানে, সেই কারণেই এই গানের নাম 'হাপু'। 'হা' অর্থাৎ হাহাকার, দুঃখ ও অভাব। যে 'হা ভাতারী' যার ভাতার বা স্বামী নাই, 'হা ঘরে' যার ঘর নাই। 'পু' বা 'বু' শব্দে (অঞ্চলভেদে হাপু গান 'হাবু' নামেও পরিচিত) পূরণ বোঝায়: 'হাপু' বা 'হাবু' তাই দুঃখ বা হাহাকারের বর্ণনা। দুঃখে হাপুরী ডুপুরী হয়ে কাঁদে। দুঃখ ও বেদনার কথা দ্রুত তালে বর্ণনা হল হাপু। হাপুর শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপও হতে পারে হাপু।

হাপু গানকে দুঃখ-বেদনার ও হাহাকারের গান বলা হলেও লেখক মুহম্মদ আয়ুব হোসেনের আরো কিছু কথা থেকে যা বুঝতে পারা যায় তাতে হাপুগানকে হাহাকার ও দুঃখ-বেদনার গান বললেও কিন্তু হাপুগানে যে মূল সুরটি ধ্বনিত হয় তা হল প্রতিবাদীর সুর। লেখক হোসেনের অভিমত হল, রাঢ় বাংলার বুকে আদিম মানুষের উত্তর পুরুষেরা গঙ্গা, ভাগীরথী, অজয়, দামোদর, কোপাই প্রভৃতি নদীর তীরে সমবেত হয়ে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে যে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল, এবং পরবর্তীকালে আর্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিতাড়িত হন এবং অধিকৃত উদ্ধার করা জমি হারান। এর পরিণামেই সেই বাস্তুচ্যুত হতভাগ্যেরা আজও অনিশ্চিতভাবে যাযাবরের মতন জীবনযাপন করে চলেছে। বলা যায়, এই যাযাবর শ্রেণীর মানুষদের ওপর যে অন্যায় ও অবিচার করা হয়েছিল হাপুগানে তারই প্রতিবাদ শুনতে পাওয়া যায়। লেখক মুহম্মদ আয়ুব হোসেন তাঁর বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঐতরেও আরণ্যক থেকে শ্লোক উদ্ধার করে দেখিয়েছেন আর্যদের দৃষ্টি বঙ্গ, ব্যাধ, ও চেরাপদ নামে তিনটি জাতির বিনষ্টির কথা। তাঁর মতের পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নিতে হয় (লেখকের মত অনুসারে) এই তিনটি জাতিই যাযাবর শ্রেণীর জীবনযাপন করতে একরকম বাধ্য হয়।

তবে, হাপুগানের পরিবেশনের মধ্যে প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয় ঠিকই, সেটা কিন্তু চূড়ান্ত নয়। কারণ হাপুগানের ভাষায় তেমন জোড়াল প্রতিবাদী সুর সোচ্চার নয়।

হাপুগানের পরিচয় সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর "বাংলার লোকসাহিত্য" গ্রন্থের ১ম খন্ডে বলেছেন --- "সাধারণতঃ দুইজন লোক একসঙ্গে এই গান গাহিয়া থাকে। একজনের হাতে মদিরা বা গোপীযন্ত্র থাকে, আর একজনের হাতে ছোট একখানি লাঠি থাকে। লাঠিধারী লোকটি গান গায় এবং তাহার সঙ্গী লোকটি ধুয়া ধরে।

গাহিবার পদ্ধতিটি একটু অদ্ভুত। এক পদ করিয়া গান গায়, আর মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া নিজের পিঠেই লাঠি দিয়া তাল ভাঁজে। অবিশ্রাম লাঠি চালনার ফলে অনেকের পিঠেই কালশিরা দাগ পড়িয়া যায়। কতকটা নমস্কারের ভঙ্গিতে লাঠিটাই হাত দিয়া ধরিয়া থাকে।'' এরপর ডঃ আশুতোষবাবু একটি গানের উল্লেখ করেন। সেই গানটির সম্পর্কে লেখকের অভিমত হলো, ''গানের নাম যে কেন হাপুগান হইল, কিংবা হাপু শব্দের তাৎপর্য যে কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।'' তাঁর মতে, ''এই গান বীরভূমে যে খুব ব্যাপক তাহাও বলিবার উপায় নেই।''গানটি এখানে উল্লেখ করছি —

একই বিলে চরে পাখী অন্য বিলে ধায়।
চল্যা যাবার কালে পাখীর ফাঁদ বাধিল পায়
ও হায় হায়।।
পাখী না পিথিমি চেনে আসমানে তার বাসা।
কার খোঁজে না বিলের জল করে যাওয়া আসা।
ধর্‌তে পার্‌লে ছাঁদন বেড়ী দিতাম গো তার পায়।।
ও হায় হায়।।
আল্লা আল্লা বুলো রে বান্দা ভাত নাইক ঘরে।
টুপি দিয়া ইমান ঢাক্যা বাগুন চুরি করে।।
তারে ধর্‌ব কেমন করে।।
নিমক হারাম প্যাটের ক্ষুধা নাইরে সরম তারে।
দু'দিন বাদে নিভ্‌লে বাতি তামাম অন্ধকারে।।
সন্দ কিবা তার।।

ডঃ আশুতোষবাবু যাই বলুন না কেন, উক্ত গানটির দিকে দৃক্‌পাত করলে কিন্তু মুহম্মদ আয়ুব হোসেনের কথার সমর্থন মেলে হাপুগান হাহাকার ও দুঃখ - বেদনার গান। উপরিউক্ত গানটির মধ্যে বিষন্নতার হাহাকার যেমন ধ্বনিত হয়েছে, তেমনি যাযাবর শ্রেণীর মানুষদের দুঃখ-বেদনার কথাও প্রতিফলিত হয়েছে। 'নিভ্‌লে বাতি তামাম অন্ধকারে' কথা কটির মধ্যে যা তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে বলা যেতে পারে। আবার 'ও হায় হায়' কথা কটির প্রয়োগেও গানটির মধ্যে গভীর দুঃখ ও হাহাকারের রূপকে তুলে ধরা হয়েছে লঘু হাস্যরসপ্রিয়তার মাধ্যমে। আবার, 'ধর্‌তে পার্‌লে ছাঁদন বেড়া দিতাম গো তার পায়' এই পংক্তিটির মধ্যে মনের ক্ষোভ ও জ্বালা প্রকাশ পেয়েছে। তবে প্রতিবাদীর সুর এই গানটিতে তেমন তীব্রভাবে প্রকট হয়নি।

হাপুগানগুলিতে কিন্তু ছড়ার প্রভাব বেশ চোখে পড়ে। অনেকসময় ছড়ার মতন

অসংলগ্ন চিত্রের পরিবর্তে অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে একরকম ধারাবাহিকতা বজায় থাকতে দেখাযায়। হাপুগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো হাপুগানে একরকম সরস কৌতুক ও মজা আছে। অবশ্য অন্যান্য লোকসঙ্গীতের মতন হাপুগানেও সমসাময়িক সমাজ জীবনের নানা চিত্র প্রতিফলিত হয়ে থাকে। মুহম্মদ আয়ুব হোসেন তাঁর "রাঢ়ের হাপুগান" শীর্ষক প্রবন্ধে যে পনেরটি হাপুগান লিপিবদ্ধ করেছেন, সেখান থেকে কয়েকটি গান দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে তুলে ধরছি। যা থেকে সহজেই আমরা সমসাময়িক সমাজের ছবি যেমন পাই, তেমনি পাই দেশের, বিশেষ করে গ্রাম-বাংলার অর্থনৈতিক একটা পরিকাঠামোর ছবি ও রাজনৈতিক জীবনের একটা আনুমানিক প্রেক্ষাপট। যেমন —

১. উলকীতে পালকী আঁকা
বুলবুলিতে খায়।
ছেলের নামে বিচেন পেড়ে
নিজে ঘুম যায়।

২. চাষা বোয়ের কচুর গেড়ো
বামুন বোয়ের আধুলি,
শ্যোকরা বোয়ের কাছকে গেলে
গলা বেড়া মাদুলি

৩. বাবুর বিটি ফেরেঙ্গা ঝুটি
কাঁইচি কাটা চুল,
অবেলাতে যাচ্ছে কোথাও
ডুমুরের ফুল।

৪. ভারতে আর পাকিস্থানে লড়াই
দেখ লেগেছে।
বোমা তৈরী করেছে।
সেই বোমা ছুটে এসে পাড়া গাঁয়ে
পড়েছে।
ছেলেদের চোখে দেখ জয় বাংলা
হয়েছে।

ডাক্তারখানা গিয়েছে,

গরম জলে তুলো দিয়ে

শ্যাক করতে বলেছে।

লঘু পরিহাসপ্রিয়তা বা নেহাৎই কৌতুক ও মজা যে হাপুগানে কত ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে তার কিছু নিদর্শন রাখছি মুহম্মদ আয়ুব হোসেনের প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ গানগুলি থেকে ---

১. বউ কেমন ভালো,
উটকো মুখী খাঁদ্যা নাকী
মোষের মতন কালো
তাই আমার ভালো।

২. বড় বৌ বড়ালের ঝি
তাকে বলতে পারি কি?
ছোট বৌ মরিচের গুঁড়ো,
সর্বলোকের পরান জুড়ো
ও মেজ বৌ, ও ন বৌ
যা রেঁধেছ, তাই খেয়েছি
খেড়োর ঝালে, কচুর শাকে
দাও নি নুন
কত গা'ব তোমার গুণ।

৩. তাল গাছে শালিক নাচে
বাইরে নাচে পেঁচা
মাগীদের শাড়ী পরে
মিন্‌সে দোলায় কোঁচা।

এই গানগুলিতে অনেকটা লিমেরিক জাতীয় মজা আছে। এরকমই আধুনিক ছড়া সাহিত্যে নজরে আসে। হাপুগানের মতন লঘু পরিহাসপ্রিয়তা ও কৌতুক এবং মজা আমরা বিশেষ করে পাই বাংলার দুই আধুনিক ছড়াসাহিত্যের রূপকার সুকুমার রায় ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়াতে। এখানে নিদর্শনস্বরূপ অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি লিমেরিক থেকে দৃষ্টান্ত রাখছি:

বাঙালীই বটে টমবাবু
ছেলেটি কি তাঁর কম বাবু!
এই বয়সেই বৎস
সারাবেলা ধরে মৎস্য
বলিহারি তার দম, বাবু!

ছড়ার ঢঙও যে হাপুগানে লক্ষ্য করা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ মুহম্মদ আয়ুব হোসেনের লিপিবদ্ধ গানগুলি থেকে তুলে ধরছি। যেখানে হাপুগানের শরীরটাই পুরোপুরি ছড়ার বলা যেতে পারে। যেমন ---

১. জামাই এলো কামাই করে
খেতে দিব কি?
হাত বাড়িয়ে দাও গামছা
মুড়কি বেঁধে দি
উড়কি ধানের মুড়কি দেব
পাতে জল খেতে।
জ্যোষ্ঠি মাসে ছাতা দেব
রোদে পথে যেতে

২. ইলিক মিলিক শুলুকু টি
বড় শালুকের ফুল
এমন ঘরে দিওনা বিয়ে
ব্যাঙে টানে চুল।
ব্যাঙে করে ওড়ুর গাড়ুর
কুচে করে হরি,
হাজার টাকা দিয়ে পুকুর
লোকের জ্বালায় মরি।

উপরিউক্ত প্রথম উদাহরণটির পঞ্চম পংক্তিটির ব্যবহার অন্নদাশঙ্করের ছড়ার বইয়ের নামকরণে লক্ষ্য করা যায়। অন্নদাশঙ্করের ছড়া - গ্রন্থটির নাম -- 'উড়কি ধানের মুড়কি'। বাংলা ছড়াসাহিত্য জগতের খুব কাছাকাছি যে হাপুগানের অবস্থান তা বলা বোধকরি সঙ্গত হবে। বরং এভাবে বলা ভালো, হাপুগান বাংলা ছড়া সাহিত্যকে বেশ সুগভীরভাবেই প্রভাবিত করেছে।

হাপুগানে কত ব্যাপকভাবে ইংরেজদের অনাচার - অবিচারের কথাও যে উঠে এসেছে তাও লক্ষ্য করা যায়। ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বৈদগ্ধ্য' পত্রিকার ৪র্থ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় (১৯৮২) "অষ্টাদশ শতকের মঙ্গলকাব্যে ও লোকসাহিত্যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপাখ্যান" শিরোনামে যে দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে তিনি লোকসাহিত্যে সমসময়িক যুগের ইতিহাসের ছায়াপাত ঘটার প্রসঙ্গে হেষ্টিংস-এর আমলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা চন্ডাল গড় থেকে শালিখা একটি রাস্তা তৈরীর জন্য বলপূর্বক বেগার খাটানোকে উদ্দেশ্য করে রচিত 'হাপু' গানের উল্লেখ করেছেন।

হাপুগানের মতন হাস্য পরিহাস আধুনিক বাংলা নাটকেও লক্ষ্য করা যায়। গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের ১ম অঙ্কেই তা লক্ষ্য করা যায় ---

বাঁয়ে শেয়াল ডাইনে ষাঁড়।
খেজুর গাছে ঝোলায় ভাঁড়।।
তিন প্রহরে জন্মে ছেলে
একেবারে ওঠে মটকায় ঠেলে।

এরকম হাপুগানে লঘুপরিহাসপ্রিয়তা যেমন আধুনিক নাটকে লক্ষ্য করা যায়, তেমনি হাপুগানে যে বেদনা ও হাহাকারের রূপ এবং প্রতিবাদী সুর বা মনের ক্ষোভ ও জ্বালা দেখা যায় তাও আধুনিক বাংলা নাটকে উঠে এসেছে কখনো গীতের মাধ্যমে, কখনোবা ছড়ার সংলাপে।

তবে, হাপুগানের মতন দুঃখবাদ বা হাহাকারের সার্থক প্রয়োগ আমরা বাঁশপাহাড়ীর লোকগীতির মধ্যে পাই। যেমন ---

আমার দুঃখে দুঃখে জনম গেল,
আমার দুঃখ বিনে সুখ হলো না।

হাপুগানের মতন দুঃখ ও বেদনার হাহাকার বাঁশপাহাড়ীর গানে প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। দুঃখ ও বেদনাই যে শিল্পীর জীবনে, কি মানুষের জীবনে আত্মশুদ্ধি ঘটায় -- এ বোধ সম্ভবত হাপুগানের রচয়িতা ও বাঁশপাহাড়ীগানের রচয়িতারা উপলব্ধি করেছিলেন বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা। এ কারণে শিল্পের উৎকর্ষতায় হাপুগান হৃদয়কে সহজেই নাড়া দেয়। হাপুগানের বেদনা বৃহৎ মানুষদের ছুঁয়ে যায়। হাপুগানের শিল্পগুণ ও বিশেষত্ব এখানেই। শব্দ প্রয়োগেও সাবলীল। সহজ-সরল শব্দের ব্যঞ্জনায় এক-একটি চিত্রকল্প গড়ে ওঠে। সহজ কথায় মনের দর্পনটিকে পরিষ্কার তুলে ধরে। সমসাময়িক ঘটনা, কি অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর চালচিত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ঘটনা হাপুগানে যেভাবে, সহজ কথায় উঠে এসেছে তা চমৎকার। এককথায় বলা যায়, উল্লেখযোগ্যতার দাবি হিসেবে চিহ্নিত না হলেও হাপুগান একেবারে ফেল্‌না নয়। সাহিত্যগত মাপকাঠিতে একেবারে অচ্যুত নয় আর কি!

ভাদুগান

ভাদ্রমাসের প্রথম দিনে অধিবাসী কুমারীরা গৃহে একটি মৃন্ময় নারী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভাদ্রমাসের আগমনী যে গীত গেয়ে থাকে তাকে বলে ভাদুগান। খুশী মনে গাওয়া হয় সেই আগমনী গীত -- 'আদরিণী ভাদুরাণী এল আজি ঘরকে'। যে মৃন্ময়ী নারী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা হয় সেই হলো ভাদুরাণী। ভাদুরাণীর আগমনী উপলক্ষে নানাভাবে মনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ যে প্রকাশ করা হয় তা নানা ঢঙের গীতরচনায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এখানে একটি আগমনী গীত উল্লেখ করছি ---

আঁখ বাড়িতে ঢাক বাজিয়ে ঐ আসিছে ভাদুধন
দেখ্ দেখিরে ব্রজের বালা কতদূরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনের বন্ধু তুমি বৃন্দাবনে বাস কর
কেবা তোমার মাতাপিতা কার বা তুমি আশা কর।
কার ঘরে গিয়েছিলে, মা, কে কর্য়েছে সেবা গো।
হাতে মায়ের রক্ত চন্দন গলে জবার মালা গো।

বাঙালী জীবনে বৈষ্ণব প্রভাব যে কত সুগভীর ব্যাপ্তিলাভ করেছিল, এমনকি সমাজের নিম্নস্তরেও তার লক্ষণের তীব্রতা যে কত ব্যাপক -- তা ভাদুগানেই লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু ভাদুগান মূলত আদিবাসী কুমারীগণের গান, সেখানেও 'কানু ছাড়া গীত নাই, বৃন্দাবন ছাড়া দেশ নাই' -- বৈষ্ণবদের এই তত্ত্ব অবলীলায় ঢুকে পড়েছে। উপরিউক্ত উদাহরণটিতেই তা লক্ষণীয়। ভাদু তাই ব্রজধাম থেকে বাঙালীর গৃহে আসছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যে কটি কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে (বাংলার লোকসাহিত্য ৩য় খন্ড) --"কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার মাতাপিতার সন্ধান জানিতে পারা যায় না। সুতরাং এই ব্রজধাম ভাগবতের কিংবা বৈষ্ণব পদাবলীর ব্রজলোক নহে, বরং তাহার পরিবর্তে প্রবাসের যে কোন স্থান হইতে পারে।

ভাদু যেন প্রবাস হইতে আগতা বহুদিনের প্রত্যাশিতা কোন আত্মীয়া। গৃহে ফিরিবামাত্র তাহাকে পথের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করা হইল।"

যদিও ভাদুগান প্রধাণত কুমারীমেয়েদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হলেও, বিবাহিত আদিবাসী মেয়েরাও এ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে থাকে। ভাদ্রমাসে প্রথম দিনে শুরু হয়ে সমস্ত ভাদ্রমাস ব্যাপি এই ভাদুগান গাওয়া হয়ে থাকে। ভাদুগান সঙ্গীত সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতে,"ভাদুগান রাঢ় অঞ্চলের বর্ষাকালীন সঙ্গীত"। এই গানগুলি সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন (বাংলা লোকসাহিত্য ঃ ৩য় খন্ড) তা প্রণিধান যোগ্য -- "ভাদুগান কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের স্মৃতি - সঙ্গীত নহে, ইহার মধ্যে পারিবারিক ও ব্যক্তি - জীবনের সকল সুখদুঃখ আশা -

আকাঙ্ক্ষার কথাই প্রধাণতঃ শুনিতে পাওয়া যায়; ইহা এই অঞ্চলের কুমারী-জীবনের গান, তাহাদের জীবনস্বপ্ন ইহার ভিতর দিয়া রূপায়িত হইয়া উঠে। ভাদ্রের ভরা বর্ষার প্রকৃতিকে একটি কুমারী নারীরূপের মধ্য দিয়া ধ্যান করিয়া তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া বাস্তব জীবনের নানা কাহিনী ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। সেইজন্য ইহার মধ্যে ধর্মের কথা যেমন নাই, ব্যক্তিবিশেষের জীবন-কথাও প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই; ইহার মধ্যে যাহা আছে, তাহা কুমারী-জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, জীবন সম্পর্কে তাহাদের অপরিণত অভিজ্ঞতার কথা; কঠিনতর বাস্তব জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে তাহার সম্পর্কিত তাহাদের আশার কথা; সুতরাং ইহা প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবনের কথায় সরস, অশরীরী কোন আত্মার আলোক প্রশস্তিবাচন মাত্র নহে, তাহা হইলে ইহা এত জীবন্ত হইতে পারিত না।''

ভাদুকে উপলক্ষ করে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসাটি ভাদুগানে যে রূপাঙ্কিত হয়েছে তা বেশ সুন্দর, অনেকটা কথকতার মতন --

ওগো, ভাদুমণি, শুন বলি তুমি,
কেমন করে এলে পথে কোন কষ্ট হ'ল কি।
এস বোস আসনে আগে কুশল বল শুনি,
তার পরেতে মুখ হাত ধুয়ে
তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে
সাজা গুজা করবে চল এখনি।
সবাই আসবে দেখতে তোমায় কত রকম খাবার হাতে নিয়ে
কত রকম গান শোনাবে সুরে সুরে ঘাড় লাড়িয়ে।।
সারা রাত গান শুনিয়ে নানারকম খাবার দিয়ে মন ভুলিয়ে
সকাল হলেই দেবে বিদায় তোমাকে

উপরিউক্ত ভাদুগানে লক্ষণীয় ব্যাপারটি হলো, পরম আত্মীয়বোধ। যা ভাদুগানের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ বলা যায়। ভাদুগানে ভাদুর সঙ্গে তাই মানুষের কোন পার্থক্য থাকে না। ভাদুগানে বিশেষ করে যেটা লক্ষ্য করা যায় তা হলো, দেবীকে ভাদুগানে যেমন একেবারে সাধারণ মানবীরূপে হাজির করা হয়েছে -- তেমনি আবার সাধারণ নারীকে করা হয়েছে দেবী। ভাদুগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানেই। বলা যায় ভাদুগানে বাংলার নারীসমাজেরই প্রতিচ্ছবি ফুটি উঠেছে অধিক বাংলার নারী যেন নিজেরই রূপকে পূজো-অর্চনা করেছে। ভাদুগানগুলির নিবিড় সংলাপের দিকে লক্ষ্য রাখলে যে সত্যটি স্পষ্ট হয় তা হলো -- ভাদুরাণীর সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা। এমনকি, ভাদুকে ঘিরেই মেয়েদের আবদারও শোনা যায়। ভাদু যেন সকল নারীসমাজের সুখ-দুঃখের ভাগী, আপনজন। ভাদুর আগমনের জন্য প্রতীক্ষার মধ্যেও তাই অনাবিল আনন্দ ও একইসঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা বোধের তীব্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় --

আয়লো সজনী, সাজালো সজনী দাসী হয়ে পদতলে রই,
বাসি ফুলের মালা, লও চিকনকালা ভাদুধন কুঞ্জে এল কই।
এস ভাদুমণি চরণ দু'খানি পূজিব তোমায় সাদরে
তব রূপখানি ভুবনমোহিনী আলো করে কত আঁধারে।
সারাদিন ঘুরি কত ফুল তুলি এনেছি সাজি ভরিয়া
তোমার লাগিয়া বছর ধরিয়া আশা করি কত আমরা।

উপরিউক্ত ভাদুগানটির প্রথম পংক্তিতে 'সজনী' শব্দটির দু-বার প্রয়োগে যে নিবিড় আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে -- ঠিক এমনি 'সজনী' শব্দটির দু-বার প্রয়োগ একালের আধুনিক কবি জয় গোস্বামীর 'প্রণয়গীতি' কবিতাটিতে করেছেন ভাদুগানের ঢঙেই - ' ওই কোলে ঠাঁই দাও সজনী ও সজনী'।

দেবী হিসেবে অবশ্য ভাদুর উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি কাহিনী প্রচলিত আছে। শ্রী শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের কাহিনীটি এরূপ ---

একদিন কৈলাসপতি শিবের কাছে দেবী দুর্গা উড়িষ্যায় গিয়ে জগন্নাথ দর্শনের জন্য অনুমতি চাইলেন। শিব সে অনুমতি দিলেন না। দুর্গা তখন অভিমানে স্বামীগৃহ ত্যাগ করলেন। দেবী দুর্গার উপাসক মানভূমের পঞ্চকোটের রাজা জটালেগরুড় গভীর অরণ্যে শিকার করতে গিয়ে একদিন দেখলেন একটি সুন্দরী বালিকা একা একা অরণ্যে বসে কাঁদছে। রাজার কোন সন্তান ছিল না। তিনি সুন্দরী বালিকাটির মায়ায় পড়লেন। অসহায় বালিকাটিকে তাই রাজপুরীতে নিয়ে এসে নিজের কন্যার মতন আদর যত্ন করতে লাগলেন। বালিকাটির নাম রাখলেন 'ভাতু' বা 'ভাদু'। বালিকা বয়সেই ভাদুর শিব ভক্তি ও দীন-দরিদ্রের প্রতি দয়া মায়া দেখে রাজা-রাণী খুব খুশী হলেন। খুশী হল দেশবাসীও। ক্রমে ভাদু বড় হলে রাজা ও রাণী ভাদুর বিয়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু কিছুতেই বিয়েতে ভাদুকে রাজী করানো যায় না।

ওদিকে কৈলাসে দুর্গার বিরহে শিব প্রায় শয্যাশায়ী। দেবতারা শিবের অবস্থান নিরীক্ষণ করে খুব ভাবনায় পড়লেন। সকলের শলা-পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে কোন ভাবে দুর্গাকে কৈলাসে ফিরিয়ে আনতে হবে। দুর্গাকে ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব দেওয়া হল নারদকে। মহর্ষি নারদ সংবাদ পেলেন দুর্গা ভাদুরূপে পঞ্চকোটের রাজকুমারী হয়ে আছেন। নারদ আর কালক্ষেপ না করে পঞ্চকোটে গেলেন। পঞ্চকোটে পৌঁছেই নারদ হরিগুণ গায়ক বৃদ্ধরূপে ভাদুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রণ পেলেন রাজবাড়িতে তাঁর গান শোনাবার। সেখানে তিনি গোপনে ভাদুকে নিজের পরিচয় দিয়ে দুর্গার বিরহে শিবের করুণ অবস্থার কথা সব বললেন। দেবতাদের সবার অনুরোধের কথাও শোনালেন। ভাদুরূপী দুর্গা সব অভিমান

ত্যাগ করে কিভাবে এখান থেকে যাওয়া যায় সে বিষয়ে শলা-পরামর্শ করলেন নারদের সঙ্গে। রাজা ও রাণীকে সব কথা বলে কৈলাসে না যাওয়াই ভালো ঠিক হলো।

এদিকে দেবতাদের নির্দেশে সুবর্ণরেখা নদীর পাশে, দলমার কাননে বিশ্বকর্মা একটা সুন্দর প্রাসাদ তৈরী করলেন। পঞ্চকোটের নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে দলে দলে সেই প্রাসাদ দেখবার জন্য ছুটে চললো। ভাদুও আবদার করলো সে ঐ প্রাসাদ দেখতে যাবে। স্নেহ বশত রাজা অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাবার অনুমতি দিলেন। ঠিক হলো, ভাদুর সঙ্গে যাবে বহু দাস-দাসী ও লোকলস্কর। অবশেষে দলমার কাননে দলবল সঙ্গে নিয়ে ভাদু উঠলো। তারপর হঠাৎই দেখা দিল এক ভয়ংকর ঝড়। ঝড় ও বৃষ্টির বেগ এতই তীব্র হয়ে উঠলো যে ভয় পেয়ে ভাদুর সঙ্গে আসা সব লোকজন সেপাইসামন্ত, দাস-দাসী, সব নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ভাদুর দিকে কারোরই খোয়াল নেই। তাল বুঝে ভাদুও তৎক্ষণাৎ কাছের একটি জলাশয়ে ঝাঁপ দিল। কেউ দেখতে পেল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় থামল, ভাদুর খোঁজও পড়লো। অনেক খোঁজাখুঁজি হলো। কিন্তু কেউ তার সন্ধান পেল না। অগত্যা রাজপুরীতে ফিরে এসে রাজা ও রাণীকে ভাদুর নিখোঁজ হবার কথা জানান হলো। ভাদুর অন্তর্ধানে রাজা ও রাণী খুব গভীর ভাবে মর্মাহত হলেন। একেবারে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়লেন।

কৈলাসে বসে দুর্গা পেলেন সে খবর। খবর পেয়েই দুর্গা রাজা ও রাণীকে শান্ত করতে শিবকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে এলেন পঞ্চকোটে। সেদিনটি ছিল ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি। শিবকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গা রাজাকে দেখা দিয়ে বললেন, তিনিই ভাদুরূপে কন্যার মতন এতদিন তাঁর কাছে থেকেছেন। এই কথা শুনে এবং শিব দুর্গা দর্শনে ভাগ্যবান রাজার আর আনন্দের সীমা রইল না। এই উল্লেখযোগ্য ঘটনাটিকে চিরস্থায়ী করে রাখবার কামনায় ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিনে রাজা চালু করলেন ভাদু উৎসব। ধীরে ধীরে এই ভাদু উৎসবই ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

ভাদুর আর একটা কাহিনী বর্ণনা করেছেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের কাহিনীটি এরকম ---

বাংলাদেশের বন অঞ্চলে ছিলেন এক রাজা। রাজার মেয়ে ভাদু ভাদ্র মাসে জন্ম বলে ভাদু। সেই মেয়েটি ছিল রূপলাবন্যে অপ্সরীর মতন সুন্দরী। রাজার বাড়িতে ছিল যুগল বিগ্রহ। মেয়েটির ছেলেবেলা থেকে ছিল সেই ঠাকুরের প্রতি গভীর অনুরাগ। ক্রমে মেয়েটি বড় হলো, যুবতী হয়ে উঠলো। যথারীতি বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগলো। কিন্তু কোনো সম্বন্ধই তার পছন্দ হলো না। নানা অছিলায়-ছুতোয় ভাদু সম্মতি দেয় না। বিয়ের জন্য তাকে জোর করলে সে কাঁদত, এমনকি আহার নিদ্রাও বন্ধ করে দিত। লোকে এই জন্য বলাবলি করতে আরম্ভ করলো, নিশ্চয়ই মেয়ে কাউকে ভালো বাসে। লোক মুখে এসব কথা কানাঘেঁষা

শুনে বাবা মায়েরও মনে সন্দেহ দেখা দিল। গোপনে তাই মেয়ের দিকে নজর রাখলো। অবশেষে তারা জানতে পারলো রাজকন্যা ভাদু গভীর রাতে ঘরে থাকে না। দাস-দাসীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে রাজা নিজে পরখ করে দেখলেন রাত দ্বিপ্রহরে মেয়ে রাজবাড়ির খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে ঠাকুর বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। রাজা সেদিন আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন, তখনও মন্দিরের দরজা খোলা, ঘরের ভেতর প্রদীপ জ্বলছে। কন্যা সেই ঘরে ঢুকল, তৎক্ষণাৎ মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। রাজা কালক্ষেপ না করে তৎক্ষণাৎ সতর্ক পায়ে দরজার কাছে এসে বন্ধ দরজায় কান পাতলেন। কান পেতে রাজা শুনতে পেলেন মন্দিরের ঘরের ভেতর থেকে খিলখিল হাসির আওয়াজ। মেয়ের হাসির সঙ্গে পুরুষ কণ্ঠের হাসিও। তারপর শুরু হলো নাচগান। মেয়ে নাচছে,গাইছে। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে দরজায় ঘা দিতেই সব স্তব্ধ হয়ে গেল।

রাগে উন্মত্ত রাজা তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান যেন হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি ভেবেছিলেন বোধ হয় মন্দিরের পাপিষ্ঠ পুরোহিতের সঙ্গে মেয়ের প্রেমালাপ চলছে। ক্রোধে এমনই উন্মত্ত হয়ে উঠলেন যে তৎক্ষণাৎ ছুতোরকে ডেকে দরজা ভাঙালেন। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে রাজা দেখলেন ঘরে আছে কেবল বিগ্রহ। আর সেই বিগ্রহের সামনে কন্যার নিথর দেহ।

রাজা তারপর রাজবাড়িতে যুগল বিগ্রহের পাশে ভাদুরাণীর মুর্ত্তি স্থাপন করেছিলেন। সেই মুর্ত্তি আজও আছে। সেই সঙ্গে ভাদুর পূজার প্রচলন হয় সারা দেশে। ভাদু ভালোবাসতেন নাচ ও গান। ঐ নাচ-গানেই নাকি ঠাকুর ভুলেছিলেন।

এই কাহিনী দুটি মূলত জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী লোকসমাজ থেকে উদ্ভুত হয়েছে বলা যেতে পারে। আমরা জানি, অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস চলে আসছে আদিম কাল থেকেই। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান লোকসমাজ সমান ভাবে ধর্ম ও জাদুবিদ্যাকে গ্রহন করেছিলেন নিত্যকার সহায় হিসাবে। অবশ্য একথা বিশ্বের সমস্ত লোক সমাজের ক্ষেত্রেই ঘটে। যাইহোক --- ভাদুকে নিয়ে স্বপ্নও যেমন রচনা করা হয়েছে গীতকথায়, তেমনি পূজোর আসনে অধিষ্ঠিত করেও ভাদুকে কুমারী মেয়েরা কোনো ভাবেই নিজেদের কাছ থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারেন নি। তাই একারণে ভাদুকে ঘিরে মনোরাজ্যে কোনো আধ্যাত্মিক স্বপ্নসৌধ গড়ে ওঠেনি। ভাদুকে তাই মাটির কাছে নামিয়ে এনে গার্হস্থ্যজীবনের সুখ দুঃখের কথাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। স্বপ্ন যা দেখেছেন তা নেহাতই বাস্তবজীবনের ছবি। স্বপ্নের মধ্যে যে ছবি ফুটে উঠেছে তা নিজেদের আকাঙ্ক্ষিত মনোবাসনার কথা। আধ্যাত্মিকতার সেখানে কোন স্থান নেই। যেমন ---

বদন ভরিয়ে একবার হরি বল মন
ভাদুর সঙ্গে যাব মোরা, এরোপ্লেন রথ দেখিতে,
ঐ পথেতে কলকাতাতে দেখে আসব মদনমোহন।

ফুল সাবানে মাথা ঘস্যেঁ, জবাকুসুম মেখে কেশে।

হেস্যেঁ হেস্যেঁ ঘরে আসেন আমার ভাদুধন,

বদন ভরিয়া একবার হরি বল মন।

গার্হস্থ্যজীবনের সুখদুঃখের প্রতিচ্ছবির রূপ পাওয়া যায় ভাদুকে উদ্দেশ্য করা গানে। যা আগে বলেছি। এখানে একটি এরূপ গানের উদাহরণ রাখছি ---

মাগো, আমি ফুল পাতাবো ফুলকে আমি কি দিব,

পয়সা লিব বাজার যাব, ফুলকে ফুলেল তেল দিব।

মাগো আমি কাপড় লিব ধারে ধারে ধাক্‌চি ফুল,

শ্বশুড় ঘরের লোকে বলে, গেল বউ-এর জাতি কুল।

আমরা মায়ের তিনটি বিটি তিনটি সোনার মাদলী,

মা বাপের দুলালী আমরা, ভাই-ভাজের চোখের বালি

গাঁয়ে গল সরু শাঁখা বেছে পরতে পেলাম না,

হাত বাড়িয়ে কি করলাম, রাতে ঘুম আর হল্য না

বাঁধের আড়ে দেখে এলাম ছোট ছোট মালপোয়াতু

আর বছরে বেঁচে থাকলে আনব ভাদু মেড় দেওয়া

বাঁধের আড়ে ঢাক বাজিছে ঐ আসিছে ভাদুধন.

দেখ্ দেখিরে, মুক্তকেশী, কেমন সাজে সিংহাসন।

ভাদুর বাবা বাঁধ দিয়েছে ভাদুর মনে লাগে না।

আড়ে দাঁড়াইয়ে দেখ, ভাদু, লাল জবা বই ফোটে না।

চল্ ভাদু চল্ খেল্‌তে যাব রাণীগঞ্জের বড়তলা।

কয়লা খাদের জল শুকাল মিছরি বাঁধের আগাম হ'ল

আমার ভাদুর পায়ে আছে হাজার টাকার জোড়া মল।

এরকম সুখ দুঃখের অভিব্যক্তি ভাদুগানে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের শাশুড়ী ও ননদের সম্পর্কে যে বিভীষিকা ছড়িয়ে আছে আবহমানকাল ধরে যুবতী বধুদের মধ্যে তা-ও কুমারী জীবন থেকেই যে বাংলাদেশের মেয়েদের মনে সদাজাগ্রত তারও সুস্পষ্ট চিত্র রূপ ফুটে উঠতে দেখা যায় ভাদুগানে ---

হলুদ বনের ভাদু তুমি হলুদ কেন মাখ না,

শাশুড়ী ননদের ঘরে, হলুদ মাখা সাজে না।

কলঙ্গাতে চাবি ছিল, হলুদ বল্যে মেখেছি,

ও শাশুড়ী, গাল দিওনা পাশা খেল্‌তে বসেছি।

এমন কি, ভাদুকে সামনে রেখে কুমারীরা মনের কপাটও খুলে ফেলে —

আয় সারদা, আয় বরদা, কুলিতে বাধ বাঁধাব
কুলির জলে সিনান করে ঝরকায় চুল শুকাব।
আয় সারদা, আয় বরদা, পাড়রে দুটা বিছানা
মাসে দুটো একাদশী কেও করে কেও করে না।

আবার, বাঙালী ঘরে বিশেষ করে আবহমান কাল ধরে জামাতাদের প্রসন্ন করার রীতি, সে রীতিও ফুটে উঠতে দেখা যায় ভাদু গানে —

বাড়ির নীচে নারকেল গাছটি ঘটি ভর‍্যে জল দিব,
তিনটি নারকেল ধরলে পরে ডাকে চিঠি পাঠাব।
চিঠি পাঠাই ঘোড়া পাঠাই তবু জামাই আসে না,
জামাই আদর বড় আদর তিনদিন বই থাকে না।
আর তিনদিন থাক জামাই খেতে দিব পাকা ধান,
বস্‌তে দিব শীতল পাটি নীলমণিকে করবে দান।

মা পারিবারিক জীবনে যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধীনা এবং যার মা নেই সে যে সবচেয়ে হতভাগ্য তা - ও ভাদুগানে ফুটে উঠেছে বেদনার সহজ অভিব্যক্তিতে ---

মাথা ঘস্যে রহিলাম বস্যে আর আমাদের কে আছে।
মা রইল তেপান্তরের প্রাণ জুড়াব কার কাছে।

ভাদুগানে কুমারীদের মনোলোকের চাবিটি অহরহ খুলে যায়। বাংলার পারিবারিক জীবনে দেবরের সঙ্গে ভ্রাতৃবধূর যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা-ও কুমারী-হৃদয়ের চেতনার ভেতরে স্বপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ভাদুগানে —

ওহে প্রাণের দেবর লইও গো খবর ভুলো নাগো শিশু দু'জনে,
তোমারে সঁপিয়া দিনু মোর হিয়া রেখো গো তাদের যতনে।
বল্ দেখি শুকসারী তুইত কুঞ্জের দ্বারে ছিলি,
কোন্ পথে লুকাল আমার ননীচোরা বনমালী।

ভাদুগানে কি নেই — মেয়েদের উল্কি পরিবার সাধ যেমন ভাদুকে সাজানোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের ঢাকাই শাড়ীর প্রতি কুমারী মেয়েদের যে মনটান তা-ও ভাদুকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে উল্কি পরবার সাধ ও ঢাকাই শাড়ীর মনটানের কথা কত তীব্রভাবে ভাদুগানে উঠে এসেছে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি দুটি উদাহরণ —

১. এলরে রাজ নারী ছলে বসরে সিংহাসনে
আমার ভাদু উল্কি নিবেন, লেখগা বাসক ডালে।
পায়ে আলতা কুলি দাদা কি কর‍্যে মা পিরাব
শ্বশুড় ঘরের জোড়া পাল্কী আগনায় এসে দাঁড়াল।

২. চল, ভাদু, চল্ লো ঝম্ঝমায়ে চল,
ভিজালো তোর ঢাকাই শাড়ী পায়ে জোড়া মল।
(মিলন সজনী)

পথ ছাড়হে গিরিধারী, পথে তোমার কী আছে,
আমরা যাব ভাদু মহল, নিমন্ত্রণ এসেছে।
(মিলন সজনী)

আবার, রাঢ়ে বাগ্দী, বাউড়ী মেয়েরা যে কৃষিকার্যে সাহায্য করে তারও কথা উঠে এসেছে দেখা যায় ভাদুগানে —

বাঁধের নীচে জমি নীলাম কাদাতে হাল লাগে না,
আমার ভাদু শিশু ছেলে জল বাগাতে জানে না।

ভাদুকে এখানে শিশুরূপে কল্পনা করা হয়েছে। শিশুরা যেমন চাষের কার্যে দক্ষ নয়, বাঁধের নীচের মাটি নরম থাকার জন্য চাষ করবার সময় বিনা হালেই কাদা হয়ে যায় --- এ বোধ শিশুদের স্বভাবতই থাকে না। ভাদুর উদ্দেশ্যে এ-কথাই বলা হয়েছে। এমনিভাবে সমাজের সব পারিপার্শ্বিক দিক ও গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখ, বেদনা-বিরহের কথাও যেমন অবলীলায় বার বার উঠে এসেছে, তেমনি উঠে এসেছে কুমারীদের মান-অভিমান, একাকীত্ব ও মনের ভেতরের ধিকি ধিকি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতন দহন ও জ্বালা। জ্বালা যে কত তীব্র তা ভাদুগানের দুটি পংক্তিতেই লক্ষণীয় —

আয় ললিতে চাবকি হাতে বিড়াল যাচ্ছে গলিতে,
কৃষ্ণ ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন কাঁচা দুধের সর খেত্যে।

এখানে লক্ষণীয় 'বিড়াল যাচ্ছে গলিতে' ও 'কাঁচা দুধের সর খেত্যে' কথাগুলি। জ্বালার মধ্যে এক সূক্ষ্ম ব্যঙ্গও আছে।

ভাদুগানের মধ্যে একটি জিনিস সবচেয়ের নজর কাড়ে তা হলো অসম্ভব কবিত্বশক্তি ও ছড়ার মতন অসংলগ্ন ছবির সমাবেশ। এখানে দুটি উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরছি —

১. জল দিলে লড়ে না গাড়ী গো একি কলের মিস্ত্রী,
জলকে যাব জলকে যাব গো যে ঘাটে সরা বালি,
সরু শাঁখা মাজতে লারী গো গুমুরে কান্দ্যে মরি।

২.	চন্দ্রকলি মালা দিলে, না দিলে বকুল

ফুলের সাথে হৃদয় দিতে হয়না যেন ভুল।

এখানে উপরিউক্ত প্রথম উদাহরণটিতে লক্ষণীয় 'জলকে যাব জলকে' কথা কটি। কাব্যগুণ এখানে সুন্দরভাবে প্রজ্জ্বোলিত। এখানে রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কাব্যের 'বধূ' কবিতাটির দুটি সুবিখ্যাত শব্দের সঙ্গে এক সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায় — 'জল্‌কে চল্‌'। দ্বিতীয় উদাহরণটিতে 'ফুলের সাথে হৃদয় দিতে হয় না যেন ভুল' পংক্তিটি কাব্যগুণের সুষমায় অসম্ভব লাবন্যময় হয়ে উঠেছে। আধুনিক কবিতার পর্যায়ে এই পংক্তিটিতে ফেলা যেতে পারে। সত্যিই বিস্ময়কর! যা শুধু আমাদেরকে মুগ্ধই করে না, বিস্মিতও করে।

কাজেই, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি ভাদুগানের কবিরা নিয়মিত কাব্যচর্চার সাধনা করেছেন। বিশেষ করে ভাদুগানে রূপকেরও চমৎকারিত্ব ব্যবহার যখন চোখে পড়ে। যেমন —

কাশীপুরে দেখ্যে এলাম, সোনার থালায় বাঘ বসে,

এ বাঘে তো মানুষ খায় না রূপ দেখাতে এস্যেছে।

'সোনার থালায় বাঘ বসে' এরকম রূপকের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার দক্ষ কবিরাই কেবল করতে পারে! ভাদুগানকে কেন্দ্র করে একসময় যে বাংলাদেশের কাব্যচর্যায় মহতী একনিষ্ঠ সাধনা শুরু হয়েছিল তা বোধ করি বলার অপেক্ষা রাখে না।

লোকসঙ্গীত গানের সঙ্গে যে নৃত্যের সবসময় যে একটা যোগ লক্ষ করা যায় তা ভাদুগানেও লক্ষ্য করা যায়। একটি ভাদুগানেই তার উল্লেখ লক্ষণীয় —

মাদল বাজা আমার এগুতে

আমি নেচে যাব কাশীপুরের কুলিতে

মাদলট বাজাবিত বাজাইলে

ও মাদল্যা আমাদেরি বটে।

বিবাহকে ঘিরে কুমারী মেয়েদের মনে যে সুখস্বপ্ন রচিত হয় তার নির্দশনও ভাদুগানে পাওয়া যায়। ভাদুর বিবাহের পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই কুমারী মেয়েদের নিজের মনের সুখস্বপ্নের কথা ব্যক্ত হয়েছে —

সাধের ভাদুর বিয়ে!

পাড়া গিয়ে গিয়ে ডেকে আন ন'জন মেয়ে;

সাধের ভাদুর বিয়ে!

চিক পেড়্যে বোম্বাই শাড়ী লো এঁটে পরলো কোমরে;

পথ যেতে রোদের আভায় যেন লো ঝলমল করে!
সঙ্গেতে ইংরেজি বাজনা লো বাজলো মধুর স্বরে,
আমরা হেলে দুলে সবাই মিলে আসি লো বাজার ফিরে,
সাধের ভাদুর বিয়ে!

আধুনিক সভ্যতার আলো যে পল্লী বাংলাতেও আচড়ে পড়েছে। বিবাহাচারের মধ্যে নগর-সভ্যতার প্রিয় বোম্বাই শাড়ীও তাই ঢুকে পড়েছে। সরল পল্লী বাংলার মেয়েরা দেখি ভাদুগানে তারও উল্লেখ করেছেন সহজ-সরলভাবে ভাদুগানে বিবাহাচারের নিখুঁত বর্ণনায় -

বলি ও সরলা, ভাদুর বিয়ে, সরল মনে সাজালো বরণ ডালা
কাঁঠাল পাতা তুলে আন্‌লো সাজালো সন্দেশ থালা।
আলপনা দিয়ে কর, পরিষ্কার ছাদনাতলা
পাড়ায় যত এয়ো আছে, ডেকে আন এইবেলা।
কি মনের সাধে ভাদুর বিয়ে করে ফেল এইবেলা
চল শ্যাম সায়রে ভাদুর বিয়ে জলসয়ে আনিবারে;
চিক্ পিড়্যে বোম্বাই শাড়ী লো এঁটে পর কোমরে
রাস্তায় যেতে রৌদ্রের আভায় যেন লো ঝলমল করে।
সাধের ভাদুর বিয়ে:

এই ভাদুগানটির প্রথম পংক্তিটি ও গানের ভঙ্গিটি প্রভাব লক্ষ করা যায় বর্তমান কালের লোকগীতিতেও। বিশেষ করে স্বপ্না চক্রবর্তীর লোকগীতিতে ---

বলি, ও ননদী,
আর দু'মুঠো চাল ফেলে দে হাঁড়িতে,
ঠাকুর জামাই এলো বাড়িতে, ---

মোদ্দাকথা হল, বাংলাদেশের বৈচিত্রময় লোকসঙ্গীতের রাজ্যে ভাদু কেবল জনপ্রিয় গান নয়, অত্যন্তই বহুল জনপ্রিয়। মহিলা কবিদের রচিত ভাদুগানের সংখ্যাও তাই প্রচুর। ভাদুগান হল পল্লীবাংলার সরলমতী কুমারীদের কাছে ভাদু পূজোর প্রধান উপকরণ। ভাদুরাণীকে কুসুমস্বরূপ ভাদুগানে রাঙিয়েই ভক্তের ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়। ভাদুগানের ভেতরে বাংলার মহিলা কবিরা ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ও আসা-আকাঙ্ক্ষার কথাকেই সব সময় তুলে ধরেছেন। এ যেন প্রাণের ঠাকুরের সঙ্গে একরকম কথা বলা! ভাদুগানে এজন্য বহুমুখী মনের প্রকাশ ঘটেছে বলেই বৈচিত্র্যও অনেক। কুমারী মেয়ের সম্পূর্ণ জীবন যাপনের মধ্যে প্রসাধন অর্থাৎ নিজেকে অলংকৃত করার যে মনোবাসনা একটি প্রধান ব্যাপার হিসাবে বিবেচিত হয় তাও

ভাদুগানে তুলে ধরতে এতটুকুন কুণ্ঠাবোধ বোধ করেনি ভাদুকে প্রসাধনে অলংকৃত অর্থাৎ সাজাবার ইচ্ছে প্রকাশ করে —

ভাদু তোর লেগে রোদন করে
রাজা যমুনার তীরে।
কি কি গয়না লিবি ভাদু
বলনা আমারে।।
আমি পায়ে লেবো পায়ের
তোড়া সাজবো বাহারে।
কি কি শাড়ি লিবি ভাদু
বলনা আমারে।।
আমিঁ সবুজ পেড়ো শাড়ি
লেবো সাজবো বাহারে।
আরও কি গয়না লিবি'রে ভাদু
বলনা আমারে।।
নাক লেবো নথের টানা
সাজবো বাহারে।।
ভাদু তোর লেগে . . .

নগর কলকাতার জল যে পানীয় জল হিসেবে খুব সুস্বাস্থ্যকর নয়। কলকাতার লবনাক্ত জল যে মোটেই সুস্বাদু নয় — সে সম্পর্কেও কটাক্ষ ভাদুগানে লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

ও ভাদু আমার ছোট ছেলা গো
বাছায় কে পাঠালে কলকাতা।
কলকাতার ঐ নোনা জলে
ভাদু হলো শ্যামলতা।

সাধারণ পল্লীবাংলার মানুষের জীবনে নগর কলকাতা সম্পর্কে যে ভীতি ও কৌতূহল আছে তার তীব্র প্রতিক্রিয়ার চিত্র ও কথা পাওয়া যায় এরকমভাবে অনেক ভাদুগানে। কাজেই — সবদিক দিয়ে ভাদুগানকে গ্রাম বাংলার মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন আলেখ্যের একটি প্রামান্য দলিল হিসাবে দেখা যেতে পারে। এ কারণে ভাদুগান আধুনিক কাব্য ও নাটকের ভেতরে ঢুকে পড়েছে স্বাভাবিকভাবে।

লোকসাহিত্যের ভেতরেই যে রয়েছে আসল প্রাণবীজ — এ সত্য আবিষ্কার করতে আধুনিক যুগের নাট্যকার ও কবিরা এতটুকুন ভুল করেননি। এজন্যই বিশেষ করে আধুনিককালের নাট্যসাহিত্যের যখনই গ্রাম বাংলার আর্থসামাজিক সমস্যার কথা উঠে এসেছে — তখনই লোকসঙ্গীতগুলি একে-একে উঠে এসেছে তার আধার হিসেবে নাটককে আরও গতিময় করে তুলতে। কবি মধুসূদন, গিরীশ ঘোষ, ক্ষীরোদ প্রসাদ ও অমৃতলালই সর্বপ্রথম বাংলা নাট্যসাহিত্যে লোকসঙ্গীতের বহুল ব্যবহার ঘটিয়েছেন। পরবর্তীকালে আধুনিক নাট্যসাহিত্যের কর্ণধার শম্ভুমিত্রের 'চাঁদবণিকের পালা'তেও লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীতের প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভাদুগানও জনপ্রিয়তার পথ ধরে অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে তাঁর সাহিত্যগুণে আধুনিক বাংলা নাটকে ও কাব্যে। এ কথা বলেছি দৃঢ়তার সঙ্গে — কেননা, পল্লীজীবনের সমস্যা ও সামাজিকতার পরিপূর্ণ জীবনের অবয়বটিকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের ভাদুগানের স্মরণাপন্ন হতেই হবে! একারণে কোনো মহৎ কবি ও নাট্যকারের পক্ষে সচেতন বা অবচেতন ভাবে ভাদুগানের প্রভাব এড়ানো সম্ভব নয়। ভাদুগান যে সমগ্র পল্লীবাংলার সরলমতী কুমারী মেয়েদের মনোলোকের এক-একটি আরশি।

গম্ভীরা গান

গম্ভীরা গান হলো পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার একটি জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। গম্ভীরা গান যেহেতু মালদহ জেলার মতন ব্যাপকভাবে পশ্চিমবঙ্গের আর কোনো জেলায় প্রচলন নেই বলে এই লোকসঙ্গীতটিকে পশ্চিমবঙ্গে মালদহ জেলার এক বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত হিসেবে ধরা হয়। তবে, মালদহ্ জেলার গম্ভীরার সুর ও ভাবধারার সাযুজ্য পাওয়া যায় রংপুর - দিনাজপুরের লোকসঙ্গীতে। এখানে একটি সঙ্গীতের উল্লেখ করছি। বিষয়বস্তু একটু অন্যরকম, কিন্তু সুর ও ভাবপ্রকাশের মিল সাযুজ্য গম্ভীরা গানের মতনই বর্তমান —

মোক আনি দিব গুল বাহার
ধোকরা মেঘলি পরিমনা মুই আর।।
অংধি অংএর চুরি হাতোৎ দিমো
মারমো বাহার
বিবিয়ানা পেহলি গায় দিয়া
সাধ হইয়াছে সজিম্ মুই শহুরী মাইয়া।।

তবে, বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জেও এ গানের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যদিও পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় 'গম্ভীরা' নামক এক শ্রেণীর লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে, তার প্রকৃতি কিন্তু স্বতন্ত্র। মালদহ্ জেলার গম্ভীরা গানের সঙ্গে এর চরিত্রগত তফাৎ ও অমিল অনেক।

গম্ভীরা গানে বন্দনা, ঠুংরিগান, বেরিয়াড়ি ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের প্রচলনও দেখা যায়। গম্ভীরা গান শুরুর সময়ে গায়কেরা যখন বন্দনাগীত গান আরম্ভ করেন তখন গায়কেরা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দিয়ে হাত-পা মাথা বেঁধে চুনের ফোঁটা নাকে ও গলায় লাগান। কেউ কেউ যদিও বন্দনা গীত হিসেবে আবার শিবের বন্দনা গীত গেয়ে থাকেন। মালদহ্ জেলার গম্ভীরা গানের সাধারণত যে আসর অনুষ্ঠিত হয় তাতে কিন্তু কোনো প্রকোষ্ঠের স্থান নেই। উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে সামিয়ানা টাঙিয়ে গানের আসর বসে। এই গম্ভীরার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে সুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য তাঁর "উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি" গ্রন্থে বলেছেন —

"মহারাজা শ্রীহর্ষের সময়ে বৌদ্ধ ক্রিয়াকান্ড - প্লাবিত ভূমিতে শিবোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রকার শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা দ্বারা উৎসব "গম্ভীরা'র প্রথম বীজ সমাজে রোপণ করা হয়। মহারাজার নিমন্ত্রণে বহু রাজন্যবর্গ এই আনন্দোৎসবে যোগদান করেছিলেন। শতকোটি উৎসব-গৃহ নির্মিত হত। তাতে মানব-প্রমাণ এক বুদ্ধ মূর্তি স্থাপিত হত। এই উৎসবটি চৈত্র মাসের প্রথম হতে ২১শে তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হত। শত শত শ্রমণ ব্রাহ্মণ সেই উৎসবক্ষেত্রে

উপস্থিত হতেন। তাঁরা ভোজ করতেন। এই অস্থায়ী উৎসব-গৃহে সঙ্গীত ও বাদ্যভাণ্ডের বিপুল আয়োজন হত। নৃত্য-বাদ্য-সঙ্গীতহীন বৌদ্ধ উৎসবক্ষেত্রে ক্রমশঃ নৃত্য-গীতের আবির্ভাব হয়েছিল। এটাই গম্ভীরার শৈশবকাল বলতে পারি।"

মালদহের গম্ভীরা গান সম্পর্কে এটুকু কথা বলা সমীচীন হবে, বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে চৈত্র সংক্রান্তিতে যে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাকে কেন্দ্র করেই একটু ভিন্নভাবে গড়ে ওঠে গম্ভীরা গান। এ কারণে এই গানগুলিতে শিবের উপস্থিতির কথা এলেই কিন্তু তা কখনো একদম শিবভক্তির মধ্যে একপেশে হয়ে পড়েনি, গম্ভীরা গানের স্বতন্ত্রতা এখানেই --- ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়ের অধিক প্রতিফলন ঘটেছে। কাজেই, গম্ভীরা গানকে কখনোই শিবগীত বলে চিহ্নিত করা যায় না। যদিও শিবের কথা বহুবার এসেছে, তবে মনে রাখতে হবে এ গানে শিবের মাহাত্ম্য কখনোই কোনো বিশেষ রূপে চিহ্নিত হয়নি। বরং এভাবে বলা ভাল, মালদহের 'গম্ভীরা গান'-এ সরল-দরিদ্র কৃষক সমাজের সর্বহারা মানুষের প্রতিভূরূপে রূপকাশ্রয়ী হিসেবে শিবের উপস্থিতি ঘটেছে। এ কারণে গম্ভীরা গানকে কখনোই শৈবধর্ম-বিষয়ক গীতরূপে চিহ্নিত করা যায় না। গম্ভীরা গানে প্রধাণত মালদহ জেলার দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর মানুষদের দারিদ্রপীড়িত আর্থসামাজিক চেহারাখানাই বেশীভাবে ফুটে উঠেছে। শিব যে দরিদ্র সাধারণ মানুষের প্রতিভূস্বরূপ আপনজন। শিবকে উদ্দেশ্য করেই নিজেদের দুঃসহ যন্ত্রণাপীড়িত দারিদ্রের শ্রীহীন চেহারাখানার ছবি পাওয়া যায় গম্ভীরার একটি গানে। এবং তা নিখুঁতভাবেই ---

প্যাটেতে ভাত নাই, ও শিব, গোলাতে নাই ধান,
কি দিয়া বাঁচাব, ও শিব, ছেল্যাপিল্যার জান।
ও বুঢ়া শিব, দয়া কর।।
পরণে নেতা নাই ও শিব, বরজে নাই পান।
কি দিয়া রাখিব, ও শিব, মাইয়া লোকের মান।
ও বোকা শিব, দয়া কর।।

'ও বোকা শিব' কথাটির মধ্যে শিবের উদ্দেশ্যে গানে ঈষৎ শ্লেষও বর্ষিত হয়েছে। এই গানটিতে একটা জিনিস লক্ষণীয়, শিববন্দনাগীত বলতে আমরা যা বুঝি এখানে বার-বার 'শিব' কথাটি উচ্চারণের মধ্যে তেমন প্রতিফলিত হয় নি --- ভক্তির বদলে গানটিতে শিবকে সাধারণ স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে। শিবকে উদ্দেশ্য করে রচিত গম্ভীরা গানে তৎকালীন সময়ের গ্রাম-বাংলার দুঃখ-দুর্দশার সহ শ্রীহীন সমাজের পরিবেশ ও প্রকৃতির কথাও উঠে এসেছে। যেমন ---

১. শিব কি করিব হে এবার বাঁচাবে না প্রাণ,
টাকা স্যারের চাউল হয়্যা লাইগ্যা গেল টান।

বাঁচবে না আর প্রাণ।

আমাদের দ্যাশের আম্র ফলটি সেও হল মাটি
পলু পুশা পাছি দিসা দর হল খাঁটি হে,
দর হল কুড়ি পঁচিশ পলু-পুশা লাগছে যে দিস,
এ ক্যামন হল দ্যাশের ধারা, বল বাঁচব ক্যামনে মোরা।
কৃষকেরা ভাবছে বইস্যা উপায় কিবা করি হে,
ধান কলাই হল না ভাই হল না জল ঝরি হে।
জল বিনা সব মইল গরু বকরী একি হোল বিষম জ্বালা।
ক্যামনে বাঁচবে ছেইলা পিলা।
গরীবেরা ভাবছে বইস্যা উপায় কিবা করি হে,
এক সের চাউল হয়্যা না খাইয়্যা সব মরি হে।
ভুট মোটর ঘোড়ার খানা দর হল হে মাখন ছানা
এ কষ্টে পয়দা গেল মরে রাজ্য চলবে কেমন করে
দিনে দিনে হল কঠিন ক্যামনে পাব ত্রাণ,
শিব, কি করিব হে এবার বাঁচবে না আর প্রাণ।

২. শিব তোমার লীলাখেলা কর অবসান
বুঝি বাঁচে না আর জান।।
তারপর ম্যালেরিয়ায় হইলাম সারা,
বুঝি বাঁচে না আর জান।।
অন্নদা মা ভিক্ষা কইর‍্যা করবে কি আর গতি হেতু
মসুরি কলাই তেল দ্যাশাইয়া, ক্ষেতের ফসল গেল ডুব্যা
বুঝি বাঁচে না আর জান।।

শিব যে সাধারণ কৃষকশ্রেণীর মানুষদের কাছে দেবতার আসন ছেড়ে যে একজন সাধারণ মানবরূপে ওঝায় নেমে এসেছে তা-ও লক্ষ্য করা যায় একটি গানে —

বুড়াটা আস্ত বাদ্যা মাথায় লাদ্যা আনেছে দেখ সাপ হে।
(মাথায়) জটায় কুকুরী, জুয়ান ছুকরী বস্যা উটা কে হে।।
(মাথাৎ) ছ রঙ্গের সাঁপ দেখচি ছটা, কাম ক্রোধাদি রিপু কটা,
ত্যাগ জড়ির গুণে বুড়াটা, কেঁচার লাখান কল্লে হে (সাপকে)।
গায়ে দেখছি গুদারি-গুদরা, পরনে এক বাঘের চামড়া,

মজা লুটছে ভূত প্যারত্‌রা হামরা কি কেউ নই হে।।
চেহারাটা ঠিক পূর্ণিমার চাঁদ, ধরেছে দুনিয়া ভুলা ফাঁদ,
ভক্তি মাটির বাঁধলে রে বাঁধ পারে পাওয়া যায় হে।।

গানটিতে লক্ষণীয় হলো,'জড়ি-বুটি'র কথা বলা হয়েছে। ওঝাদের সঙ্গে সর্বদাই এই 'জড়ি-বুটি' থাকে। গানটির শেষ দুটি পংক্তিতে আবার লক্ষণীয় হলো, শিবের নাদুস্‌-নুদুস্‌ সুন্দর চেহারাটিকে পূর্ণিমার চাঁদ বলা এবং ভক্তির দ্বারা যাঁকে পাওয়া যায় সে কথাও বলা হয়েছে। 'পূর্ণিমার চাঁদ' প্রতীকী ব্যঞ্জনাটি আধুনিক কবিতার কথা কি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় না? বেশ কবিত্বশক্তির নিদর্শন আছে স্থানে-স্থানে গানটিতে। যদিও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতে গম্ভীরা গানে সাহিত্যগুণ বিশেষ কিছু নেই। আশুতোষবাবুর এ-কথার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। উপমা-প্রয়োগে নিপুণ দক্ষতাই গম্ভীরা গানের সাহিত্যগুণ সম্পর্কে মাঝে-মধ্যে আমার মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। এমনকি, একটি গম্ভীরা গানে বাউল গানের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। যেমন দুটি পংক্তি —

শিবের মনের কথা দুটো বলব এনে জড় জগতে।
ঘুরতে মানা পথে কোথা গেলে দেখা পাব।।...

'কাথা গেলে দেখা পাব' কথা কটি কি আমাদের বিখ্যাত চেনা বাউল গানের একটি উজ্জ্বল পংক্তি কি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় না — 'আমি কোথায় পাব তারে'। এখানে এ কারণে একটা কথা বলা বোধকরি সমীচীন হবে, গম্ভীরা গানে কখনো-সখনো সাহিত্যগুণের জন্য বাউল গানের মতন বলিষ্ঠ পংক্তি চোখে পড়ে।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের সংগৃহীত মালদহ জেলার একটি গম্ভীরা গান থেকে ছটি পংক্তি এখানে তুলে ধরছি, যা সাহিত্যগুণে ভরপুর — কি উপমা প্রয়োগে, কি শব্দের নিপুণ প্রয়েগ দক্ষতায় —

আমায় সঙ্গে করে, হাতে ধরে, ঘরে নিয়ে যাও হে।
তোমার আহ্বান ধ্বনি, শুনেও না শুনি (আমায়) ঘেরিয়ে দাঁড়াও হে।।
বাসনার আশাবাণী, মরীচিকার মত টানি আগুনে পোড়াও হে,
তুমি শীতল করে দগ্ধ মর্ম-যন্ত্রণা ঘুচাও হে।।
নাহি চিনি আত্মপরে, উচ্চ শির গর্বভরে, অমঙ্গলে ধায় হে;—
আমার মাথাটি ধরে, নত করে, তোমার চরণতলে নাও হে।।

এই গানটিতে লক্ষণীয় হলো — 'মরীচিকার মত টানি আগুনে', 'দগ্ধ মর্ম-যন্ত্রণা' কথাগুলিতে অসম্ভব কবিত্বশক্তির প্রকাশ। আবার ষষ্ঠ পংক্তিটিতে কবিত্বশক্তির সঙ্গে উচ্চ সাহিত্যগুণও চোখে পড়ে সাবলীলভাষায় অহং - বোধের বিসর্জনের মধ্যে! এই পংক্তিটির

সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গীতাঞ্জলি"র শুরুতেই প্রথম লেখাটির দুটি পংক্তির মিল - সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় --- 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার / চরণধুলার তলে।' ভাবসাদৃশ্য এখানে একই নয় কি! লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীত যে কবি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করেছিল তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি লোকসংস্কৃতির বা লোকসাধনার মধ্যে আমাদের স্বদেশের চিত্তের ঐতিহাসিক পরিচয় দেখতে পেয়েছিলেন।

গম্ভীরা গান সম্পর্কে আর একটি কথা বলা বোধকরি সমীচীন হবে, মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যে দেবতার সঙ্গে মানুষের যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল তা গম্ভীরা গানে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে দেবতাকে আলাদা আসনে প্রতিষ্ঠিত না করে দেবতা শিবকে প্রতিভূ করে খাড়া করে সাধারণ জনমানসের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সুচারুরূপে তুলে ধরার মাধ্যমে । গম্ভীরা গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটাই --- শিবের উদ্দেশ্যে গীত হলেও শিবভক্তি রসপ্রবাহে নিমজ্জিত হয়ে পড়েনি এবং তেমনি আধাত্ম্যভাবনার আলোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। এ কারণে গম্ভীরা গানে তৎকালীন বিষয়-বহুল ঘটনা পারম্পর্যভাবে উঠে এসেছে। শিবগুণে গানগুলিকে বৈষ্ণবপদাবলীর সমতুল বলা যেতে পারে। চিত্রকল্প নির্মাণে, উপমাপ্রয়োগে, কি বিষয়-বৈচিত্রের দিক থেকে । এ জন্যই সম্ভব গম্ভীরা গান আজো সমানভাবে গ্রামবাংলায় জনপ্রিয়তার আসনে অধিষ্ঠিত। সমসাময়িক কালের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এ গানগুলির গুরুত্ব যে অপরিসীম তা সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত একটি গানে লক্ষ্য করা যায় ---

বুঝি ফিরিঙ্গী দল এবার ভাইরে ধোর‍্যা লিলে খাঁটা।
সিপাহী সব মিল্যা অদের কর্লে বলির পাঁঠা।।
গরু আর শুয়ারের চর্বি দিয়া কর্লে টোটা।
হিন্দু আর মোসলেমের বুকে মার‍্যা দিল খঁটা।।
জাতি ধর্ম নাই এক ফোঁটা।
পরে দুই ভায়েতে শল্লা কোর‍্যা, অদ্যের নাঢ্যাৎ মারছে সাঁটা।।

উপরিউক্ত গানটিতে 'দুই ভায়েতে' বলতে হিন্দু মুসলমানকে বোঝানো হয়েছে। এমনকি গম্ভীরা গানে মহাযুদ্ধের কথা যেমন উঠে এসেছে, তেমনি চার্চিল ও এটিলির নামও উচ্চারিত হয়েছে। যেমন ---

বাপরে বাপ্ জান বাঁচাল হল দায়,
শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি,
নলখাগড়ার প্রাণ যায়।
জান বাঁচান হল দায়।
ধন্য বৃটিশ রাজের চাল,

ও সে করলে নাজেহাল,
শ্যাষে মাথায় ঘাঁয় পাগল হুয়্যা
উড়া জাহাজে হাওয়া খায়,
বাপরে বাপ, জান বাঁচান হল দায়।
চার্চিল ছদ্মেরই বেশে
(ও সে) অট্টালিকাতে বসে
চপ কাটলেট চুষে
এটালিকে ফের কেটলী বানাইয়্যা
সেই জলেতে চাহা খায়, বাপরে।

এমনকি, সমাজে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি রক্ষার ঘোষণাও গম্ভীরা গানে উঠে এসেছে —

হায়রে আল্লা কি হোল, হিন্দু — মোসলেম দুই মোলো।
দেখছি জাতিয়ারী জাতিয়ারী কোর্‌য়া দাঙ্গা -- হাঙ্গামায় পোল।।
মোসলেম কোহছে হাম বাড়া, হিন্দু দেয় নাকো সাড়া।
ভোলা তোমার দেশে একুন ভেসে দোটানা ভাব দাঁড়ালো।।
ভোলা তুমি মুসলমানের আদব, হিন্দুর শিব শিব বোম্ বোম্।
হামরা দুয়োভায়ে করভুক পূজা।
মানঠোৎ কি মজা ছিলো।।

রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয়ও যে কত গভীর তা গম্ভীরা গানে পাওয়া যায়। দেশ স্বাধীন হবার পূর্ববর্তীকালে রচিত একটি গানে এ-স্বাক্ষর বিদ্যমান ---

স্বরাজ যদি পাই ভোলা,
খেতে দিব মানিক কঁলা (মর্তমান কলা),
নইলে আঁ্যাধার কলা।
বানিয়া হল দেশপতি
কি বলব ভাই দেশের গতি
কাঁচ দিয়ে কাঞ্চনাদি নেয়
হাতে দিয়্যা খোনা।
কি বলব হে ভোলা নানা
বুক ফুটেও মুখ ফুটে না

এ মুখ ফুটাও ভাতের মতো
উঠাও বণিকের ঝোলা।

এই গানটিতে কবিত্বশক্তির মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায় 'কাঁচ দিয়ে কাঞ্চনাদি' ও 'মুখ ফুটাও ভাতের মতো' উপমা প্রয়োগে। এমনকি, গম্ভীরা গানে ব্যাঙ্গ ও কৌতুরসের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার অবক্ষয়ের রূপটিও পরিস্ফুট হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

আজ ভাল মানুষির দিন গিয়াছে, ওহে পশুপতি,
তিন চোখে কি দ্যাখতে পাওনা মোদের কি দুর্গতি।
জাল জালিয়াতি বিশ্ব জুড়্যা
ব্লাকু মার্কেট বাজার ভইর‍্যা
গাড়ী চালায় বাড়ী হাকায় জ্বালায় বিজলী বাতি।।
বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম সেবা রসাতলে গেল ডুব্যা,
হিংসা বিবাদ দলাদলি হায়রে কি দুর্মতি।।
ন্যাংটা হয়্যা প্যাংটো মুখ মরলো যে সব গরীব লোক,
তাইতো মোরা ন্যাংটো ভোলার কাছে জানাই নতি।।

উপরিউক্ত গম্ভীরা গানটিতে মূল্যবোধহীন অবক্ষয়ের রুগ্ন-সমাজের চিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। হাল্‌কা চালে ব্যাঙ্গ ও কৌতুকরসে গানের রচয়িতা সাবলীলভাবে ব্যক্ত করেছেন যেন বৃহৎ মানুষের মনের কথাটি। এখানে গানটির মধ্যে ছড়ার চালের মতন ছন্দটিও বেশ। পড়তে মজা লাগে। দক্ষ সাহিত্যকর্মের এটি কি একটা বিশেষ গুণ হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি না!

মালদহ জেলার মাটির মানুষের সঙ্গে গম্ভীরা গানের যোগ ছিল মাতৃগর্ভের নাড়ির মতন। সরল-দরিদ্র কৃষকদের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ক্ষোভ-বেদনা সবকিছুই অনায়াসভাবে গ্রাম্য সরল ভাষা ও ব্যাঞ্জনার ভেতর দিয়ে জীবন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে প্রতিফলিত হয়েছে। মালদহ জেলা যে আমের জন্য প্রসিদ্ধ, এবং আমের ফসলের ওপর যে অনেক মানুষের রুজি-রোজগার জড়িত তারও কথা জানা যায় গম্ভীরা গানে। আমরা জানি, অনাবৃষ্টিতে মালদহ জেলার চিরপ্রসিদ্ধ ফজ্‌লি আমের ফলনের প্রায়ই ক্ষতি হয়। এর ফলে মালদহের সাধারণ মানুষদের জনজীবনে অর্থনৈতিক দুরবস্থার সূচনা করে। ফলে জনজীবনে দেখা দেয় দৈন্যতা। ঘরে-ঘরে দেখা দেয় অভাব আর অনটন। এক কথায় বলা যায় আমের ফলনের বিনষ্টির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে ঘনিয়ে আসে ভয়ানক দুর্যোগ। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় জীবনের স্বাভাবিক গতি। অভাব আর অনটনের তীব্রতা মুহূর্তের মধ্যে যেন গ্রাস করে নেয় সাধারণ জনমানসের হাসি। ঘরে-ঘরে কেবল ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে হাহাকার। গম্ভীরা

গানেও এর নিখুঁত প্রতিচ্ছবি দেখা যায় —

শিবহে, এবার জীবন বাঁচানো বুঝি হল ভার,
উনিশশো সাতান্ন সনে কি যে আছে তোমার মনে,
(সারা) ভারতব্যাপী পড়েছে আজ হাহাকার।।
অনাবৃষ্টি হেতু আজ শস্যহীনা বসুধা,
কেমনে মিটাবে তুমি বিশ্বগ্রাসী এ ক্ষুধা,
দৈন্যতা উঠছে বেড়ে, নগ্নরূপে এ সংসারে
(তুমি) রক্ষা কর নইলে হবে সংহার।।
মালদায় এবার হলোনা আম, অভাব আর অনটন,
লোকের মনে অশান্তির ছাপ জাগিতেছে অনুক্ষণ।।
দিন যাবে কেমনে তবে আকাশ পাতাল ভাবছে সবে,
মান সম্মান রক্ষা করা যাবে না আর।।
ওহে, শিব সুন্দর, করি তোমায় প্রণিপাত,
তোমার সৃষ্টি এ সংসারে কেন কর বজ্রাঘাত।
ছেড়ে দিয়ে রুদ্রনৃত্য, হও হে তুমি শান্ত চিত্ত
সত্য পথে চালাও মোদের পুনর্বার।।

অনুরূপ আর একটি গানে বেশী আমের ফলন না হওয়ার জন্য গায়কের গানের মধ্যে দুঃখ প্রকাশও নজর কাড়ে —

বলব কি গান, ওহে শিব, বাগানে নাই আম।
গাছে গাছে বেড়িয়া দেখ্‌ছি নূতন পাতা সব সমান।।
মনে মনে ভাব্‌ছি বসে, কাজের কোন পায় না দিশা।
তেল ধান চাউলের দর খুব কশা ভুষার বেশি দাম।।
আর এক শুন নূতন কাহিনী, ঠিক দুপ্রহরের শিল আর পানী।
মাঠে হয় কৃযাণ পের্‌সানি মারিলে গহম।।

এই গানটিতে আবার দ্বিপ্রহরে শিলাবৃষ্টিতে মাঠের গম যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে তারও কথা বলা হয়েছে। মোদ্দাকথা হলো, সাধারণ মানুষদের সব সমস্যার কথাই গম্ভীরা গানে উঠে এসেছে। কাজেই, গম্ভীরা গানকে মালদহ জেলার সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়-মানুষের জীবনের গান বলা যেতে পারে।

সুশীলকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন (উত্তর বঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃত গ্রন্থে), "বৌদ্ধ ধর্ম ও হিন্দুধর্মের এক অপূর্ব সমন্বয় এই গম্ভীরা উৎসব। চট্টগ্রাম, আসাম, এমনকি সুদূর ব্রহ্মদেশেও বৌদ্ধ উৎসবে আজও গম্ভীরার সাদৃশ্য দেখা যায়।"

গম্ভীরা গান আঞ্চলিক সঙ্গীত হলেও বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গানগুলি গাওয়া হয়ে থাকে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতে (বাংলার লোকসাহিত্য - তৃতীয় খণ্ড গ্রন্থে), "সেই অনুষ্ঠান শিবের গাজন, ইহা এই অঞ্চলে আদ্যের গম্ভীরা বলিয়া পরিচিত। আদ্যা বা শিবের গম্ভীরা উপলক্ষে যে গান হয়, তাহাও গম্ভীরা গান। গম্ভীরার অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুখোস নৃত্যও হইয়া থাকে, তাহাও গম্ভীরা নৃত্য বলিয়া পরিচিত।" তিনি আরো বলেছেন অনুষ্ঠানের সূচনা সম্পর্কে। তিনি জানিয়েছেন, 'চৈত্র সংক্রান্তির অন্ততঃ পাঁচদিন আগে হইতেই এই উৎসবের সূচনা হয়, এবং এই পাঁচদিন ধরিয়াই যে আচার পালন করা হইয়া থাকে, তাহাতে নানা আচার-মূলক সঙ্গীত গীত হয়। ইহার মধ্যেও মানত করিয়া সন্ন্যাসী হওয়ার রীতি প্রচলিত আছে এবং সন্ন্যাসীরাই আচার-সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই আচারানুষ্ঠানের বাহিরেও সাধারণ লোক সমবেত হইয়া এক লৌকিক সঙ্গীতানুষ্ঠান পালন করে। তাহাতে একটি গানের আসরে শিবের ঘট স্থাপন করিয়া শিবকে উদ্দেশ্য করিয়াই নানা গীত রচনা করা হইয়া থাকে। গানগুলি সকলই সাময়িক ঘটনামূলক। প্রধাণত ঃ সঙ্গীতের মধ্য দিয়া ইহা বর্ষবিরণী পর্যালোচনা মাত্র। চৈত্র সংক্রান্তির দিন বৎসরের ঘটনাবলীর একটা হিসাব নিকাশ লওয়া হয়, তাহাতে প্রধাণতঃ সমাজের অভাব- অভিযোগের কথাই বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।" এককথায় বলা যায়, মালদহের বিশেষ গান রূপে চিহ্নিত হয়েও যে গম্ভীরা গানের প্রভাব দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে তা মূলত তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও বিষয়-বৈচিত্রের শিল্পগুণের জন্য। গম্ভীরা গান সম্পর্কে এ কথা বলা বোধকরি উচিত হবে, ভেতরে-ভেতরে নিপুণ এক সাহিত্যগুণের স্বাভাবিক ধারা গনগুলির মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সুশীলবাবু তাঁর "উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি" গ্রন্থে কটি উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন -- "নাচ, গান, উক্তি, প্রত্যুক্তির সমাহারে গঠিত গম্ভীরার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, নাটগীতের আদল দেখতে পাওয়া যায়। ফলে, প্রাচীনতম কাল থেকে যে মৌলিক সংস্কৃতির ধারাটি আমাদের সমাজ ও ঘরের কথা অবলম্বন ক'রে বিবর্তিত হয়ে চলেছে, গম্ভীরা তারই একটি উল্লেখযোগ্য রূপ।" সুশীলবাবুর কথা থেকেই সহজে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সাহিত্যগত একটা অর্থবহ সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন হলো এই গম্ভীরা গান।

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণেও "গম্ভীরা গানে"র উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রী হরিদাস পালিতের মতে (আদ্যের গম্ভীরা), "রামাই আদ্যা বা দুর্গাদেবীকে জবাফুলের মালা গলায় দিয়া তাঁহার সম্মুকে ছাগাদি বলি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং রামাইপণ্ডিতের সময় পালরাজ-শাসনে বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজা হিন্দুর শিবপূজায় পরিণত হইয়া গিয়াছিল। প্রথমে রাঢ়ীয় গম্ভীরায় ধর্মের গাজনে আদ্যা বসিতেন, আর শিবাদি দেবতাগণ দর্শকরূপে নিমন্ত্রিত হইয়া

পূজা দেখিতেন। ক্রমে রামাইপণ্ডিতের "মহেশ করিবে বিভাগ গাজনে বসিয়া পূজা পাইলেন। তখন হইতে ধর্মের গাজন ও আদ্যের গম্ভীরা বা আধুনিক গম্ভীরার সৃষ্টি হইল।"

গম্ভীরা গানের জনপ্রিয়তা এমনই ব্যাপক ছিল যে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানরাও একসময় গম্ভীরা গানে অংশ গ্রহণ করত। বলতে কুণ্ঠা নেই, তা স্বতস্ফূর্তঃ ভাবেই। দুটি গান তার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করছি --

১. ধুয়া — কাম কাজ না করিলে মান রহে না হে ভোলা নানা,
চি — দেখ দুই দিন যদি বসে থাকি কেউ তো খেতে কহে না হে
ভোলা নানা।

আর যদি শ্বশুড় বাড়ী যায়,
দুই দিন আদরে খাওয়ায়
তিন দিনের বেলাতে শ্বশুর করে দিবে বিদায়,
নানা হে, করে দেবে বিদায়।
ঘরে নাইক খাবার কিছু যোগাড়
প্রাণেতে আর সহে না, হে ভোলা নানা।
আর যদি খাঁটি মজুরী মনে লজ্জা লাগে ভারি,
বাবু গিরি ছেড়ে দিয়ে সাজতে হইল ভিখারী,
নানা হে সাজলাম ভিখারী।
তবু লজ্জা ত্যেজে গেলাম কাজে,
কেউ খাটাইতে চাহে না হে ভোলা নানা।
আর এই শিরুয়ার মেলাতে, একজন কমলা বাড়ী হতে --
ঘুঘলা গোপের মিস্তিন এল মেলা দেখিতে
এই কাচারীতে নানা হে, কাচারী ঘরে,
মেলা করে, ধকম ধক্কা সহে না, হে ভোলা নানা।।
(আর) শুনেন মোহন পাড়ার উক্তি, গাছ বাঁশ কাটিবার যুক্তি,
ভেঁড়া, ভেড়ি বকরা বকরী
করে দাও ইতি, নানাহে করে দিলাম ইতি।

২. ধুয়া — শিব, এবার সোনার ভারতকে করিয়া কাগজ,
চিটালি — তুমি কাগজ দিয়ে সোনা নিছ সেকি কেহ করে খোঁজ।
অন্তরা — বহু করি দাদা যত চাষী ভাই

জমি জমা আবাদ করে যা ফসল উঠাই,
তাহে মোদের কি সত্ত্ব নাই।
তুমি ওজন করিয়া কাগজ ধরাইয়া গাড়ী করলা বোঝা।।
ভারতের অর্জিত জিনিস তুমি কর চালান।
আমরা ভারতের লোক খেটে মরি, বাঁচে কিনা প্রাণ।
ধন্য তুমি বুদ্ধিমান।
মোদের সেই জিনিস, অন্য দেশে দিবার কিসের গরজ।।
দেশের জিনিস দেশে রইলে অভাব তো হত না
ঘরে খাওয়ার থাকলে ভোকেতে রইতো না,
বাঁচিবার ছিল সম্ভাবনা।।
তুমি বাঁচাও মার হরি হর অন্তে দিও পদরজ।।

গানদুটিতে লক্ষণীয় হলো, ভোলানাথকে ভোলানান সম্বোধন করা। তবে, গম্ভীরা গান নিয়ে যতই ইতিহাসের কচকচানি ও নানা মুনির নানা মত থাকুক না কেন —চিরকালের সত্যি হিসেবে যেটা ধরা যেতে পারে তা হলো গম্ভীরা গানের এক আশ্চর্য সাহিত্যগুণ ও স্বতঃস্ফূর্ততা। যা আগে বলেছি। ফের বলছি। এ কারণেই জাতি-নির্বিশেষে অনেক মানুষকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। এ গুণটির জন্যই গম্ভীরা কেবল গম্ভীর হয়েই থাকেনি — সরল কলহাস্য মুখর হয়ে প্রাচীনকাল থেকেই দেশে-দেশান্তরে নানান মানুষের হৃদয় ও বোধলোকে ঢুকে পড়ে পরিবর্তিত হতে-হতে সমানভাবে নিজ জনপ্রিয়তায় বহমান হয়েছে। এমনকি, আধুনিক নাট্যসাহিত্যেও জায়গা করে নিয়েছে। অমৃতলালের "গ্রাম্য বিভ্রাট"-এ ষষ্ঠদৃশ্যে চোখে পড়ে গম্ভীরা গানের প্রচ্ছন্নভাবের প্রভাব —

সাতান্নই গই অই পায়ে নমস্কার।
শুভক্ষণে উদয় তোমার ধরা ভরা হাহাকার।।
তোমার সৃষ্টিতে ভাই কি আনন্দ,
মরি একেবারে বৃষ্টি বন্ধ,
দুর্ভিক্ষের মহানন্দ প্রজাবৃন্দ নিরাহার।।
আজও হয় হৃৎকম্প মনে হলে ভূমিকম্প,
ভঙ্গ হল রঙ্গপুর পূর্ববঙ্গ ছারেখার।

উপরিউক্ত গানে যেমন পাওয়া যায় সমসাময়িক দুর্ভিক্ষ ও অনাহারের কথা, তেমনি গম্ভীরা গানেও অনাবৃষ্টির তীব্র হাহাকারের প্রতিফলন লক্ষণীয়। একটি গম্ভীরা গানের নিদর্শন

এখানে উদানস্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে —

> শিব হে, এবার জীবন বাঁচানো বুঝি হল ভার,
> ঊনিশশো সাতান্ন সনে কি যে আছে তোমার মনে,
> (সারা) ভারতব্যাপী পড়েছে আজ হাহাকার।।
> অনাবৃষ্টি হেতু আজ শস্যহীনা বসুধা,
> কেমন মিটাবে তুমি বিশ্বগ্রাসী এ ক্ষুধা,
> দৈন্যতা উঠেছে বেড়ে, নগ্নরূপে এ সংসারে
> (তুমি) রক্ষা কর নইলে হবে সংহার।।

এমনকি, গম্ভীরার অনুসরণে দিব্যেশ লাহিড়ী রচনা করেছেন "নানা হে" নাটকটি। লোক নাটকগুলির বিভিন্ন উপাদান আজকে মাটি থেকে উঠে এসে লিখিত নাটকগুলিকে যে প্রভাবিত করেছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে "নানা হে" নাটকটি। শুধু দৃষ্টান্ত নয় — এটি একটি সার্থকতম দৃষ্টন্ত। ডঃ সুভাষ বন্দোপাধ্যায় তাঁর "বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি" গ্রন্থে যথার্থ কতকগুলি কথা বলেছেন —"কেবল ছড়াগান প্রবাদ প্রবচন কিম্বদন্তী লোক কথার উপাদন নয়, একেবারে একটি লোকনাট্যের ধারা তার প্রচলিত রূপ রীতি এবং বিষয়বস্তু (form content) পরিপূর্ণভাবে একটি লিখিত নাটকের সৃষ্টি করতে সাহায্য করছে। নাটকের লোকবিষয় লোকজীবন তার নিজস্ব লোক নাটকের রীতি নীতি ও প্রদর্শন পদ্ধতি একটি লিখিত নাটকের উপস্থাপনার পূর্ণ আশ্রয় হয়ে উঠেছে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে। এটি একটি অভিনব ঘটনা মনে করি। লোকশ্রুতিমূলক ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে লোক-সংস্কৃতির উপাদানকে আত্মসাৎ করে বেঁচে থাকা বা সুখে থাকার চেষ্টাই শুধু নয়, একেবারে মাটির আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মূলকে মাটির গভীরে চালিয়ে দিয়ে সরস রসে প্লাবিত করে বেঁচে থাকা, সজীব হয়ে ওঠা, নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা — বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এ এক অভিনব প্রচেষ্টা। বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ এই বৃহত্তম লৌকিক ক্ষেত্রের মধ্যেই নিহিত আছে একথা আজকে প্রমাণ হতে চলেছে।"

"নানা হে" নাটকটি যে মালদহের গম্ভীরা গানের রীতিনীতির খুঁটিনাটি নিয়ে রচিত হয়েছে এর সমর্থন পাওয়া যায় নাটকটির সূচনাতেই --- "একাঙ্কটি মালদহের গম্ভীরা-শিল্পীদের নিয়ে। গম্ভীরা গান মালদহের ঐতিহ্যপূর্ণ নিজস্ব লোকসংস্কৃতি। গম্ভীরা শিল্পীদের চিরন্তন দুঃখদুর্দশা, সংগ্রাম, জরুরী অবস্থাকালে তাঁদের ভূমিকা এবং স্বৈরতন্ত্রের অপশাসনও এই নাটকের বিষয়বস্তু।— নাটকের ভাষা মালদহের এবং গান ও নাচ অবশ্যই গম্ভীরার সুরে ও ঢঙে পরিবেশন করা প্রয়োজন। পর্দা উঠলে দেখা যাবে লাল-নীল কাগজের নিশান টাঙানো অতি সাধারণ মঞ্চ — যেন কোন জায়গায় ভুল বানানে বিকৃত হস্তাক্ষরে "আজ রাত্তিবে জগা মাষ্টারের গম্ভীরা" লেখা একটি কাগজ টাঙানো যেতে পারে।"

এমনকি, নাটকটির অভিনয়, সাজসজ্জা, ঐকতান বাদন, পরিবেশ রচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা পরিপূর্ণ ভাবে গম্ভীরার অনুসরণে। নাটকটির সূচনায় একটি গানেতে পর্যন্ত গম্ভীরার গানের ভঙ্গি, বিষয়বস্তু ও রূপনীতি লক্ষ্য করা যায়। গানটি ---

নানা বলবো ক্যামন কর‍্যা হায়,
মনের দুঃখে কলজ্যা ফাটে যায়।
কত আশা দিলে, ওয়াদা করলে,
তিরিশ বছর ধর‍্যা হায় ---
আবার কিছু চাহালে, খ্যাতে মিলে,
শুধু যে আখার ছায়।।
চাল ডাল নুন ত্যাল,
খায়া হলো বারোহাল,
আগুন যে দাম,
লোকে পড়হ্যা শুনহ্যা চাকরি পায় না,
বিধি হলো বাম।
কিছু বলল্যা পরে, মিসায় ধর‍্যা,
চালান কর‍্যা দ্যাও যে হায় --
মনের দুঃখে কল্‌জ্যা ফাটে যায়।।

তবে, রাঢ়ের শিবের গাজন আর মালদহের গম্ভীরার মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। কেবল ভাষার পার্থক্য চোখে পড়ে। উত্তরবঙ্গের ভাষার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভাষার পার্থক্য ও নামকরণ ছাড়া অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য আছে। গাজনেও যেমন শিবের চাষ - বিষয়ক গীত আছে, তেমনি আদ্যের গম্ভীরার চাষ-বিষয়ক গীতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। আজো গম্ভীরায় ধান-চাষের উৎসব পালন করা হয়। শিব বাউণ্ডুলে হয়েও চাষের দেবতা। শিবায়ণ ও শিব-সংকীর্তনে যা লক্ষণীয়। আর একটা কথা বলা বোধকরি উচিত হবে — গম্ভীরা গান অপ্রত্যক্ষভাবে বর্তমান কালের আধুনিক সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। গম্ভীরা গানে সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনের অভাব-অনটনের যে হাহাকার তা আজো শুধু ''নানা হে'' নাটকই নয় - বাংলার অনেক আধুনিক নাটকেও উঠে এসেছে। ভাবসাদৃশ্যে অনেক মিলই খুঁজে পাওয়া যায়। ভাষার পাঁচিল কেবল বদলেছে মাত্র!

জারী গান

মুসলমান সম্প্রদায়ের নিজস্ব ঘরানার এটি একটি লোকসঙ্গীত। মুহররম পর্ব উপলক্ষে এ সঙ্গীত গীত হয়। ডঃ গোলাম সাকলায়েন সাহেব জারী গানের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, ''বাংলাদেশের বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের পল্লীঅঞ্চল সমূহে সচারাচর মুহর্রম মাসে মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ নর্তন-কুর্দন সহযোগে কারবালা কাহিনীর বিশেষ বিশেষ বিষাদন্ত্য অংশ অবলম্বনে যে গীথিকা গাহিয়া থাকে ; তাহাকে 'জারী গান' বলা হয়। ভেনং শব্দটি ফরাসী। ইহার অর্থ 'ক্রন্দন', 'বিলাপ'।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যেও অবশ্য এগানের প্রচলন আছে। তবে, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের (বাংলার লোকসাহিত্য ৩য় খণ্ড) মতে, ''মৈমনসিংহ জিলার জারী গান ঐ অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতের অন্যান্য বিষয়ের মত একটি বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। ইহা নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীত হইলেও পুরুষের সঙ্গীত এবং বাংলার সমগ্র লোক-সঙ্গীতের মধ্যে ইহাতেই একটু পৌরুষের স্পর্শ অনুভব করা যায়। ইহার বিষয়বস্তু কারবালার যুদ্ধবৃত্তান্ত; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা নিরবচ্ছিন্ন বীররসাত্মক সঙ্গীত নহে। ইহার যুদ্ধ বিষয়ক বীররসের অন্তরাল দিয়া করুন রসের একটি প্রচ্ছন্ন প্রবাহ বর্তমান আছে। শত্রু দ্বারা ফোরাত নদীর তীর অবরুদ্ধ হইলে এমাম হোসেনের তৃষ্ণার্ত শিশু পুত্র এক বিন্দু জলের জন্য যখন আর্তনাদ করিতেছিল, এমন সময় শত্রুশিবির হইতে নিক্ষিপ্ত এক তীরে শিশুর হৃদয় বিদ্ধ হয়, তাহাতে অতৃপ্ত তৃষ্ণা লইয়া শিশু প্রাণ ত্যাগ করে। যুদ্ধবৃত্তান্তের মধ্যে স্বভাবতই যেসকল করুন বিষয় থাকে, তাহার সঙ্গে এই কাহিনীটিও যুক্ত হইয়া ইহাকে বিশেষ ভাবে করুন রসে আচ্ছন্ন করিয়াছে। অথচ শত্রুর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাও ইহার মধ্যে ব্যক্ত হইয়া ইহাকে বীর রসেরও আধার করিয়াছে।''

বীর রসের আধার হলেও জারী গান মূলত ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। আবদুল হাফিজ তাঁর ''লৌকিক সংস্কার ও বাঙালী সমাজ'' গ্রন্থে এ সম্পর্কে কটি সুন্দর কথা বলেছেন, ''এ গানের মধ্যে ধর্মীয় ও জাদুবিদ্যাগত উপাদান কিভাবে পাশাপাশি অবস্থান করছে বিশ্লেষণ করলেই তা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। কিন্তু তার পূর্বে আর একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। জারী গানের বিষয় কারবালার বিয়োগান্ত কাহিনী অবলম্বন করে রচিত হলেও, এ-গানের মধ্যে অন্যান্য বিষয় ও প্রসঙ্গ প্রবেশ করেছে।''

কবি জসিমুদ্দিন জারী গান সম্পর্কে একটি আলোচনায় আবার জারী গানের বিষয়-বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলেছেন — ''এই গানের বিষয়বস্তু মুসলমানী পৌরাণিক ঘটনাবলী হইলেও মুহররমের করুণ কাহিনী ইহাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কোন কোন জারী গানের দলে চণ্ডীদাস-রজকিনী, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি কাহিনীও জারীর সুরে গাওয়া হয়।''

তবে, জারী গান হলো দীর্ঘ কাহিনীমূলক একটি গীত। এর একজন মূল গায়েন গানের মধ্য দিয়ে কাহিনী পরিবেষণ করে থাকে, আর নাচ করতে করতে তার সঙ্গে একটা ছোট দল নাচের তালে তালে ধুয়া ধরে কাহিনী বিস্তারে সহযোগিতা করে থাকে। জারী গানে বন্দনা গীতও শুনতে পাওয়া যায়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের (লোকসাহিত্য ৩য় খণ্ড) গ্রন্থটি থেকে মৈমনসিংহের ক'টি জারী গানের বন্দনাগীত এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরছি --

১. হায় হোছেন।

পূবেতে বন্দনা করি পূবের ভানুশ্বর,
একদিগে উদয় গো ভানু চৌদিগে পশর।
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীন্নদী সাগর,
যেখানে বাইতো ডিঙ্গা চান্দ সাগর
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত,
যেখানে রাইখ্যাছে আলীর মাল্লামের পাথর।
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্‌কা হেন স্থান,
উদ্দিশে জানায় গো ছেলাম মমিন মুছলমান।
ইহার পশ্চিমের কথা কহনও না যায়,
রাড়িয়ে রান্ধিলে ভাত বরাহ্মণে খায়।।

২. হায় হোছেন।

চাইব কোনা পৃথিবী বানলাম মন করিয়া স্থির,
সুন্দরবন মোকামে বানলাম গাজী জিন্দা পীর।
সাজী সায়বের বাপের নাম গো শাহা সেকান্দর,
পাথর দিয়া বান্ধাইছেন তিনি বৈরাট নগর।
হাত পাতিয়া মাইলে পাথার বুক পাতিয়া লয়,
ছাট্‌নি ভরে পড়লে পাথর জুদা জুদা হয়।
আল্লা আল্লা বল ভাইরে নবী কর সার,
নবীর কলেমা পড়ি হইয়া যাইবা পার।
লাইলাহা পড়রে মিঞা কলেমা রব্ব বাণী,
আর নি লবে মানুষ জনম বল আল্লার ধ্বনি।
আল্লা ভাবো তইক্যা রাখ, যার গো দিলে নাই
থাক্ বন্দা বেহেস্তে যাইব তার দোজখে জাগা নাই।

দোজখ সাছা, দোজখে মিছা, দোজক নৈরাকার
এই দোজখে পুইড়্যা মরব বান্দা গোনাগার।
দোজখের কীড়া ভাইরে আঙ্গুল পরিমাণ
সেই কীড়ায় কুড়িয়া খাইব পাপীরো পরাণ।।
ভাই বল বান্ধব গো বল পন্থের পরিচয়,
মইলেনি কেউ সঙ্গে যাবে, ইহি কারো নয়।।
হায় হোছেন।

৩. আইস, মা, ফতেমা, মাগো, তোমার গুণ গাই
অধম দেইখ্যা ছাড় যদি ঐ আল্লার দোহাই।
আইস, মা, ফতেমা, মাগো, ভুবনের ছায়বাণী,
এই অধম বালকে লইলাম তোমারো কাহিনী।
তুমি যদি ছাড়, মাগো, আমি না ছাড়িব,
বাজুইন্যা নেপুর হইয়া চরণে ধরিব।
খেড়্ওয়ালেরি কান্ধে, মাগো, থইয়া রাঙ্গা পাও,
আমারো কান্ধেতে বইয়া হরফ জুগাও।
তুমি অইও কল্পতরু, আমি অইব লতা,
যুগল চরণ বেইড়্যা রাখব ছাইড়্যা যাবে কোথা।
সভা কইর‍্যা বইছেন মিঞারা মমিন মুছলমান,
সবারো জনাবে আমি অধমের ছেলাম।

তবে, জারী গান যে মূলত শোক-বিহ্বল মুহররম মাসেই ব্যবস্থা হতো এবং জারী গান শুরু করার জন্য মানসিকভাবে অংশগ্রহণকারী ও শ্রোতারা উভয়েই প্রস্তুত থাকতো। জারী গানের পরিবেষনা সম্পর্কে ডঃ আশ্রাফ সিদ্দিকী (লোকসাহিত্য ২য় খণ্ড) সুন্দর কটি কথা বলেছেন — "উন্মুক্ত বৃক্ষ বা শামিয়ানার নিচে টাংগাইল-ময়মনসিংহ অঞ্চলের জারী গানে সাধারণতঃ দুটি দল থাকতো। একদল পরিশ্রান্ত হলে অন্যদল গাইতো। প্রধান কবিয়ালের পায়ে নূপুর, হাতে দফ্, কখনো গালে হাত দিয়ে (বাজনা বন্ধ) গান করতো — কখনো মধ্যে বসা দোহারদের চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরে বাজনা বাজাতো দোহারগণ — বয়াতী গানের মাধ্যমে নানা অঙ্গ-ভঙ্গী করে কাহিনীকে এগিয়ে নিত — যখন শত্রুর তীর এসে লাগছে সে নিজেই বুক চেপে (যেন তাঁকে বিঁধছে) করুণ সুরে গাইতো ঃ হায়রে, শোকেতে হোসেন সাহা কত যে কান্দিল। আসমান জমিন শোকে জার জার হইল রে।। চারিদিকে হায় হায় কান্দনের

রব — হুরপরি জিন সব করে কলরব।। কান্দে বিবি সখিনা রে — একদিনের সাদীর দুল্‌হীনরে ভাই তার কান্দনে গাছের পাতা ঝরেরে।।

বলা বাহুল্য শোকের মহরম মাসে এ গান শুনে সব বৃদ্ধাদের চোখ অশ্রু-সজল হ'ত। যুদ্ধের বর্ণনার সময় বয়াতী দফ্ বাজাতো। দোহারদের মধ্য থেকে একজন (পাইলে) আসর থেকে উঠে কাঁধে ঝোলানো ছোট্ট ঢোলক বাজিয়ে চলতো — লম্ফে লম্ফে ঘুরতো চারদিক, যুদ্ধ যেন এখানেই লেগে গেছে। আরেক দল তেল পাকানো লাঠি নিয়ে পরস্পর দুইজন করে যুদ্ধ করতো — লাঠিতে লাঠিতে শব্দ হ'ত টাস-টাস ঠাস-ঠাস আর সেই টেন্‌স্ মুহূর্তে বয়াতী বা গায়ন দফে তাল দিয়ে গলার সমস্ত শক্তি এনে, মাটিতে পা ঠুকে গাইতো - - যে-সমে এমাম শাহা ময়দানেতে গেল। ভয়েতে দুশমন সব কাঁপিতে লাগিল।। পাথুরিয়া জমি যত ময়দানেতে ছিল। ঘোড়ার পায়ের খুরে সব তুর হইয়া গেল।। জুলফিকার খিঁচে মারে দুশমন উপরে। এক সাথে কেটে চলে হাজারে হাজারে . . . . ।"

তিনি আরো বলেছেন, "মাঝে মধ্যে হাস্যরসও ছিল — এই যেমন এজিদ হানিফার দাপট সহ্য করতে না পেরে অবিরাম কাপড় খারাপ (পোয়খানা - পেসাব) করতে লাগলো।" আশ্‌রফ সিদ্দিকী ফরিদপুর অঞ্চলের জারীগানে "বীররস লোক - মনঃ তত্ত্বের আরও কাছে" মনে করেন। তিনি একটি গানের উল্লেখও করেছেন। যেমন —

সাজ সাজ বলিয়ারে শহরে পৈল সাড়া।
সাত হাজার বাজে ঢোল চৌদ্দ হাজার কাড়া।।
প্রথমে সাজিল মর্দ আহলাদি ডগরি।
পাঁচ কাঠা ভুই জুইরা বসে মর্দ এয়সা ভারী।
তারপরে সাজিল মর্দ তুরুক আমানি।।
সমুদ্দুরে নামলে তার হৈত হাঁটু পানি।
তারপরে সাজিল মর্দ নামে লোহাজুড়ি।
আছড়াইয়া মারত যে হাতীর শুঁড় ধরি।
তারপর সাজিল মর্দ নামে আইন্দা-ছাইন্দা।
বাইশ মন তামাক নেয় তার লেংটির মধ্যে বাইন্ধ্যা।
আতালী পাতালী সাজে গগনেরি ঠাজ।
মেঘলাল সাজিয়া আইল তাম-তুরকের বেটা।।
তুগুলি মুগুলি সাজে তারা দুই ভাই।
ঐরাবতে সাইজা আইলো আজদাহা সেপাই।।

বন্দুকি বন্দুকি চলে কামানে কামান।

ময়ূর ময়ূরী চলে ধরিয়া পেখামরে।।...

এই গান প্রসঙ্গে আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর অভিমত হলো, "অপূর্ব উপস্থিত বুদ্ধি বলে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসারিত এই গান লোকায়ত বাংলা এবং লোকমানসের এত নিকটে যে এর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে না।"

জারী গান আলোচনার সমাপ্তিকালে তিনি আরো কতকগুলি কথা বলেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "মহরম মাস ছাড়া অন্য সময়ে সাধারণ কাহিনী, এই যেমন সোনাভান, হাতেম তাই, এমনকি বেহুলা লক্ষীন্দরকেও জারীর ঢং-এ নামতে দেখা গেছে। এইসব জারীকে পরবর্তী সময়, সম্ভবতঃ অধিকতর জনপ্রিয় করার মানসে ছোট ছোট কিশোরদের শাড়ী পরিয়ে কিছুটা নৃত্য-গীত পরিবেশনরও উদ্যোগ দেখা গেছে।" বেহুলা-লক্ষীন্দর পালাতেও অনুরূপভাবে পরবর্তী পর্যায়ে নাচে প্রবিষ্ট হওয়ার কথাও তিনি বলেছেন।

আবার, এম, এম, সামীয়ুল ইসলাম "উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য" স্মরণী একটি সংকলনে জারীগানের শ্রেণীর বিন্যাস করেছেন এভাবে —

১. মর্শিয়া জারী ২. মাতাম জারী ৩. নাড়া জারী ৪. চালি জারী

৫. জব জারী ৬. ব্যাঙ জারী ৭. রচনার জারী ৮. জারী যাত্রা

বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখলে মর্শিয়া, মাতাম, চালি ও জারীযাত্রায় মুররমের করুণ কাহিণী রূপাঙ্কন করা হয়েছে। নাড়াজারী হলো আধ্যাত্মিক গানের পর্যায়ভূক্ত। আর জবজারী, ব্যাঙজারী ও রচনার জারীতে সমকালীন ও স্থানীয় বিষয়ের কথা উঠে এসেছে।

কাজেই, আশ্‌রাফ সিদ্দিকীর মূল্যবান অভিজ্ঞতার পাশাপাশি এম, এম, সামীয়ুল ইসলামের জারী গানের শ্রেণীবিন্যাসের কথা ধরলে একটা জিনিস আমাদের কাছে বোধকরি বেশ জলের মতন পরিষ্কার --- কি শ্রেণীগত, কি বিষয়গত সব দিক দিয়েই জারী গান বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি সম্ভার। কাজেই, নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে, মুহররমের করুণ কাহিনীর নাগপাশ ছিন্ন করে জারী গান সহজেই সাধারণ মানুষের লৌকিক আনন্দ-উৎসবেও ও দিনযাপনের দর্পন রূপে, কি বীররস, কি হাস্যরস, কি আধ্যাত্মিক চেতনায় নদীর বাঁকের মতন বৈচিত্র্যময়ী হয়ে উঠেছে।

এমনকি, একটি আধ্যাত্মিক মর্শিয়া বা জারীতে লোকসংস্কারের দুই উপাদান -- ধর্ম ও যাদুবিদ্যা বিচিত্রভাবে কিরকম প্রকাশ পেয়েছে তার নিদর্শনস্বরূপ আবদুল হাফিজের সংগৃহীত রংপুর জেলার একটি জারী গান এখানে তুলে ধরছি --

দারখাতের মইচ্যা

(বৃক্ষের মর্শিয়া)

সমজো মমিন দেলের সাত
কুদরতি এক দরখাত
শুণ্যকারে দেখা মমিন
পয়দা কিয়া আপে পাকজাত।।

নাছায়ি ঃ পাকজাত,
শুণ্যকারে রাইকছে দরখাত
আসমান জমিন ছাড়া ভাত।।
দেখ মমিন নেকজাত,
পাতায় পাতায় দেখ আজব কাজ।।

ধুয়া ঃ ঐ দরখাতের দেখ ভাইরে,
ডালে ডালে পাত।

পদ ঃ দরখাত পাতায় দরিয়া দেখ শুণ্যকারে রয়,
সাত রঙ্গের পানি দরিয়ায় বহে দেখ সর্বদায়।
হায়রে হায়।।
তারে মরজি খোদার ওহি দরখাত
পবন বেগে যায় তারে আজব দরিয়ায়
দেখ হাদি আজব কলের কাজ।।

পদ ঃ ডালে ডালে পানির ধারা নিরবধি বয়,
তাতে দরিয়ার পানিত আজব কাণ্ড
কইয়াছে ভাই হায় খোদায়,
হায়রে হায়।।
খোদার মহিমা ভাইরে
কে বুজিতে পারে তারে
দরিয়ার পানির উপর দেখ
আজব খোদার কাজ।।

ধুয়া ঃ ও হাদি দরখাত পাতায় দরিয়া বয়,
ওরে এমন আজব দরিয়া কইরাছে খোদায়।।

পদ ঃ খোদা-তালার মদত হয়.
ওরে সৃষ্টি ছাড়া বৃষ্টি হয়,
দরিয়ার পানি উজান মুখে যায়।।

পদ ঃ ডালে ডালে ধারা বয়,
আজব কাণ্ড দেখ তায়,
দরিয়ার পানিত্ গোস্ত ভেইসে যায়।।

ধুয়া ঃ একবার হায় রে হায়,
মরি মরি মরি মরি
দরিয়াতে গোস্ত ভাসে দেখ শুণ্যকারী
হাদি ভাই গো।।

পদ ঃ বইল্তে পার কিতাব চুরি,
মান বাড়িবে মুন্সীগিরী,
কোন দারখতের পাতায় দরিয়া বল,
বয়ান করি,
হাদি ভাই গো।

পদ ঃ বয়ান করি এ করি,
কখন গোস্ত কখন তরি ভাল,
খাইট্বেনা ভাই কারি কুরি.
বল বিচার করি,
হাদি ভাই গো।।

ধুয়া ঃ কোবার ছাছে দেখ, করে এলায় পাছতে।।

পদ ঃ বুইছে সুইজে ভারি ভারি,
অর্থকারিণী বলে যখন .
তখনি মরি হায় হায়।।
এখনি কোবার চাছে করে এলায় গো,
নাকে কথায় কয়,
পড়ে বোধোদয়,
না পারে অর্থ করিতে।।

পদ ঃ অর্থ বুইজে ভারি ভারি,
কবে সারি সারি,
কেহ তর্ককারিণী মরি হায়।
পিছে পিছে সঙ্গ ধর গো,
মুখের কথা নয়।।
হাদিস দেইকতে হয়,
হবে না মুখের কথাতে।।

সমস্ত গানটিতে যাদুবিশ্বাসের অশরীরী পরিবেশ ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে শূন্যে অবস্থিত বৃক্ষ, বৃক্ষের পাতায় পাতায় বহমান দরিয়া, দরিয়ার পানিতে ভেসে-যাওয়া মাংস প্রভৃতি দৃশ্য যাদুতে বিশ্বাসী সমাজের পক্ষেই সৃষ্টি করা সম্ভব। এই অদ্ভুত তত্ত্ব-কথায় ব্যাখ্যাও সহজে যে সম্ভব নয় তা-ও গানের শেষে বলা হয়েছে।

এখানে একটা কথা বলা উচিত হবে, জারীগানের এই যাদুবিদ্যা আধুনিক কবিতাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। চল্লিশের প্রাজ্ঞ কবি রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর কবিতাতে, এমনকি পঞ্চাশের কবি শক্তিচট্টোপাধ্যায় ও সত্তরের কবি জয় গোস্বামীর কবিতাতেও নজরে আসে। বিশেষ করে রমেন্দ্রকুমার যখন বলেন 'জনসাধারণ, প্রকৃতি ও মানুষঘুড়ি' কবিতাটির শুরুতে ---

আকাশে মানুষঘুড়ি কী মজার, দ্যাখো!

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩১১ ও ১৩১২) ডাঃ মোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য "নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা" শীর্ষক একটি দীর্ঘ আলোচনায় জারী গান সম্পর্কে যে কতকগুলি কথা বলেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখকের মতে, " সঙ্গীত কবিত্বের মধ্যে নিরক্ষর কবি হস্ত চালিত অথবা কল্পনা প্রসূত গীতি কাব্যে জারী গীত একটি অতি উচ্চ অঙ্গের কবিত্বময়, নির্দোষ আমোদ। . . . . জারী অর্থে প্রচার। ইহা আরবিক শব্দ এবং অধিকাংশ আরবিক ধর্মের ছায়ায় প্রতিপালিত নিরক্ষর মুসলমান কবিগণকৃত আরবিক কাহিনী ঘটিত সঙ্গীত। তবে হিন্দুর দেশে থাকিয়া যে সকল মুসলমান কবি বাহিরে 'কোরাণ' ভিতরে পুরাণ লইয়া হিন্দুর সঙ্গে অধিকাংশ সময় চলাফেরা করে, তাহারা দুই একটি হিন্দু ধরণের জারী গীত প্রকাশ করিয়াছে। এই গীতের মধ্যে "ধুয়া" নামে একটি অংশ আছে; সাধারণ সঙ্গীতের যেমন আভোগ, অন্তরা, চিতেন প্রভৃতি অংশ, আর মুখড়া, অবস্থায়ী, কোলখোঁজু, মিল ওপর চিতেন প্রভৃতি রীতি আছে। এই জারী গীতেও সেইরূপ ধুয়া, আবেজ, ফেররা, মুখড়া বাহির চিতান প্রভৃতি অংশ আছে। প্রত্যেক গীতের শেষ ভাগে বা অগ্রে একটি অথবা আবশ্যক বোধে দুইটি থাকে।"

জারীগানের কবিত্বশক্তির উৎকর্ষতা কত ব্যাপক ও গভীর এবং ঐতিহ্যশালী তার সমর্থন পাওয়া যায় মোক্ষদা চরণবাবুর উক্ত কথাগুলি থেকে। এবং এই জারীগানের মধ্যে কবিত্বশক্তির নিদর্শনে হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্কে 'একই বৃন্তে দুটি ফুল' — এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মুসলমান সংস্কৃতিতে তাই হিন্দুয়ানার কিছু ছায়া উজ্জ্বলতার সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন জারীগানে কখনো-সখনো মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা।

তাছাড়া, জারীগানে কি নেই — এমনকি, বিবাহের বর্ণনা ও বিলাপের বেদনাও শুনতে পাওয়া যায়। জারীগানে বিলাপের বেদনা শুধু চমৎকৃতই করে না দক্ষ কবিত্বশক্তির গুণে, মনকে ও হৃদয়কে একইসঙ্গে ছুঁয়ে যায় এবং সমব্যথী করে তোলে। যেমন —

ওরে বাপ, কাসেম আলি, গেলিরে কোথায়
হায়-হায়।
আমার মদিনার চাঁদ আঁধারে লুকায়।।
বাসর খালি করে গেলি ওরে জাদুধন,
হায়-হায়।
দেখে বুক ফাটে সাকিনার বচন।
সাকিনার কপালে আগুন জ্বেলে পালালি,
হায়-হায়।
লগুনের লওসা কোথায় লুকালি!
কি বলে বাপ সাকিনাকে আমি বুঝাব,
হায়-হায়।
আমি কি দিয়ে বাপ তারে ভুলাব।।
পানি নিয়ে আসি বলে গেলি কারবালায়,
হায়-হায়।
তুই পড়ে কেন আছিস্‌রে ধূলায়।।
ফোরাত হ'তে পানি আনতে আর কি যাবি না,
হায়-হায়রে, বাপ, তুই কি দুটা কথা বলবি না।।
দেখ চেয়ে বাপ, এজিদের লস্কর ডাকিছে তোরে,
হায়-হায়।
কেন পড়ে আছিস ঘুমের ঘোরে।।
মদিনার চাঁদ ডুবলো, রে বাপ, কারবালায় এসে,
হায়-হায়।

আমি শূন্য ঘরে যাব কি বলে।।
ওঠ বাপ, যাদুমণি, চড়বে ঘোড়ায়,
হায়-হায়।
এ জগতে আর কি তোরে পাব না।।
ওয়ে বাপ, কাসেম আলি, গেলিরে কোথায়,
হায়-হায়। মদিনার চাঁদ আঁধারে লুকায়।।

এই গানটিতে লক্ষণীয় 'হায়-হায়' শব্দটির বহুল প্রয়োগ, যা গানটির মধ্যে এক বিষন্নতার ও বেদনাভরা বিরাট শূন্যতাকে প্রকটিত করেছে। এবং একইসঙ্গে এই বিরাট মনকেমন করা বেদনাক্লিষ্ট। শূন্যতা সব মানুষের মন ও হৃদয়কে ছুঁতে সক্ষম হয়েছে বলা যেতে পারে। সার্থক কবিত্বশক্তির উৎকর্ষতার এ এক উজ্জ্বল নিদর্শন বলা যেতে পারে। যা জারীগানে আমাদের হামেশাই নজরে আসে। আর একটা কথা বলা এখানে যুক্তিসঙ্গত হবে, এই জারীগানের মধ্যে বেদনাভরা বিরাট শূন্যতাকে প্রকটিত করার যে প্রয়াস দেখি --- তা-ও আধুনিক কাব্যকে গভীরভাবেই প্রভাবিত করেছে। আধুনিক কবিতার দক্ষ রূপকার জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এ জিনিস লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে কবি জীবনানন্দ যখন বলেন ---

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!

জীবনানন্দের 'হায় চিল' কবিতাটিতে লক্ষণীয় আর একটি ব্যাপার হলো প্রথম এই দুটি পংক্তির কবিতাটির শেষে পুণঃ ব্যবহার। এই কবিতাটিতে কবি বেদনাহত বিরাট শূন্যতার তীব্রতাকে প্রকট করেছেন। যা জারীগানের মতই মনে হয় নাকি আমাদের? যদিও এ ভাবনা কবি জীবনানন্দের অনেক কবিতাতেই চোখে পড়ে।

জারীগান যে আধুনিক বাংলা কবিতাকে নানাভাবে অলংকৃত করেছে ভাবে-ব্যঞ্জনায় ও শব্দ-প্রয়োগ কৌশলে তা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

জাগ গান

জাগ গান লোকসঙ্গীতের একটি প্রসিদ্ধ গান। জাগ গান আকারে বেশ দীর্ঘও হয়। জাগ গান কেবল রংপুরেই নয় — ধুবড়ী, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলাতেও প্রচলিত আছে। মদন চতুর্দশী উপলক্ষে জাগের গান প্রচলিত। সমস্ত রাত্রি ধরে জেগে এই গান গাওয়া হয় বলে গানের নাম জাগ গান। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এই জাগ গান সম্পর্কে বলেছেন ("বাংলার লোকসাহিত্য" গ্রন্থে ৩য় খণ্ডে) "পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক শ্রেণীর এক প্রকার গানকে জাগা গান ও জাগরণ গান বলা হয়। জাগ গানের সাধারণত মুসলমান সম্প্রদায়ের পীর দর্বেশদিগের অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা বর্ণিত হইয়া থাকে। তবে রাধাকৃষ্ণ এবং নিমাই সম্পর্কেও জাগ গান শুনিতে পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক জাগ গানগুলির মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাকৃষ্ণের চরিত্রের রূপটি প্রত্যক্ষ করিতে পাওয়া যায়। তবে ইহার অংশগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত আনুপূর্বিক কাহিনীর আকারে কোথাও গ্রথিত নহে। কোচবিহার জেলার সংগৃহীত এইরূপ একটি গান এখানে উল্লেখ করছি। পালা আকারে গানটি রচিত। কিছু অংশ তুলে ধরছি মাত্র —

রাধা কালিয়া কৃষ্ণ জন্মিল কাল যমুনারি পানি।
উপাজিল কালিয়া কৃষ্ণ ছাড়নু বেচি কিনি।।
হাট ঘাট ত্যাজিনু, বড়াই, মথুরা নগর।
ছাওয়াল কানাইব গুয়া খাইয়া কি হইল ঝগর।।
একদিন দরশন হইল ফুল-বৃন্দাবনে।
সেইদিন হইতে ছাওয়াল কানাই আইসে ঘনে ঘনে।।
আগ দুয়ারে আইসে কানাই পাছ দুয়ারে চায়।
সরুয়া টোকরাই খানি দুই হাতে বাজায়।।
সরুয়া টোকরাই খানি যেন স্বরগের তারা।
মদরে মারিল বাণ গেইল কদমতলা।।
কানাই গেল কদমতলা রাধে রইল ঘরে।
ঘরে আমি চন্দ্রননী ভাবিত অন্তরে।।
চম্পা কলা নয় কানাই মিঠে মিঠে খাঁও।
মোন্দা জল নয়, হে কানাই, মোজা ধারে খাঁও।।

নেতের বস্ত্র নয়, হে কানাই পিন্দিয়া, ওসার চাঁও।।
খেটে জাও পামরী রাধে সেইটে কৃষ্ণের নাম।
মরিয়া যাও পামরী রাধে টুটুক রাধার নাম।।

বড়াই। কাণে কাণে কও হে কথা শুনেক চন্দ্রাননী।
তোর কারণে নন্দের ছাইলা ছাড়্চে অন্ন পানি।।

রাধা। নন্দের ছাইলা সুন্দর কানাই সে ভাগিনা হয়।
ধাক্কা দিয়া বাইর করোঁ বুড়িক মিছা কথা কয়।।
আস নয় পড়শী নয় মোদের ভাগিনা ।
কাইল বিয়ানে আস্‌বে কানাই আমার আঙ্গিনা।।
কাল শিলায় বাটায় নাই খাঁও পিষিয়া।
ঘরে ছিল কাল বিলাই ফেলাই ছোঁ মারিয়া।।
কাল মেঘ কোকিলের রাও নাই সয় গো তরে।
ঘরে ছিল কাল গাভী বেচাছো সত্বরে।।

বড়াই। কালা কেন নিন্দ রাধে কালাক কেন নিন্দ।
কালা হেন কাজলের ফোঁটা কপালে কেন পিন্দ।।
কালা নয় হে, ও নাতনী, কালা নয় শ্যাম।
অঞ্চলে লিখিয়া রাখ কালার নিজ নাম।।
ঐ ছাইলা করিলে দয়া পাপ বিমোচন।।

তবে, জাগের গান মুখেমুখেই রামায়ণ পাঠের মতন প্রায় অনেকেই শিখে থাকে। কেউ কেউ আবার লিখেও নেয়। কিন্তু সর্বত্রই যে মহাশঙ্কট লক্ষ্য করা যায় জাগ গানে তা হল অক্ষর দ্বারা তা হল উচ্চারণের প্রকাশে। এ সম্পর্কে সুশীল কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তার " উত্তর বঙ্গে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি" গ্রন্থে সুন্দর কটি কথা বলেছেন, "বর্ণ মালায় যে কয়টি বর্ণ আছে, তা ঐ বর্ণগুলির আবিষ্কার সময়ে উচ্চারণ বুঝাবার নিমিত্ত বৈদিক সময়েও বর্ণমালার অক্ষরগুলির ব্যতীত অন্যান্য সঙ্কেত দ্বারা শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ বুঝানো হ'ত। এক-একটি বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ প্রকটিত হ'ত। কিন্তু কালে বৈদীক সঙ্কেত গুলি লোপ পেল। পুরাণ প্রভৃতির হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ ভিন্ন অন্য ভেদ রইলো না। এখন সে ভেদটুকুও বড় নাই। এখন আর পাঠের সময় হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ ক'রে পাঠ করা হয় না। সুতরাং বলবার সময় উচ্চারণে যে ভেদ থাকে, লিখবার সময় সে ভেদ রাখা বড় কঠিন। উচ্চারণগুলি যিনি অবগত আছেন, তিনি লিখে নিতে পারেন।

জাগের গান রংপুর প্রভৃতি স্থানের অথবা কামতাবিহারী ভাষা গান। কামতাবিহারী ভাষার উচ্চারণ অপর স্থানের উচ্চারণ থেকে অল্প-বিস্তর পৃথক। অথচ বর্ণ মালা এক। সুতরাং বর্ণমালার অক্ষর দ্বারা উচ্চারণ বুঝিয়ে দেওয়া কঠিন। এজন্য প্রকৃত উচ্চারণ বুঝতে হ'লে কতকগুলি সঙ্কেতের দরকার। সঙ্কেতগুলি এখনও স্থির নির্ণয় ক'রে উঠতে পারা যায় নি।"

আবার, 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ১৩৩১সালের মাঘ মাসের সংখ্যায় (৩য় বর্ষ; দ্বিতীয়ার্থ; ৬ষ্ঠ সংখ্যা) মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন 'জাগ গান' নামে যে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটি লিখেছেন, তা থেকে 'জাগ গান' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তার প্রচলিত ধারা সম্পর্কে বলেছেন — "পাবনা জিলার নালা পল্লীতে জাগ গান প্রচলিত আছে। রাখাল বালকগণ পৌষমাসের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রাত্রিকালে বাড়ী বাড়ী পল্লীর নিরক্ষর অজ্ঞাত কবি রচিত গান গায় এবং ভিক্ষা লয়। এই ভাবে সমস্ত পৌষ গান গাহিয়া যে সমুদয় পয়সা, চাউল, ডাইল প্রভৃতি পায় তাহাই দিয়া পৌষ সংক্রান্তির দিনে নিজেরা মাঠে পাক করিয়া খায়।"

জাগ গান রচনাকাল ও ভাষা সম্পর্কে লেখকের অভিমত হলো, "এই সব রচনাকাল বাঙলায় মুসলমানগণের প্রতিপত্তির সময়কার বা তার পরবর্তী সময়কার এবং ইংরেজ আমলের পূর্বেকার তাহার কারণ ইহার ভাষা আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু শব্দ বহুল।"

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের কথাগুলি যে নেহাৎই ফেল্না নয় তা বোঝা যায় জাগ গান গুলি পাঠে। এ কারণে সম্ভবত জাগ গানগুলিতে শব্দ-প্রয়োগে বৈচিত্রময়তা চোখে পড়ে। বোধ গম্যের জন্য আমাদেরও একটু অধিক পরিশ্রমও করতে হয়। তবে, জাগ গানের বৈশিষ্ট হল কাহিনী বিন্যাসের ফলে মোটামুটি ভাবে সকলেই একটা সারৎসার বুঝতে পারে। সব শব্দের অর্থ নিরূপণ করতে না পারলেও ক্ষতি নেই। পাঠে রস ক্ষুন্ন হয় না প্রধাণত জাগ গানগুলি স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে রচিত বলে। তবে, পাবনা জেলায় জাগ গানের বহুল প্রচলন থাকলেও কিন্তু এ গানের পীঠস্থান হলো রংপুর। রংপুরের এটিকে একটি জনপ্রিয় বহুল প্রচারিত লোক সঙ্গীত বলা যায়।

জাগ গানগুলি সাধারণত যে লৌকিক চরিত্রের মাহাত্ম্য বা পীর-সাধুদের মাহাত্ম্য প্রচার হয়ে থাকে,— এ-প্রসঙ্গে আবদুল হাফিজের "লৌকিক সংস্কার ও বাঙালী সমাজ" গ্রন্থটি থেকে মানিকপীর, সোনাপীর, সোনারায় প্রভৃতি পীরের জাগ গানের মধ্যে রাজসাহী জেলায় প্রচলিত মানিকপীরের জন্ম বৃত্তান্ত একটি জাগ গান আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন — 'পীর শাহ মীরের ঘরে পীরের জন্ম' — অর্থাৎ মানিকপীর শাহ মীরের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় পীর চিন্তা করতে থাকেন, গানের ভাষায় —

উদরে থাকিয়া পীর ভাবিতে লাগিল।
মাতৃগর্ভে বয়স যখন দুইমাস —
বিষম নাড়ি ধরিয়া মায়ের বিষব মারে টান।

মাতৃগর্ভে এইভাবে দশমাস দশদিন থাকার সময় পীর মাকে খুব যন্ত্রণা দিয়েছে, তারপর জন্মগ্রহণ করবার পর---

ভূমিষ্ঠ হইয়া নিল আল্লাহ্জীর নাম।

মানিকপীরের জন্ম প্রধাণত যাদুবিদ্যাগত ও অতিপ্রাকৃত জন্মকাহিনীর অনুরূপ। আবদুল হাফিজের গ্রন্থটি থেকে জানা যায়, পাবনায় প্রচলিত সোনাপীর সম্পর্কে তিনি বলেছেন, সোনাপীর প্রধাণত গোয়ালাদের রক্ষা কর্তা। জীব-জন্তুর ওপরেও তাঁর আধিপত্য কম নয়। পাবনার প্রচলিত সোনাপীরের জাগে বলা হয়েছে যে মানিকপীর জন্মগ্রহণ করবার পর সোনাপীরের সঙ্গে গেলেন এক গোয়ালার বাড়িতে। সে ঘরে দধি রেখে মিথ্যে বলায় ---

আগাড়ি পাছ করে বাতাসে দিল বাড়ি।

নবলক্ষ ধেনু মল বিশ লক্ষ বাছুরী।।

এছাড়া গোয়ালার আত্মীয়-স্বজন মারা যাওয়াতে শেষপর্যন্ত সোনাপীরের অনুরোধে মানিকপীর গোয়ালার 'নবলক্ষ ধেনু বিশলক্ষ বাছুর'কে বাঁচিয়ে তোলেন। কাহিনীর শেষে পীরদের মাহাত্ম্যও স্বীকার করা হয়েছে গানটিতে সুন্দরভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে বেশ আন্তরিকভাবে --

আগে যদি জানতাম তুমি সোনাপীর।

আগে দিতাম দুগ্ধকলা পাছে দিতাম ক্ষীর।।

জিন্দা চার যুগের সার।

মারিয়া জিলাতে পার, অপার মহিমা তোমার।

মরবার পর যে জীবন দান করা অর্থাৎ 'নবলক্ষ ধেনু বিশলক্ষ বাছুর'কে বাঁচিয়ে তোলার মধ্যে যাদুবিদ্যার বিশ্বাসই ফুটে উঠেছে বলা বোধকরি সঙ্গত হবে।

মোটামুটি একটা কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই রংপুর থেকেই জাগ গান পাবনা, রাজসাহী ও অন্যান্য জেলাতে ক্রমশ প্রসার লাভ করে। লৌকিক চরিত্রের মহিমার মাহাত্ম্য কত সুন্দরভাবে জাগ গানে প্রচারিত হতো তার একটি নিদর্শনস্বরূপ এখানে তুলে ধরছি। পীরের মাহাত্ম্য কীর্তনই গানটিতে প্রকটভাবে প্রকাশিত। গানটি পাবনা জেলার। গানটি হুবহু এখানে তুলে ধরছি ---

ওখান হতে পীর বিদায় হ'ল পঞ্চমাণিক সঙ্গে নিল

আয় পীর চাল্যাজীর বাজারে

শোন রে চাল্যাজী, ভাই, সোওয়া সের চাউল দেও খাই

দোওয়া করিব আল্লাহজীর ফকির।।

শোন রে ফকির মোরে তৈয়ার চাল নাইক ঘরে

ভাড়ালি আল্লাজীর ফকিরে।।
পীরের মনে ছিল হক্কা চালেতে মারিল তুক্কা
সব চাল শূন্যেতে উড়াল।
সুমতি ছিল চাল্যাজীর কুমুতি লাগিল।
তৈয়ার চাল থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল।।
কান্দেরে চাল্যাজীর নারী কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরেরই পায়।
কান্দন শুনিয়া জোরে ডাক দিয়ে বলে পীরে
মনের বাঞ্চতা পূর্ণ করে খাই।।

ওখান হতে নারী বিদায় নিল পঞ্চ মানিক সঙ্গে নিল
যায় গুড়িয়ার বাজারে।
শুন রে গুড়িয়া ভাই, সোওয়া সের দুধ দেও খাই
দোয়া করিব আল্লাজীর ফকির।।
সুমতি ছিল গুড়িয়া কুমতি লাগিল,
তৈয়ার গুড় থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল।
ফকির হইল হুক্কা গুড়েতে মারিল তুক্কা
সব গুড় শূণ্যেতে উড়িল।।
কান্দেরে গুড়িয়া নারী কার ধন করিলাম চুরি
কেন্দে পড়ে ঐ পীরের পায়।
কান্দর শুনিয়া দূরে ডাক দিয়া বলে পীরে
মনের বাঞ্চতা পূর্ণ করে খাই।।

ওখান হতে বিদায় নিল পঞ্চ মানিক সঙ্গে নিল
যায় কুমারের বাজারে।
শুনরে কুমার, ভাই, একটি পাতিল দাও খাই,
দোওয়া করিব আল্লাজীর ফকির।।
সুমতি ছিল কুমারের কুমতি ধরিল,
তৈয়ার পাতিল থাকতে ঘরে ফকিরে ভাঁড়াল।
ফকির হইল হুক্কা পাতিলে মারিল তুক্কা

সব পাতিল শূণ্যেতে উড়িল।।

কান্দে রে কুমারের নারী কার ধন করিলাম চুরি

কেন্দে পড়ে ঐ পীরের পায়।

কান্দন শুনিয়া জোরে ডাক দিয়ে বলে পীরে

মনে বাঞ্ছা পূর্ণ করে খাই।।

সা জিন্দা ফকরুল্লা ও জিন্দা পীর,

মারিয়া জিলাতে পারে অপার মহিমা তোমার।

শুনতে খেরুয়া ভাই অন্য বাড়ী যাই।

এ বাড়ীর মানুষ গরুর বাড়ুক পরমাই।।

বৈষ্ণবপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আখ্যানও জাগ গানের বিষয় হয়েছে পরবর্তীকালে। নিমাই সন্ন্যাসী কাহিনী অবলম্বনে রচিত জাগ গানকে নিমাই জাগ বলা হয়। যেমন ---

নিমাই দুখিনীর ধন,

দুঃখ পাসরার বেটা, রে নিমাই, ওরে নীলরতন।। ধুয়া

এক মাসের কালে নিমাই ভাসে গঙ্গাজলে।

দুইও মাসের কালে নিমাই করে টলমল।।

তিনমাসের কালে নিমাই লোহু রক্তের গোলা।

চার মাসের কালে নিমাই হাড়ে মাংসে জোড়া।।

পঞ্চম মাসের কালে নিমাই পঞ্চফুল ফোটে।

ছয় মাসের কালে নিমাই মাথার চুল ওঠে।।

সাত মাসের কালে নিমাই সাত সুরে গায়।

অষ্টমাসের কালে নিমাই শুয়্যা নিদ্রা যায়।।

নয় মাসের কালে নিমাই নবডঙ্কা মারিল।

দশ মাসের কালে নিমাই ভূমিস্থ পড়িল।।

দশ মাস দশ দিন নিমাইর পূর্ণতা হইল।

নিমাইচাঁদ ভূমিস্থ পড়ে মা বোল বলিল।।

এক মাস যায় মায়ের ঘুতি আর মতি।

আর এক মাস যায় মায়ের মাঘ মাস্যা শীতি।।

কোথা হতে এল যোগী কেশবভারতী।

কিবা মন্ত্র কর্ণে দিয়া নিমাইরে বান্যাল সন্ন্যাসী।।

দেখ দেখ নঘুর‍্যার লোক দেখ রে চাহিয়া।

নিমাইচাঁদ সন্ন্যাসী চল্‌লো জননী ছাড়িয়া।

সন্ন্যাসী না হয়, রে নিমাই, বৈরাগী না হয়।

ঘরে বসে কৃষ্ণনামটী মাকে শোনায়।।

মনসুরউদ্দীন ধুয়া সহ যে 'কৃষ্ণজাগ' গানটি প্রকাশ করেছেন সেখানে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কিত আখ্যান পরীলক্ষিত হয়। এখানে মনসুরউদ্দীনের ধুয়া সহ 'কৃষ্ণজাগ' গানটি তুলে ধরছি। এই জাগ গানটিতে প্রশ্নোত্তরে বেশ নাটকীয়তা আছে। যেমন —

কৃষ্ণজাগ

ধুয়া

এমা দয়া নইরে তোর,

মা হয়ে কেন বেটায় সদা বলো ননী চোর।।

কেষ্ট যায়, মা, বিষ্ণুপুরে, যশোদা যায় ঘাটে,

খালি গৃহ পেয়ে গোপাল সকল ননী লোটে।

"ননী খা'লো কে রে গোপাল ননী খা'লো কে?"

"আমি ত মা খাই নাই ননী বলাই খা'য়েছে।"

"বলাই যদি খাইত ননী থুতো 'আদা', 'আদা'

তুমি গোপাল খাইছো ননী ভাণ্ড করেছো সাদা।"

ছুড়ি হাতে নন্দরাণী যায় গোপালের পিছে

একলম্ফে উঠলেন গোপাল কদম্বেরই গাছে।

পাতায় পাতায় ফেরেন গোপাল জলে না দেয় পাও,

গাছের নীচে নন্দরাণী থরে কাঁপে গাও।

"নামো নামো ওরে গোপাল পাড়্যা দেই তোর ফুল,

কদম্বেরই ডাল ভাঙ্গিয়ে মজাবি গোকুল।"

"নামি নামি ওরে মারে একটি সত্য করো,

নন্দঘোষ যে তোমার পিতা যদি আমায় মারো।"
"তাকি আর হয় রে গোপাল তাকি আর হয়,
নন্দ ঘোষ যে তোমার পিতা সর্বলোকে কয়।"
লাল ভোলা দিয়া গোপাল গাছ হতে নামাল
গাভী ছাঁদ রসি দিয়ে দুই হস্ত বাঁধিল।

ইত্যাদি।

এই গানটির সংগ্রাহক মনসুরউদ্দীন জাগ গানের সঙ্গে **Fal Ballad**-এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু **Ballad**-এর মতন জাগ গানগুলিতে কাহিনীগত ঐক্য না থাকার জন্য এবং মানবিক আবেদনের প্রগাঢ়তা না থাকার জন্য এগুলি আখ্যায়িকা গীতই বলা যায়।

'ভারতী' পত্রিকায় ১৩৩১ সালের আষাঢ় সংখ্যায় মহম্মদ মনসুরউদ্দীন "বাঙ্গালার লোকসঙ্গীত" শীর্ষক রচনাটিতে জাগ গান নিয়ে আলোচনা কালে পাবনা জেলা সম্পর্কে কতকগুলি কথা বলেছেন -- "পাবনা জেলায় ১লা পৌষ থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত রাত্রিকালে রাখাল বালকেরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই জাগ গান গেয়ে থাকে। গানগুলি গেয়ে তারা গৃহস্থের কাছ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করে এবং সংক্রান্তির দিন বনভোজনে প্রবৃত্ত হয়।" লেখক আরো বলেছেন -- "জাগ গানের বিষয়বস্তু সচরাচর কৃষ্ণ বিষয়ক, কিন্তু অন্য নানা বিষয়ও গৃহীত হতে দেখা যায়।" লেখকের সংগৃহীত দুটি কৃষ্ণ বিষয়ক জাগ গান এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই জাগ গান দুটির বৈশিষ্ট্য হলো দুটি গানেই অলৌকিকতার কিছুমাত্র নেই। দুটি গানেই কৃষ্ণ রাখাল বালকরূপে উপস্থিত হয়েছে। আর একটি বিশেষ ব্যাপার হলো নন্দরাণীর উপস্থিতি। তবের গানের কথাতে বোঝা যায় প্রত্যক্ষভাবে নন্দরাণীর নাম উপস্থিত না ঘটলেও তবে নন্দরাণী অলক্ষ্যে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় কৃষ্ণের জন্য 'ধেনু বিক্রয় করে ভিক্ষা করে খাবেন'— এই কথাগুলির মধ্যে। আবার, নন্দরাণীর কৃষ্ণের জন্য উদ্বেলতার মধ্যে মাতৃ-হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রকাশ। তবে গান দুটি বেশ সুখপাঠ্য ও গীতলধর্ম্মী। লৌকিক দিকটিকেই নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই দুটি জাগ গানে। যেমন —

১. ধুয়া

ঐ চল্‌লো কৃষ্ণ রাখাল গণের সনে,
বগে ঘিরিল ধেনু চড়াইতে (যে গোষ্ঠ মাঝে)
একেতে বগের জাতরে আড়ে আড়ে চায়,
কানাইকে দেখিয়া বগরে নাচিয়া বেড়ায়।
নাচিয়া নাচিয়া বগরে কানাইর কাছে আসিল,
কানাইর কাছে এসে বগরে কানাইকে ঘিরিল।

এক শিশু 'নেড়ানুড়ি' আর এক শিশু ধায়
কানাইর মরণের খবর গোকুলে জানায়।
একেত নন্দরাণী হাউল্যা মাথার কেশ,
ঘর হতে বাড়িয়ে এল যেমন পাগলিনীর বেশ।
আগে ছিদাম পাছে সুবল মাঝে নন্দরাণী,
'কোন মাঠে গিয়েছে বগরে আমার নীলমণি'
আরে আগে ছিদাম গাছে সুবল মধ্যি নন্দরাণী,
'এউ মাঠে গিলেছে বগরে তোমার নীলমণি।'
একঠোঁট পদতলে আর একখানি ঠোঁট হাতে,
দুইখানি ঠোঁট টান্যা কানাই বাহির করে।
উয়্যাই দেখে ছিদাম সুবল হাসিতে লাগিল
উয়্যাই নন্দরাণী কানাই কোলে নিল।

২. ধুয়া

ওগো বিদ্যাললনা,
সুখের নিশি গত হল কৃষ্ণ এল না।
কৃষ্ণ গেছেন বিষ্ণুপুরেরে না গিছে বলিয়া,
সারারাতি গেলেন কৃষ্ণ 'পাঁচালি' খেলিয়া।
ভাত হল কড়কড়ে বেনুন হল বাসি
কোথায় রইলেন কৃষ্ণ আমার তিন দিনকার উপোসী
গোপ কাঁদে গোপিনী কাঁদে, কাঁদে তরুলতা,
সকল তান ধরিয়ে কান্দে, "কৃষ্ণ রলেন কোথা।"
শয়নেতে ছিলেন কৃষ্ণ সোনার পালঙ্কে,
কোকিলের রব শুনিয়া জাগিলেন বিহানে।
এসো কৃষ্ণ বসো কোলে কওয়া সমাচার,
আজকেরো ধেনু রাখা (?) রাখাল।
আজকেরো যে ধনু রাকা বড়ই পাইছি দুঃখ

সোনার পায়ে বিন্দে রইছে কুসুমের অঙ্কুর।
আসুক আগে নন্দ ঘোষরে বেচাইব ধেনু,
নগরে মাগিয়া খাইব না রাখিব ধেনু।
নগরে মাগিয়া খাইব লজ্জা পাব না,
তবু লোকে বলবে আমায় রামকানুর মা।

"উত্তরবঙ্গের জাগের গান" শীর্ষক আলোচনা কালে সুশীলকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর "উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি" গ্রন্থে জাগের গান উপলক্ষে কামদেবের পূজা সম্পর্কে এবং পালনীয় নিয়ম আচার-আচরণ সম্পর্কে যা বলেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন --- "চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কামদেবের পূজা করবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের মূলে কামদেবের পূজা করতে ও তাকে চামর দ্বারা ব্যজন করতে হয় — শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা। উত্তরবঙ্গের ভদ্রলোকেরা বহির্বাটীতে দু-তিনটি বংশখণ্ড প্রোথিত করেন এবং দুটি বা তিনটি দীর্ঘ বস্ত্রজড়িত বংশখন্ডের অগ্রভাগে চামর দিয়ে সেই প্রোথিত বংশখণ্ডে আবদ্ধ করেন; তাতেই কামদেবের পূজা হয়। রাজবংশী জাতীয়রা পল্লী হ'তে কিঞ্চিৎ দূরে, কোন প্রান্তরে এইভাবে কামদেবের পূজা করেন। সেই পূজোৎসব গায়কগণ কর্তৃক এই জাগের গান গীত হ'য়ে থাকে। রামায়ণ, কবিকঙ্কন, পদ্মাপূরাণ গানে যেমন মূল গায়ক হস্তে চামর গ্রহণ করে এবং গান গায় এবং দোয়াররা মন্দিরা বাজিয়ে ধুয়া ধরে, জাগের গানেও অনুরূপ ব্যবস্থা যথাযথ ভাবে অবলম্বিত হয়। এই গান দ্বারা কামকে জাগ্রত করা হয় ব'লে, বোধ হয় এ গানের নাম জাগ গান হয়েছে।" জাগ গানের শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে সুশীল কুমার বাবু বলেছেন ---"জাগের গান দ্বিধা বিভক্ত-কানাই-ধামালী ও মোটা জাগ।" তার মতে, "মোটা জাগ অত্যন্ত অশ্লীল বলে প্রাণতরে ভিন্ন কারও বাটীতে কখনও গাওয়া হয় না। কানাই-ধামালী অনেক সময় অনেক ভদ্রলোকের বাটীতেও হ'য়ে থাকে।"

এমনকি,জাগ গান সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যুক্তিকে সুশীলকুমার বাবু মানেন নি। তার মতে, "জাগের গান সংক্রান্ত ডঃ ভট্টাচার্য্যের যুক্তি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অযৌক্তিক। আমি নিজে উত্তরবঙ্গের মানুষ এবং উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিক জীবনের সাথে বিশেষ ভাবে পরিচিত। জাগের গান ফাল্গুন মাসের মদন চতুর্দশী, আবার কোন কোন অঞ্চলে চৈত্র মাসে শুক্কা ত্রয়োদশী তিথিতে উদ্‌যাপিত হয়। মাসাধিক কাল উৎসব চলে। ছেলেরা বাড়ী বাডী মাগন করে, গান গায় এবং অর্থ সংগ্রহ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাগের গান রাজসাহী বা পাবনা অঞ্চলের গান নহে। বিশেষ ভাবে এই গান রংপুর, কোচবিহার, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও ধুবড়ী প্রভৃতি স্থানে শোনা যায়। সুতরাং একথা বলা যায়, পৌষ মাসের জাগের গান উত্তরবঙ্গে গাওয়া হয় না।"

সুশীলকুমার বাবু সোনা রায় বা সোনাপীরের মহিমা কীর্ত্তন যে জাগ গানে শুনতে পাওয়া যায় তা-ও যুক্তিতে মানেন নি। সোনারায়ের গানকে তিনি উত্তরবঙ্গের ভাষায় 'কেচ্ছার গান ([illegible]ার গান)' বলে চিহ্নিত করেছেন। জাগের গান সম্পর্কে তিনি যে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন, সে কথার ওপরে জোর দিয়েছেন-- (১) মোটাজাগ (২) কানাই-ধামালী। জাগ গানে যে বীররসের গানও আছে সে-কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর মতে কানাই-ধামালী গান অধিকাংশই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর উক্তিতে বিধৃত। বীররস ছাড়াও তিনি জাগ গানে আদিরসের গানের প্রাধান্যের কথাও বলেছেন। এখানে একটি সুশীলকুমারের লেখা ''উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি'' গ্রন্থটি থেকে সংগৃহীত একটি গীত রসাত্মক জাগ গান এখানে উল্লেখ হিসেবে তুলে ধরছি ----

মাঠের মতন, কেমন ওসার পাঠার মতন বুক

সে কঠিন বুক দেখিয়া, শত্রুর শুকায় মুখ।

এই গানটিতে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় এক জমিদারের পুরুষোচিত পৌরুষের বর্ণনার লিপিবদ্ধ করেছেন গানটির রচয়িতা।

সুশীলকুমার বাবুর কথাগুলি থেকে কিন্তু একটি জিনিস স্পষ্ট--- জাগ গানের রীতি-পদ্ধতি ও আচার-আচরণ সম্পর্কে যতই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মঠ থাকুক না কেন --- জাগ গান যে শিল্প জগতের দিক থেকে উন্নত হওয়ার জন্যই সর্বত্রই জনপ্রিয় হয়েছে। এ কারণে ক্রমশঃ জেলায়-জেলায়, স্থানে-স্থানে প্রসার লাভ করেছে বলা যেতে পারে। শিল্পগুণের সমর্থন হিসেবে সুশীলকুমারবাবুর কথা টেনে বলা যেতে পারে এজন্যই জাগ গান অতি সহজে নিম্নশ্রেণীর চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভদ্রলোকের গৃহে ঢুকে পড়েছিল।

তবে, জাগ গানগুলির মধ্যে বেশ কিছু গান যে সে যুগে কবির দ্বারা রচিত হতো তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। পালাকারে জাগ গান রচিত হওয়ার শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়। কবি মনের আবেগ না থাকলে এমন দীর্ঘাত প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তরে পালাগান সমন্বিত আখ্যান ও কাহিনী নির্ভর জাগ গান লেখা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হত না। এই প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তরের ব্যাপারটি এবং জাগ গানের লৌকিক ও অলৌকিক দুটি দিকই পরবর্তীকালে বাংলার নাট্যসাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছে। পীরের বন্দনাও তাই গান ও ছাড়ায় বাংলার নাটকে স্থান পেয়েছে। ১৯৫৭সালে প্রকাশিত নাট্যকার সলিল সেনের ''মৌ-চোর'' নাটকের লক্ষনীয় মানিকপীরের উপস্থিতি। নাটকের জনৈক ফকিরের ছড়া পাঠেই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নজরে পড়ে ---

ছোটপীর আর বড়পীরের দ্বন্দ্ব উপজিল।

হাতা দিয়া থাকা নিয়া বিরোধ বাঁধিল।।

মানিকপীর বলিল ভাই রাগ উপসম।
দয়া না করিলে পূজা পাবে কি রকম।।
ছোটপীরের মিনতিতে সন্তোষ হইয়া।
গজ-পীরের গোস্‌সা গেল ত্বরিতে মুছিয়া।।
দেখাইতে লীলা খেলা জাগ্রত সংসারে।
গজ-মানিক উপজিল কিনু ঘোষের দ্বারে।।
কিনু ঘোষের বহু (বউ) ছিল দুয়ারের ধারে।
ফকিরে আসিতে দেখি লুকাইলো ঘরে।।
মানিকপীর বলে, 'মা গো, কিছু ভিক্ষা চাই।'
উত্তর দিল ঘোষ জায়া, 'ঘরে কিছু নাই'।।
আধমন দুধ তার গোয়ালেতে ছিল।
মিছা বলি ঘোষান তবে মানিকে ভাড়াল।।
ভিখারীর বেশে আল্লা আর ভগবান।
জগতের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চেয়ে যান।।
তাঁরই সৃষ্টি সাধু-সন্ত সাঁই ও ফকির।
মুসকিল আসান লাগি আজ দ্বারে মানিকপীর।।

পীরের মাহাত্ম্য অবলম্বনে জাগ গানগুলিতে গ্রামীন লোকায়ত সংস্কৃতির জীবন দর্শনই বলতে মূলভিত্তি যে মানবপ্রেম — তাই বাংলা নাটকে উঠে এসেছে। "মৌ-চোর" নাটকেই উপরিউক্ত ছড়াটিতেই জাগ গানের এ-ভাগটি লক্ষ্য করা যায়। এই ছড়া গীতিটিতেই আর একটি জিনিস লক্ষণীয় তা হলো — আলোচ্য লেখাটিতে পূর্বে পাবনা জেলার যে পীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন গানটি উল্লেখ করেছি তার সঙ্গে এক মিল সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। পাবনাপীরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনটিতেও কিন্তু দুধের কথা আছে। "মৌ-চোর" নাটকের ছড়াটিতে শব্দ বন্ধনেও জাগ গানের সমতুল শব্দ-প্রয়োগ লক্ষণীয়, যেমন বিশেষ করে 'ভাড়াল' শব্দটি।

বাংলা আধুনিক কাব্যেও পীরদের কথা উঠে এসেছে। বলতে কুণ্ঠা নেই, মূল ভিত্তি মানবপ্রেমের দিকটাই বাংলা কাব্যে আলোচিত হয়েছে বেশি।

টুসুগান

লোকসঙ্গীতের একটি জনপ্রিয় গান হলো টুসুগান। টুসুগান মূলত পার্বণ গীত। ধান পাকার মরশুম উপলক্ষে টুসু উৎসব পালনে যে গান আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে গাওয়া হয় তাকেই বলা হয় তুষু বা টুসুগান। টুসু উৎসব সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অভিমত হল, "টুসু রাঢ় অঞ্চলের শস্যোৎসব (**karves festival**)। যখন অগ্রাহায়ণ ও পৌষ মাসে ধান্য পাকিয়া ওঠে ও প্রতিগৃহে নূতন শস্য পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখনই এই উৎসব আরম্ভ হয়। পশ্চিম বাংলায় ইহা মেয়েলী বা তুষ-তুষলী ব্রত নামে পরিচিত। এই ব্রত কুমারী সধবা সকলেই করিতে পারে। পৌষের প্রথমদিন হইতে আরম্ভ করিয়া মাঘের প্রথম দিন পর্যন্ত এই উৎসবের সময়। আবার কোনও কোনও অঞ্চলে অগ্রাহয়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। বাঁকুড়ার পশ্চিম অংশ এবং পুরুলিয়া জেলায় এই উৎসবকে বলা হয় টুসু।

এইভাবে টুসুর পূজা করা হয়। ছোট মাটির সরায় তুষ ভরা থাকে। তাহার গায়ে একটি নারীর মুখ অঙ্কিত থাকে। মাটির সরাটি ফুল দিয়া সাজানো হয়, তাহাতে টুসুকে নানা মিষ্ট দ্রব্যের নৈবেদ্য সাজাইয়া দেওয়া হয়। তিনদিন মাটির সরাটি পূজা করিবার পর মকর সংক্রান্তির দিন তাহা নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। মেয়েরা মাটির সরাটি মাথায় করিয়া নদীর তীর পর্যন্ত লইয়া যায়। টুসু পূজার কতগুলি নিয়ম ও আচার আছে। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জিলায়ও এই পূজা ব্যাপক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।"

স্থান বিশেষে টুসু পূজার ভিন্ন নিয়ম দেখা যায়। এ সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যা বলেছেন তা এরকম ---

১. "প্রথমদিনে স্ত্রীলোকেরা মলিন বস্ত্রাদি পরিস্কার করিয়া থাকে ও পুরুষেরা মাছের সন্ধানে বাহির হয়। মাছ খাওয়া সেই দিনের একটি অবশ্য করণীয় নিয়ম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তারপর স্ত্রীলোকেরা চাউল দিয়া পুলি প্রস্তুত করিতে থাকে। একটি নূতন মাটির সরা কিনিয়া তাহার বর্হিভাগে চাউলের গুঁড়া জল দ্বারা মাখিয়া তাহার প্রলেপ লাগান হয়। তারপর তাহা দ্বারা উনানে জল গরম করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'বাউরি বাঁধা', 'বাউরি বাঁধা' না হইলে কোনও স্ত্রীলোক পুলি প্রস্তুতে অংশ গ্রহন করিতে পারে না। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা ছড়া বলিয়া থাকে।"

২. "কোন কোন অঞ্চলে টুসু উৎসবের পূর্বে মেয়েরা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। এই অর্থ দ্বারা টুসু উৎসবের ব্যয় নির্বাহ হয়। কোনও অঞ্চলে সরার পরিবর্তে একটি মৃৎপুত্তলিকাকে একটি থালির উপর সাজাইয়া তাহার পূজা করিয়া থাকে। এই পুত্তলিকাটিকেই

টুসু বলিয়া অভিহিত করা হয়। উৎসবের তিনদিন পরে এই পুত্তলিকাটিকে নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়।

৩. "কোথাও আবার পূজার প্রণালী নিম্নলিখিত রূপ, — গোবরের সঙ্গে তুষ মিশাইয়া কতগুলি নাড়ু পাকাইতে হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক নাড়ু দুর্বা দিয়া পূজা করিবার পর তাহা একটি মালসায় তুলিয়া রাখিতে হয়। তারপর মকর সংক্রান্তির দিন নাড়ু শুদ্ধ মালসাগুলি মেয়েরা হাতে বা মাথায় লইয়া গিয়া কোনও পুকুর কিংবা নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। ইহার সহিত গান করিতে থাকে।"

৪।"মানভূম জিলার সংলগ্ন বাঁকুড়া জিলায় তাহার নাম তুষু এবং সেখানে তাহার এইরূপ দেখা যায়: দগ্ধ মৃত্তিকার সরার উপর চতুর্দিকে মৃৎপ্রদীপ সজ্জিত থাকে। সরার গর্ভে ধান্যের তুষ দেওয়া হয়। তদুপরি নানাবিধ পুষ্পের মাল্য, কড়ি ও গুঞ্জার হার দিয়া সরাটি সজ্জিত হয়। পূজার সময় প্রদীপগুলি জ্বালিয়া দেওয়া হয়। মানভূম জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে টুসুর এই বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন — ১) ছোট কুণ্ডলাকার একটি গর্ত, ২) একটি মাত্র সরা, ৩) প্রদীপ বসানো একটি সরা, ৪) একটি বাঁশের ছোট ডালা, ৫) মাটির প্রতিমা, ৬) চৌলে। প্রথম চারটির ভেতরে সর্বদা বিজো সংখ্যক গোবরের ও পিটুলির গুটি রাখা হয়। রঙ্গিন কাগজ ও সোলা কঞ্চি ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত দুই ফুট বা ততোধিক উক্ত একটি মন্দিরাকৃতি বস্তুর নাম চৌলে।"

৫. "কোনও কোনও অঞ্চলে প্রতিমা নির্মানের প্রথা প্রচলিত আছে। মূর্তিটি বাহনহীনা, সাভরণা, গভীর হলুদ রং, উচ্চতা অনধিক একহাত। ইহার উপর ভাদু প্রতিমার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট।"

তবে, টুসু উৎসবে ছড়া কাটার প্রভাব অধিক লক্ষ করা যায়। যা টুসু উৎসবকে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে বলা যেতে পারে। 'বাউরি বাঁধা'র সঙ্গে সঙ্গে পুলি প্রস্তুত উপলক্ষে স্ত্রীলোকেরা যে ছড়া কাটে তা বেশ সুন্দর, যেমন —

লবান্নর ধান ভানল্যাম দনখেন কর‍্যে,
তার গুচ্ছেক কুড়া রাখল্যাম তুষাল মায়ের তরে।
তুষাল গো রাই
আমরা ছবড়ি পিঠা খাই লো।
ছবড়ি লো শোবড়ি তুষু পূজতে যাই
আলো তিল ছাঁই,
বাটিতে কর‍্যে সাজাঁই দিব খাও টুসালু মাই।

আবার, বাউরি বাঁধার সময়ও ছড়া আবৃত্তি করা হয়। সাদামাটা সেসব ছড়া, তবে বেশ সুন্দর —

টুসালু মায়ের সঙ্গে চেয়্যে লিব বর
ধনে পুত্রে ভরুক ঘর গো।
ভরল রে ভরল ই পৌষমাস
আরো ভরবেক গো উ পৌষমাস
পৌষ মাসে পৌষালু মাঘ মাসে পিঠা
দামুদর সিন্যাতে মাথা হল্যো চিঠা।
মা খশুন বাপ খশুন ভুঁই ধরে ধরে কথা,
মাথার কাপড় ঘুঁচাই দাও দুইটি কান বুঁচা।
বত্রিশ গাইয়ের ঘি কলসী সরু চালের ভাত
খুঁজে গুঁজে খাও টুসু সেই পৌষ মাস।

এইভাবে টুসু উৎসব উপলক্ষে গানের পাশাপাশি ছড়ার সাহিত্য রচনার এক সমৃদ্ধিসম্ভার নজর কাড়ার মতন। বলতে কুণ্ঠা নেই, এই ছড়া সাহিত্য পরবর্তীকালে আধুনিক বাংলা নাটক ও ছড়া সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। তবে, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টুসুর পূজার বিভিন্ন রূপ ও প্রচলন সম্পর্কে যে সত্যটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় তা হলো -- লৌকিক দেব-দেবীর চেহারা ও মূর্তি কখনো এক নয়। "লৌকিক সংস্কার ও বাঙালী সমাজ" গ্রন্থে আবদুল হাফিজ বেশ সুন্দর যুক্তিপূর্ণ কটি কথা বলেছেন — 'টুসু পূজো-পদ্ধতিতে যাদুবিদ্যার উপাদান এমনিতেই স্পষ্ট। কিন্তু ভাদু গানের মতই টুসু গানও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি ও সমাজের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ প্রভৃতির বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

মকর সংক্রান্তির দিন নাড়ু শুদ্ধ মালসাগুলি পুকুর বা নদীতে ভাসান কালে যে টুসু গান গাওয়া হয়ে থাকে তা বেশ আন্তরিক। যেমন —

আদা চিঁটা গুড়ের মিঠা
তা দিয়েঁ দিয়েঁ খা টুসালুর মাইপো, ছবড়ি লাড়ুর পিঠা
ছবড়ি লাড়ু দুধের লাড়ু আর গ'টা চার
কাটা ভরতি ঘি গুড় দিব খা, টুসালুর মাই গো,
খা, টুসালুর মা।

তবে, মানভূম জেলার টুসুগানের সুর কিন্তু শুধু ভাদুগানেরই অনুরূপ নয়, ভাদুগান ও টুসুগানের বাইরের দিক থেকে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভেদ নেই। যদিও পূজার আচার-আচরণে পার্থক্য নজরে পড়ে বটে, তবে তা গানের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পার্থক্য পরীলক্ষিত করে না। ভাদুগানে যেমন মূলত কুমারী-মনের আশা ও আকাঙ্ক্ষাই প্রধান হয়ে উঠেছে, টুসুগানে কিন্তু তা হয়নি। টুসুগানে মূলত সমগ্র সমাজেরই চিত্র ফুটে উঠেছে। তবে,

টুসুগানের মতন ভাদুগানেও সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাগুলি বেশ ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে। টুসুগানের মধ্যে বহুলভাবেই যে লক্ষ্য করা যায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি আন্দোলনে সমসাময়িক বহু রাজনৈতিক সমস্যার তীব্র প্রকাশ যে টুসুগানের সুরে লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে দেশপ্রেমের তীব্র প্রাণবীজ ও স্বাধীন ভারতের স্বপ্নকে তুলে ধরেছে বলা যেতে পারে। যেমন —

জাগলো সাড়া ভারতের মনে

(টুসুর) জয় হবে সবাই জানে।

টুসুর বাণী উঠছে ধ্বনি

শুনগে তোরা স্বকানে।

বাংলা ভাষায় রাজ্য গঠন

তাঁহারি বিজয় গানে।

দিয়েছি মা ন্যায়ের লড়াই তোমার অভয় ভাষণে

মিলন রাখী বেঁধে দে মা ভারতের জনগণে

নানা জাতি বনফুলে পূজবো মা তোর চরণে।

সোনার বাংলা শস্যে ভরা

(আমরা) রইব কি মা পিছনে।

সবার সমান হবো মোরা

তুমি ভুলোনা অভাজনে।

কিন্তু, যেহেতু মানভূম একসময় ছিল বিহার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত, সেহেতু একসময় মানভূমকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্তি নিয়ে হিন্দি ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে বাঙালীদের যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ উপস্থিত হয় তারও প্রভাব টুসুগানে লক্ষ্য করা যায়। একটি টুসাগানে ব্যঙ্গাত্মক রসে এই সাম্প্রদায়িকতাকে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন —

পাটনা বিহার আইন সভায়

হিন্দিভাষীর দল ভারী

(তাই) ভোটের জোরে ভাঙ্গছে তারা

লোক সেবকের কলগাড়ী।।

আইন সভায় হিন্দি ভাষার

হুকুম দারী চালাতে

বাংলা ভাষা করছে দমন
মানভূমের জ্বালাতে।।
মাতৃভাষায় প্রদেশ গঠন
গোটা দেশের নীতিরে
(পাছে) এই নীতিতে জেলা হারায়
বিহারের এই ভীতি রে।।
মানভূমেরই মাতৃভাষা
বাংলা ভাষা চারধারে।
সেই কারণে বাংলা দমন
চালায় বিহার সরকারে।।
হোক না যতই পীড়ন দমন
হিন্দি রাজের অত্যাচার
লোকসেবকের অটল গাড়ী
টলবে নাকো কোনো ধার।।
ভাষার নীতি করতে বিচার
কমিশনে ভার দিল
হিন্দি রাজের মাথায় এবার
বিষম বিপদ পড়িল।।
বাংলা বিহার মামলা দায়ের
ভাষা ভিত্তি সেসনে
জনমতের বাজার বিত্তল
বিচারের কমিশনে।।
চলল এবার ইঞ্জিন ঐ
পুরু আছে কয়লাজল।
(এবার) মিথ্যাচারীর টলবে আসন
মিথ্যা হবেরে বিকল।।
ভাষা নীতির টিকিট আছে
যাবিরে আজ কোন খানে।

হওরে এবার জংশন পার

লোকসেবকের ইঞ্জিনে।।

এই টুসুগানটির ঢঙ অন্নদাশঙ্করের ছড়াতেও লক্ষ্য করা যায়।

টুসুগান একটি উৎসবকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও টুসুগানের ভেতর দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, দৈনন্দিন সমস্যা বহুল জীবনের প্রতিচ্ছবির তীব্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ছোট ছোট সুখ-দুঃখের প্রতিচ্ছবিগুলি টুসুগানে উঠে এসেছে যেমন –

চল টুসু চল জল আনিগা হীরা কচার জোড় ধারে,

শাল পাতে আর ভাত খাব না সতীন বড় গাল মারে।

অথবা, সাধের টুসু এসো

আলস আঘন মাস ফুরায়ে গেল।

টুসুর আগমন শুনে

আনন্দে সব মাতিল

ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ে পূজিতে বসিল।

বা, এই মনের বাসনা

টুসু মাকে জলে দিব না

দেখতে লেগবো টাটার কারখানা।।

আয় কে যাবি আয়

আমার কোলের টুসু জলে যায়

টুসুগানের বিশেষত্ব হলো — টুসুকে মানবীরূপে হাজির করা। তা নানারূপে হলেও, সাধারণভাবে টুসুর পরিচয় সাধারণত গৃহস্থ বধূ রূপে। যেমন —

মাটি জম্যে পাটি পাড়ল্যাম বাপের ঘর যাব বল্যে,

গুণের দেবর কাঁদতে বসল করবরী ডাল ধর্যে।

কাঁদ্য না কাঁদ্য না দেবর আষাঢ় মাসের তিন দিনে

তোমার ভাইকে বলে দিবে ইংরেজী সড়প দিতে।

প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখ হাসিকান্নায় মিশ্রিত টুসুগানে গ্রাম্য সাদামাটা জীবনের সরলতার তীব্র প্রকাশ যে কোনো সহৃদয় দরদীমনের পাঠকদের মনকে ছুঁয়ে যায়। টুসুর আগমনী গীত থেকে টুসুকে কেন্দ্র করে যে গান পারম্পর্যভাবে গাওয়া হয় তার বিচিত্র

প্রকাশ ও বৈচিত্র্যময়তা লক্ষণীয়। টুসুর আগমনী গান এখানে একটা তুলে ধরছি —

বাগান দিয়ে ঢোল বাজিয়ে টুসু নাকি আসিছে —

বাইরাও না গো, রঙ্গদেবী, সিংহাসনে সাজিয়ে।

টুসু নাকি ডুবিল গো জলে —

টুসুকে ছাঁকিবো গো মাহা জলে।

টুসু নাকি ডুবিল গো জলে . . . ।।

টুসুর রূপ বর্ণনা গানে কিন্তু কবিত্বশক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যা এযুগের আধুনিক কবিরা পাঠে আশা করি হতচকিত হবেন। যেমন —

অচিরে পাচীরে পদ্ম লাল পদ্ম বই ফুটে না,

টুসুর হাতে জোড়া পদ্ম, ভোমরা বই বসে না।

ভোমরা এল মাতাখাতা রসিক বলে ফুল পাতা,

এমন দেখে ফুল পাতালি চলে গেলি কলকাতা।

বল টুসু মনি, তোকে কে দিল গো দুয়ানি;

কাঁচি কাটা ডবল পয়সা জলে দিলে হয় দু'টা —

এমন দেখে ভাব করলি ধরিল শালুক ফুল ফোটা।

এমনকি, পল্লীবাংলার বালিকারা টুসুর ওপর দিয়ে নিজেদের গহনা পরিধানের সাধ পর্যন্ত মিটিয়ে নেয় —

নাকে নোলক কানে কান পাশা

টুসু করে না করে আশা।

টুসুকে কেন্দ্র করে নারী-হৃদয়ের কামনা-বাসনা ও নানা ভাবনাচিন্তা লক্ষণীয়। টুসুকে মানবীরূপের কল্পনায় গানে যার বৈচিত্র্যময়তা অনিবার্যভাবে লক্ষ্য করা যায়। এখানে কটি এরূপ উদাহরণ তুলে ধরছি —

১. এখন মাথা বাঁধব পরিপাটি তাতে দিব বেল কুঁড়ি।

বোম্বাইতে পার্শেলেতে আনব যুগল চুড়ি।

মন বাঁধা দিয়ে সই আমি বিদায় হই —।।

কটকে গড়াব গয়না ঢাকাতে চট করাবে।

কোলকাতাতে রঙ করায়ে টুসুধনকে সাজাব।

মন বাঁধা দিয়ে . . . . .।।

দিল্লী হতে আনব লাডু বারাণসীর হালুয়া।
বর্ধমানের মিহিদানা বাগবাজারের পান্তুয়া।
মন বাঁধা দিয়ে ......।।
আমার টুসু কাশী যাবে সঙ্গে চাকর ছয়জনা।
কালী মাটি দিয়ে ফিরবে দেখে টাটার কারখানা।
বাঁশপুরে তামা গলাই মাটি গড়াব আমদানী।
বন ছিল নগর বসাল কেপ্ কল আর কম্পানী।
মন বাঁধা দিয়ে ......।।
মইলিশালের সরু চিঁড়া বৈদ্যনাথের বসা দই,
বলেছিলে সই পাতাব রাজার ছেলে আইল কই।
মন বাঁধা দিয়ে ......।।

২. টুসুরি দুয়ারে ফুলেরি বাগান চিরতা চিরতা পাতা
ডালও ভাঙ্গিব ফুলও তুলিব টুসুরও রাখিব কথা।
এস টুসুমণি, তুমি আদরিণী কি চাও আমারে বল না
ঐ যে হিমানী পাউডার, মুখে কেন তুমি মাখ না।

৩. ওগো চঞ্চলা, ওগো চারুবালা, আয়লো সবে সঙ্গিনী
পথে যেতে যেতে, মালা গেঁথে গেঁথে, করবো ফুলের আমদানী
ফুলেরি আয়না, ফুলের চিরুনী, ফুলের টুসুর মশারি।।

৪. ও রজনী, ওসজনী, ভাত গোটা চাল খা
টাকার মোট থলি নিয়ে পোদ্দার পাড়া যা
পোদ্দার ভায়া পোদ্দার ভায়া ঘরে আছে হে
আমার টুসুর বিয়া হবে, গয়না চাই হে।
গহনা তো দিলে রে ভাই, বহু যতনে
আরো কিছু না দিলে, সাজবেক কেমনে হে সাজবেক কেমনে।

আবার, টুসুকে সাজানোর মধ্যে গ্রামের প্রতিবেশীদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হয় তা টুসুগানে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে দুটি দৃষ্টান্ত রাখছি —

১. তোমার টুসু যতই সাজাও
চোখগুলি পিয়াজ ভাজা,
তোমরা যতই সাজাও
আমি বলে তাই দেখা হ'লো
তোমার কাপড়ের পাড় ভাল,
তোমাদের পাড়ায় যাবে না গো সই,
তোমাদের ডোমরা চোখে কাজল কই।

২. আমার টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝল্‌মল্‌ করে লো,
উয়ার টুসু অভিমানী আঁচল পেতে মাগে লো,
আর বুড়া চলতে নারে পাথরে,
চাপায়ে দেব টেক্‌সী মোটরে।

টুসুগানে চিত্ররূপময়তার রমনীয় ভাবও লক্ষ্য করা যায়। যা যথার্থই কাব্যিক ও শিল্পগুণে মণ্ডিত। যেমন —

বাঁধের আড়ায় কদম গাছটি চারধারে ডাল মেলেছে,
শিশু ডালে ফুল ফুটেছে কত ভ্রমর বসেছে।
বস্‌বি ভ্রমন লাল জবা ফুলে — সে তো মৈরীবাবুর বাগানে
বস্‌বি ভ্রমন লাল জবা ফুলে।।

ভাদুগানের মতন টুসুগানে আবার জামাতাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু টুসুগানে দৈনন্দিন প্রাত্যহিক জীবনের সব কিছুই টুসুগানে উঠে এসেছে, সেহেতু বাঙালীর পারিবারিক জীবনে জামাতারা যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে তা টুসুগানে আপনিই সাবলীলভাবে চিত্রিত হয়েছে। যেমন —

১. বাড়ী নামোয় খয়ের গাছটি কাটিয়া করিব সওয়ারী।
সওয়ারীতে চাপি যাব ইচ্ছাপুর বাপের বাড়ী।
ইচ্ছাপুরে মিচ্ছা কথা বেগনাপুরের কেহারী,
ভাল করে বুনবি তাঁতী জামাই-বিটির জোড় ধুতি।

২. বাড়ীর নামোয় নারকেল গাছটি ঘটি ভরে জল দিব,
একটি নারকেল ধরলে পরে, ডাকে চিঠি পাঠাব।

চিঠি পাঠাই, ঘোড়া পাঠাই, তবু জামাই আসে না,
জামাই আদর, বড় আদর, তিন দিন বই আর থাকে না।
আরও তিন দিন থাকো, জামাই, খেতে দিব পাকা পান,
বসতে দিব শীতলপাটি, নীলমণিকে করব দান।

৩. টুসুর মাগো, টুসুর মাগো, টুসুর বিয়া দাও এসে,
আই বড়াতে জাঁতি হাতে লাতি কোলে লাও এসে।
লাতি বলে হাতি লিব; কোথায় হাতি পাব গো,
ওই যে আসছে রাজার ব্যাটা জোড়া হাতি লিব গো।
আসুক আসুক রাজার ব্যাটা, বসুক সিংহাসনে গো,
চরণ দুটি ধুয়ে দিব কালো মেঘের জলে গো।।
কালো করে ঝিকিমিকি, পদ্ম করে আলো গো,
হোক না আমার কালো জামাই বাঁশী বাজায় ভাল গো।।

এই গানগুলির বিশেষত্ব হলো — অনুপম চিত্রমালা, যা গ্রাম্য নিরক্ষর কবির হাতে চরম কবিত্বগুণের পরিচয় বহন করে। পাঠে মুগ্ধ হতে হয়।

সতীনের প্রতি বিদ্বেষের ভাব, ভাসুর সম্পর্কে বধূর মনোভাব, ভ্রাতৃ বধূ সম্পর্কে ভাসুরের অহেতুক কৌতূহল, ভাসুরের হ্যাংলাপনা, বধূর জীবনের যন্ত্রণা, ননদ জার আধিপত্যে বধূর জীবনে বিড়ম্বনা, শ্বশুড় - শাশুড়ীর কথা, শৈশবের মাতৃস্নেহের স্মৃতি, জননীর প্রতি কন্যার অভিমান, সখীত্ব পাতানো, বালিকাবধূর মন কেমন করা, মামা-মামীর কথা, এমনকি ভাজের কথা পর্যন্ত --- কি নেই টুসুগানে! এক কথায় বলা যায় — মেয়েদের জীবনের জীবনযাপনের গার্হস্থ্যের সব ছবিগুলিই চালচিত্রের মতন একে - একে উঠে এসেছে টুসুগানে। টুসুগানকে এ কারণে মহিলাজীবনের মহাকাব্য বললে অত্যুক্তি হয় না। এখানে কিছু টুসুগান নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরছি ---

১. সতীনের বিদ্বেষ ---
ও তুই খাইস্ না বনের শালপাতাতে,
মরণ আছে সতীনের হাতে
এক সরপে, দুই সরপে তিন সরপে লোক চলে।
টুসু আমার মধ্যে চলে বিন্ বাতাসে গা দোলে।।

২. ভাসুর সম্পর্কে বধূর মনোভাব —

বিষ্ণুপুরে দেখে এলুম শালগাছে বেল ধরেছে,
চললো, বেল পাড়তে যাব।
যখন বাগাল বাঁশী ফোঁকে তখন আমার হেঁসেলে,
কি ক'রে বেরোব বাগাল হ্যাংলা ভাসুর দুয়ারে।।

৩. ভাসুরের হ্যাংলাপনা —

মাছ বানালাম চাকা চাকা মাছের কাঁটা সিজমা --
ভাসুর হয়ে জিগির করে লজ্জাতে প্রাণ বাঁচে না!
ও ভালবাসা,
তুমি চলে গেলে চাঁইবাসা।

৪. বধূর জীবনের যন্ত্রণা —

ই চালে পুঁই উ চালে পুঁই পুঁইয়ের খাব মেচুরি,
আর যাব না শ্বশুড় বাড়ী ধহরে মারে শাশুড়ী।

৫. ননদ জার আধিপত্যে বধূর জীবনের বিড়ম্বনা —

টুসু যায় না জলে ও জল আনবো গো বাসক ডালে,
টুসু যায় না জলে।
আমার টুসু জলকে যায়, মা, যে ঘাটে সরবালি,
এবার টুসুর বিহা দিব যার ঘরে সোনার থালি।
রং — আঙ্গিনাতে রুনুঝুনি খাড়া
দাদা, দেখবি বৌয়ের মুখ নাড়া।
ননদ পেল সরু শাঁখা
বড় বৌয়ের মুখ বাঁকা,
হালের হাসো বিকরে দাদা,
বড় বৌকে দে শাঁখা।।

৬. শ্বশুড়-শাশুড়ীর কথা —

রাজা গেল রেল-সড়কে রাণী কাঁদে ডাল ধরে,

আর কেঁদ না, পাটের রাণী, রাজা কি আর ঘর ফিরে।
পোস্ত কাঁদে গোল আলুর তরে,
আমার মন কাঁদে শ্বশুড় ঘরে;
পোস্ত কাঁদে গোল আলুর তরে।

৭. শৈশবের মাতৃস্নেহের স্মৃতি ---
মাথা ঘসে রইলাম বসে আর আমাদের কে আছে --
মা বাপ আছে দূর দেশে প্রাণ জুড়াব কার কাছে।
বল গো আমার মা কোথায় আছে,
আমি প্রাণ জুড়াব কার কাছে।
ধিকি ধিকি প্রাণ কেঁদে ওঠে
বল গো আমার মা কোথায় আছে।।

৮. জননীর প্রতি কন্যার অভিমান ---
এ বড় পোষ-পরবে রাখলি মা পরের ঘরে,
পরের মা কি বেদন জানে অন্তরে যারে মারে।
পর-পীরিতি জ্বলন্ত আগুন।।
যেমন জ্বলছে লো তুঁষের আগুন
পর-পীরিতি জ্বলন্ত আগুন . . . ।।

৯. সখীত্ব পাতানো ---
মাগো, মাগো, ফুল পাতাব ফুলকে আমার কি দিব
বাজার যাব পয়সা পাব ফুলকে ফুলাম তেল দিব,
ফুলাম তেল গন্ধ ছুটাব,
তোকে পেছু পেছু হঁটোয়াব।

১০. বালিকা-বধূর মন কেমন করা ---
মাগো, মাগো, বিয়া দিলে বড় নদীর সে পারে,
এতো বড়ো পৌষ পরবে রাখলি, মা, পরের ঘরে।
মাগো, আমার মন কেমন করে।

যেমন তাতা কড়ায় খই ফোটে।।
মায়ে দিল মাথা বেঁধে দেগো, মাসী, ফুল গুঁজে,
বিদায় দে, মা, সংসারের কাজে।
আমি থাক্‌ব না, মা, তোর ঘরে।।

১১. মামা - মামীর কথা —
মামী-ভাগ্‌নী জলকে গেছে মামীর কলসী ডুবে নাই,
যা গো ভাগ্‌নী বলে দিবি তোর মামার ঘর আর করব না।
ওলো ভাগের ঘর যে না তাকে করবো পুঁটী মাছ চেনা,
ওলো ভাগের ঘর আর করব না।।

১২. ভাজের কথা ---
টুসুর চালে লাউ ধরেছে লাউ তুলেছে রাখালে,
আজ তো রাখাল ধরা যাবে ছোটরাণীর মহলে।
ভাজ আমার অতি সুন্দরী, যেমন ইঁচল মাছের ফুল বড়ি।
পোষ মাসেক আসকে পিঠে --
দে না, দিদি, এক থালা চির চিরি খাড়া,
মামী, করলি গো দুয়ার ছাড়া,
ও তুই পানে কেন চুণ দিলি,
এত দিনের ভালবাসা আজকে কেন জবাব দিলি।

এখানে কটি কথা বলা বোধকরি উচিত হবে, টুসুগানে বধূদের যে আর্তি ও আকুলযন্ত্রণর কথা উঠে এসেছে তা পরবর্তীকালে বেশ গভীরভাবেই আধুনিক বাংলা কাব্যকে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস রায় থেকে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাতেও বধূদের জীবনযন্ত্রণার কথা উঠে এসেছে। "মানসী" কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতাটিতে টুসুগানের মতনই বধূর আকুল মাতৃস্মৃতির প্রতি বধূর করুণ আর্তি লক্ষ্য করা যায় —

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁগো!
উঠিলে লবশশী ছাদের' পরে বসি
আর কি রূপকথা বলিবি না গো?

হৃদয় বেদনায় · শূন্য বিছানায়
বুঝি, মা, আঁখিজলে রজনী জাগ —
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগ'।।

বিশেষ করে কবি কালিদাস রায়ের কবিতায় বধূর 'পাথর বাটি ভাঙার' মধ্যে টুসুগানের মতনই তীব্র বিড়ম্বনা ও যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি, বধূকে কোনো কিছু কিনে দেওয়ার জন্য শাশুড়ী ও ননদের মুখভার এসবও বাংলা আধুনিক সাহিত্যে বেশ তীব্রভাবেই লক্ষ্য করা যায়। এসব কারণে বলতে কুণ্ঠা নেই, বধূদের জীবন টুসুগানের মতনই আধুনিক সাহিত্য এক অন্যমাত্র পেয়েছে। কাজেই, বধূদের শাশ্বত জীবনের দিকগুলি ঘটনাবহুল হয়ে নিখুঁতভাবে টুসুগানে উঠে এসেছে বলেই এর মূল্য আমাদের কাছে আজও চিরন্তন। আধুনিক বাংলা কাব্যে যা নতুন-নতুন চিত্ররূপময়তা নিয়ে ফুটে উঠেছে অনেক কবির কবিতাতে।

প্রেম যে শাশ্বত ও চিরন্তন — সে কথাও টুসুগানে লক্ষ্য করা যায়। প্রেম বিনা গীত হয় না বলেই সম্ভবত প্রেমও বিষয় হয়ে উঠে এসেছে টুসুগানে সুন্দর সহজ-সরল ভাবে। এখানে দুটি দৃষ্টান্ত রাখছি —

১. ঘী দিয়ে ভাজিলাম কালা তবু তিতা গেল না,
কালা ফুলে দেখা পাইলে ধরব কোহা ছাড়ব না।
ভাব্‌রি বনে কে বাজায় বাঁশী
আমি ফুল সাবানে গা ঘসি,
ভাব্‌রি বলে কে বাজায় বাঁশী।।

২. সোত কইরেছি এক গলা জলে,
তোকে ছাইড়ব না জীবন গেলে।

উপরিউক্ত টুসুগান দুটি পাঠ করলে এই ভেবে বিস্ময় জাগে না'কি একেবারে আধুনিক কবিতার মতন। সুন্দর নিখুঁত বাঁধুনি। প্রেমবিষয়ক টুসুগানগুলি সত্যিই চমৎকার। বুকের গভীরে অনুরণিত করে। আবার, জীবনের জটিলতা ও সমস্যা জর্জরিত যন্ত্রণা, প্রেম, স্নেহ ও ভালোবাসা ছাড়াও টুসুগানে রামায়ণ এবং ভাগবতের কাহিনীও শুনতে পাওয়া যায়। যেমন -

১. বনে চলি, বনে চলি বনে চলা দায় হইল,
ফুটিল লব-কুশের কাঁটা কোন বনে হারাইল।
ভিক্ষা দাও মা, দাও মা সীতা,

চারটি ভিক্ষা দাও, মা সীতা নন্দিনী --
ভিক্ষা দিতে লারব আমি আসুক রামগুণমণি।
রাম নাকি হে বনে যাবে, হাতে লাউয়ের গণ্ডীবান,
চোদ্দ বৎসর বনে যাবে চাইয়া লও মায়ের পানে।।

২. ঠায় ফাগুনে রইলাম বসে আর আমাদের কে আছে,
মা রইল দুরান দেশে প্রাণ জুড়াব কার কাছে।
কোথায় কিষ্ট জীবন, কৃষ্ণ একবার দেখা গো,
আমি ভাই বনে লইয়া রাখালগণে
এই রকম গোষ্ঠে যাই।
কোথায় কিষ্ট জীবন কৃষ্ণ একবার দেখা গো।।

আধুনিক কাব্যেও আমরা দেখি টুসুগানের মতন রামায়ণ ও ভাগবতের কাহিনী উঠে আসতে। কাজেই -- টুসুগান গ্রাম্য নিরক্ষর কবির দ্বারা রচিত হলেও তাঁরা যে বোধের নিয়মিত চর্চা করতেন তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। বরং এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়, অল্প হলেও তাঁরা পঠন-পাঠন করতেন এবং তার সঙ্গে করতেন বোধচর্চা।

পুরাণ বিষয়ক টুসুগানগুলি কিন্তু বেশ দীর্ঘ। এযুগের দীর্ঘ কবিতার মতন। যেমন

আচম্বিতা মূর্ছাগত ধূলায় পড়্যে অচেতন,
মা বল্যে ডাকে নাই কৃষ্ণ, ইকি দেখি বিবরণ।
দেখ্ আস্যে রোহিনী দিদি গোপালের গো কি হল্য,
বিনা মেঘে শিলাবৃষ্টি বজ্রপাত কেনে হল্য,
রোহিনী আসিয়া বলে তোর গোপালের কি হল্য,
বিনা মেঘে শিলাবৃষ্টি বজ্রপাত কেনে হল্য।
উঠরে বাপ্ চেতন কর, খাওরে ক্ষীর-নবনী,
তুমার জন্যে এই গোকুলে কাঁদিছে রাইরমণী।
উঠরে বাপ চেতন কর, ওরে আমার নীলরতন,
শ্রীদাম, সুদাম, সুবল সঙ্গে যাবেন কি গোচারণ।
উঠরে রূপ চেতন কর, ওরে ও কালোসোনা,
তুমার জন্যে এই যমুনায় কাঁদিছে কত জনা।

উঠরে বাপ চেতন কর, খাওরে ক্ষীর-নবনী,
মুখে বাজাও মোহন বাঁশী উজানে বয় যমুনা।
রোহিনী আসিয়া বলে, তোর গোপালের জ্বর হল্য,
ডাকিয়ে বৈদ্যকে এনে শীঘ্র কর‍্যে দেখালো।
এবর‍্যে কৃষ্ণের জ্বর হয়্যেছে, পড়ে আছে এক পাশে,
নড়ে নাই, চড়ে নাই কৃষ্ণ, মা বলে নাই কাল হত্যে।
অদ্য এল বৈদ্য রূপে, কৃষ্ণ ধনকে বাঁচাতে,
অমূল্য ধন দিবে বৈদ্য, যদি কৃষ্ণের প্রাণ বাঁচে।
কুথা হত্যে এল্যে বৈদ্য, কুথায় তোমার বসতি,
কেবা তোমার পিতা বটে কে বটে মাতা সতী।
পিতার নামগো নন্দ বৈদ্য মাতার নাম যশোমতী,
গোপাল বৈদ্য নামটি আমার নন্দালয়ে বসতি।
পরিচয় লিবে কি মা পরিচয়ের প্রয়োজন কি।
গোপাল যদি বাঁচে তোমার আমি বৈদ্য আস্যেছি।
কে আছে মা বেজে সতী ডাক মা শীঘ্র গতি
সতীর জলে ওষুধ বেঁটে বাঁচাব কালোশশী।
কুটিলা জটিলা বলে আমরা দুজন হই সতী
অহংকারে মত্ত হয়ে কাঁখে করে কলসী।
আঠারো ছিদ্র বারি দেখে লাগে বুকে ভয়
আয়ান দাদা বস্যে আছে দেখে পাছে গোসা কয়।
আমরা জলে যাব নাগো, আমরা জলে যাব না,
আয়ান দাদা বস্যে আছেন, দেখে করবেন গঞ্জনা।
ঘড়ি নাড়ো ঘড়ি চাড়ো খড়িতে দিয়েছ মন
রাধা নামে উঠ্‌ল খড়ি ডাক মা ও এখন।
রাধিকার বাড়িতে গেলেন গেলেন দূতী দুজনা
চলগো রাধে শীঘ্র কর‍্যে বাঁচবে কালোসোনা।
তরে দূতী, কি শুনলি, কি শুনলি শ্রবণে,

কেমনে আছে প্রাণগোবিন্দ দেখে আসি নয়নে।
রাধিকার গমন শুনে মূর্ছাগত হইল,
ধূলাতে ধূসর কৃষ্ণ মৃত্যুসমান হইল।
কে আলি, গৈরী আলি, বোস গো কৃষ্ণের পাশেতে,
আঁধার ঘরের মানিক আমার হেলাতে হারাই পাছে।
কে আলি মা রাধে আলি, আলিতো সেই রুক্মিনী,
তুই যদি মা জল এনে দিস বাঁচবে আমার নীলমনি।
দাও দেখি মা পাটের শাড়ী দাও দেখি ছিদ্র বারি,
যমুনার জল আনতে যাব, কাঁদিছেন রাইকিশোরী।
কুথায় আছ প্রাণগোবিন্দ, জন্মের দেখা হইল,
যদি জল না আনতে লারি, যমুনাতে প্রাণ দিব।
কুথায় আছ প্রাণ গোবিন্দ দাও কলসী ডুবায়্যে
যদি জল না ডুবাই দিবে,যমুনাতে প্রাণ দিব।
কদম গাছে ছিলেন কৃষ্ণ, কদমেরি ডাল ধর্যে
বিনতি করিয়েঁ ঝারি ডুবাঁইয়ে দিল কলসী।
লাভ দেখি মা রাধা ঝারি,
ভর্তি কি মা আছে ঝারি।
কলসীর জল নিয়্যে ওষুধ বাটিব।
ওষুধ বাটিয়া কৃষ্ণ বদনেতে দিল
পালঙ্কেতে উঠে কৃষ্ণ মা বল্যে ডাকিল।

এই পুরাণ - সঙ্গীতটিতে বোধচর্চা লক্ষণীয়। আবেগকে কিভাবে পরিমিত শব্দচয়নের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। যা পরবর্তীকালে আধুনিককাব্যকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে আধুনিক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

টুসুগানে আর একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো রূপকের ও উপমার সার্থক প্রয়োগ। এসব কারণে সাহিত্যগত বিচারে টুসুগান বেশ উৎকৃষ্ট। যা কেবল আমাদেব মুগ্ধই করে না, বিস্মিতও করে। আধুনিক কাব্যসাহিত্যের পথ প্রদর্শক ও দিশারী হিসেবে তাই টুসুগানকে চিহ্নিত করা যেতে পারে কোনো কুণ্ঠা না রেখেই।

এমনকি বাংলা কাব্য জগতের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যসাহিত্যের ভেতরেও টুসুগান ঢুকে পড়েছে তাঁর শিল্পগুণের আপার মহিমা নিয়ে। গিরিশচন্দ্রের " য্যায়সা-কা-ত্যায়সা" নাটকের

প্রথম দৃশ্যে নারীর আধুনিকতার প্রতি যে রঙ্গব্যঙ্গ করা হয়েছে সেখানেও টুসুগানের প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন —

কাঙ্গালী বাঙ্গালীর মেয়ে কাজ কি বিবিয়ানা বাই।
বুকে পিঠে সেঁটে ধরে, জ্যাকেট বডির মুখে ছাই।।
এখন চলছে কসতা পেড়ে সাড়ী,
শাখার আদব বাড়ী বাড়ী,
ভেঙ্গে কাঁচের বাসন কাচের চুড়ি
ছুটেছে কাচের বালাই।
টুসুগানে আধুনিক বিলাসিনী নারীদের ব্যঙ্গ করে রচিত হয়েছে এরূপ —
যুগ স্বাধীন এবার
মেয়েরা সব করছে স্যাণ্ডেল ব্যবহার।
কলির মেয়ে স্বাধীন হলো গো সতীত্ব আর রাখলো না
নিজপতি ত্যজ্য করি উপপতি ছাড়লো না।
যুগ স্বাধীন এবার
হাল ফ্যাশানের নর-নারী গো দেখি অতি চমৎকার।
ঘোমটা খুলে চশমা চোখে হিমানী করে ব্যবহার।
সামনে সিঁথি উলটে দিয়ে গো বামে টেরি ঘেরা সবার
দয়াল এখন ভাবছে বলে সংসার হল অসার।

তবে, বাংলাদেশের টুসুর ন্যায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও অনুরূপ উৎসবের প্রচলন আছে। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লী, পেপ্সু এবং পাঞ্জাবের কোনো কোনো জেলায় টেসু নামক এক প্রকার লোকসঙ্গীতের প্রচলন শুনতে পাওয়া যায়। যদিও উভয়ের নামের মধ্যে এক ঐক্য বিদ্যমান হলেও কিন্তু টুসুগানের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু ছোটনাগপুর অঞ্চলের আদিবাসী ওঁরাও জাতির মধ্যে টুসুর ন্যায় একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তার সঙ্গেই টুসু উৎসবের এক আপাত মিল লক্ষ্য করা যায়। আবার ছোটনাগপুরের বীরহোড় জাতির মধ্যে টুসুর ন্যায় এক উৎসবের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। তার নাম 'নয়াজোম'। নতুন ধান ভক্ষণকে বলা হয় 'নয়াজোম'। আর একটি উৎসবের প্রচলন আছে, তার নাম 'সোসোবোঙ্গা'। সোসোগাছের ডাল পোঁতা উপলক্ষে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ওঁরাও জাতির মতন মুণ্ডা জাতির মধ্যেও টুসুর মতন একটি উৎসবের প্রচলন আছে, তার নাম 'মাগে পরব'। এই উৎসব পৌষ মাসের পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠিত হয়। টুসু উৎসবের

মতন গৃহস্থ সকলে এই উৎসবে উপবাস করে এবং গৃহদেবতার কাছে শান্তির কামনা করে। কাজেই -- টুসুগান যে ক্রমশ নানান আদিবাসীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা বিস্তার করে ফেলে এবং নানা জেলার ভেতরে নানান উৎসবের মধ্যে ঢুকে পড়ে তার মূলত কারণ হলো টুসুগানের শিল্পগুণ ও মানবিক রূপের জন্য।

টুসুগানকে তাই আদিবাসী মানব সমাজের একটি চিত্রিত দলিল বলতে আমাদের এতটুকুন কুন্ঠা নেই। এ কারণেই টুসুগান পরবর্তীকালে আধুনিক কাব্য ও নাটককে ছুঁয়েছে মূলত তার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের বিরাটতত্ত্বের চিত্রিত রূপাঙ্কনের জন্যই বলা যেতে পারে।

চটকা গান

ভাওয়াইয়া গানেরই একটি শাখা হলো চটকা গান। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতে (বাংলার লোকসাহিত্য ৩য় খণ্ড), "ভাওয়াইয়া গানেরই একটি অধঃপতিত রূপের নাম চটকা। ইহা তাল-প্রধান সুরে রচিত। দৈনন্দিন জীবনের নিতান্ত লঘু বিষয় ইহার অবলম্বন। ইহাদের গীতিগুণ যাহাই থাকুক, কোন সাহিত্য গুণ নাই।"

"উত্তর বঙ্গের লোকসাহিত্য" -এ (স্মরনী, ১৯৬৮) সামীয়ুল ইসলাম আবার বলেছেন, 'চটকা সুরের ভাওয়াইয়া গান খুব তাড়াতাড়ি গীত হওয়ায় ইহা "চটকা" নামে অর্থাৎ তাড়াতাড়ি শব্দটিকে লিঙ্গ করে এই 'চটকা' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে।" তবে, আমার মনে হয় --- চটজলদি গাওয়ার জন্যই গানগুলিকে চটকা গান বলা হয়েছে। বিশেষ করে গানগুলির কথা ... র দিকে নজর রাখলে এ ব্যাপারে আমি ষোলআনা নিশ্চিত। কোনো গভীর চিন্তাভাবনা না করেই চটজলদি গাওয়া হয় আর কি! কাজেই, 'খুব তাড়াতাড়ি না গীত' হওয়ার জন্য যে সামীয়ুল ইসলাম চটকাগানের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা যথাযথ।

"উত্তর বাংলার পল্লীগীতি" (চটকা খণ্ড) ৮৩টি চটকা গানের যে সংকলনটি প্রকাশ হয়েছে ১৩৮২ বঙ্গাব্দে হরিশচন্দ্র পাল মহাশয়ের সম্পাদনায়, সেখানে চটকা গানের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে মূল্যবান আলোচনা পাওয়া যায় তা থেকে পূর্বের অনেক ধারণাই ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা দীর্ঘকাল ধরে চটকা গান সম্পর্কে জেনে এসেছি, যে চটকা গান লঘু ও ভাবের গান। এ গান মূলত ভাওয়াইয়া গানেরই একটি শাখা বা অংশ বিশেষ, এ গানের কোনো সাহিত্য গুণ নেই। যা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেছেন। আমাদের এ-ও বদ্ধমূল ধারণা ছিল সাধারণত পরকীয়া প্রেম ও কেচ্ছাকাহিনীই এ গানের বিষয়। তবে, ক্ষিপ্র তাল ও কিছু আকর্ষণমূলক বিষয়ের জন্য এই গান জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু হরিশচন্দ্র পাল মহাশয়ের সংকলন গ্রন্থে সংকলিত গানগুলিতে যেটি লক্ষণীয় তা হলো,চটকা গানে যে সাহিত্য গুণ একদম নেই তা বলা যাবে না। কারণ ঘটনা পারম্পর্যে সমাজের নিখুঁত কিছু চিত্রও চটকাগানে লিপি আকারে অঙ্কিত হয়েছে। সাহিত্য গুণের বিচারে উৎকৃষ্ট মানের না হলেও চটকা গান একেবারে ফেল্‌না নয়। বিশেষ করে উক্ত সংকলনের একটি গানে দেখি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের জন্য প্রথমা পত্নীর করুণ অবস্থার অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণার কথা ফুটে উঠতে ---

সতীন নিকা করি আইন্‌লে তোক্‌
ঝগড়া করি মাইল্লে মোক্‌
মোক্‌ সজালু ধারার তলে এঁদুর
ওরে ভাত না কাপড় ধুড়িয়া চাপড়

দয়ার দাদাক্ দিচোঙ খবর

পানিয়ামরা ছাড়িয়া না দে নাইত্তর।

এমলকি, চুরি করার ফলে পুলিশের হাতে শাস্তি ভোগের কাহিনীও উঠে এসেছে চটকা গানে। যেমন ---

মাইর্তে মাইর্তে করিলেক কালা তোঁও কয় ওরে শালা

দুইজনে ধরিয়া দিলেক্ বাশ ডলাডলি।

আরে মুখ দিয়া বিড়াইল্ রক্তের সলা বাপ্ বুলি জ্যাকানুস্যালা

ডাকেয়া সে কঙ্ "বাবু মুই কচ্চোঙ চুরি"

মহারাজার হুকুম জারি কত চোরাক্ আইন্চে ধরি

চালান দিচে ফৌজদারি কাছারি

আরে হাকিম বাবু বিচার কৈল্লা ছয়মাস আমার ফাটক্ হইল

জেলখানাতে করিনু বসতি

আবার, চটকা গানের মধ্যে বিরহের ন্যায় করুণ বিষয়বস্তুরও লক্ষ্য করা যায় হরিশচন্দ্র পাল মহাশয়ের চটকা গানের সংকলন গ্রন্থটিতে।

চটকা গানের যে একদম সাহিত্য গুণ নেই একথা খণ্ডনের জন্য এখানে একটি চটকা গান উল্লেখ করা যেতে পারে, যেই গানটিতে লক্ষ্য করা যায় লঘু পরিহাসের ছলে কলকাতার শহরে শৌখিন মেয়েদের রূপ-প্রসাধনের ব্যাপারটি চিত্রিত হয়েছে। যেমন ---

আমার বাংলায় করে মোন ফাঁপর

চল যাই কইলকাতা শহর।

শহরে ভাড়া করলাম ঘর,

থাকি দোতলার উপর।

দিনে দিনে গিন্নীর মন করে ফর্ ফর্।

(আবার) গিন্নী গাড়ি ঘোড়া দৌড়িবার চায়

ও গিন্নী দ্যাখতে চায় দিল্লীর শহর —

এসে এই কইলকাতা শহর।।

ও গিন্নী আলতা পরে পায়,

পায়ে ছ্যাণ্ডেল লাগায়,

চোখে চশমা, হাতে হাতঘড়ি যে দেয়,

ও গিন্নীর ভ্যানিটি ব্যাগ, সোনার গয়না গায়,

ও গিন্নী বাইনতে বলে লেকে ঘর

এসে এই কইলকাতা শহর।

ভেবে মুকুন্দ বলে মোনের আক্ষেপে

ও গিন্নীর আছে সকলে,

স্বমীর কোলে দিয়ে ছেলে

রাস্তাতে চলে।

ও তার ডুরে শাড়ী, রেশমী চুড়ী, তবু আমায় ভাবে পর,

চল যাই কইলকাতা শহর।।

এই গানটি ঠিক আধুনিক কবিতার মতোন। কলকাতা শহরের সৌখিন মেয়েদের সাজ-প্রসাধনের এমন নিখুঁত বর্ণনা চটকা গানের সাহিত্য সমৃদ্ধিরই পরিচয় বহন করে। আবার, রহস্যময় কলকাতা শহরের মোহজাল সরল মানুষদের কেমন মোহগ্রস্ত করে ফেলে এবং সরল মানুষকে সেজন্য ফাঁপরে ফেলে তারও উল্লেখ পাওয়া যায় জলপাইগুড়ির একটি চটকা গানে। যেমন —

আমায় বাঙলায় করে মন ফাঁপর,

চল যাই কইলকাতা শহর।

শহরে ভাড়া করলাম ঘর, দোতলার উপর।

দিনে দিনে আমার মন করে ফাঁপর।।

কুইলাপালে যে সব রসের গান প্রচলিত আছে, যাকে কুইলাপালের রঙ্গরসের গান বলা হয় -- আসলে সেসব গানই হলো চটকা গান। উত্তর বাংলায় যাকে চটকা গান বলা হয় -- কুইলাপালে সেই গানের নাম রঙ্গরসের গান। কুইলাপালের রঙ্গরসের গানগুলিতে সাধারণত লঘু হাস্য রস পরিবেষন করা হয়। তবে, গানগুলি বেশ মজার। গানের রঙ্গ-রসিকতাও বেশ উৎকৃষ্টমানের। এখানে এরূপ একটি রঙ্গ-রসিকতার গান তুলে ধরছি, আদপে যা চটকা গান --

বিয়া করে কি ঝক্‌মারি,

বিয়ের আগে ছিলাম পুরুষ, আমি এখন হলাম নারী।

সকাল বেলায় করবে বরাত, এনে দাও পান দোক্তা সুপারী

জোগাড় করে দিলে বলে, তোমার ঘরে নাই তরকারী;

বিয়ে করে কি ঝকমারী।।

শাক মূলা কাঁচা কলা কিছু জোগাড় করতে নারি;

পির্‌রা এনে দিয়ে বললাম, 'এটার নাম সরকারী তরকারী'।

কাঁখের কলসী কাঁখে ফেলে যাবে দিতাটি গণ্ডারি।

এমনি ভাবে চলবে, যেমন যুদ্ধে যাচ্ছেন পেয়ারী

উল্টা পাল্টা তেপাল্টা তিন সাত্তে একুশবার ঝকমারি,

লক্ষ্মীকান্ত বলে ভাই বরং উপাসনা সবাসনা করি।

গানের শব্দবন্ধনেও বেশ মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে 'এটার নাম সরকারী তরকারী' শব্দগুলিতে।

তবে, উত্তরবঙ্গের চটকা গানে গ্রাম্য জীবনের অতি সাধারণ ও তুচ্ছ ঘটনাও উঠে এসেছে। জীবনের যে সমস্ত কথা স্মৃতি-রোমন্থনে উঠে আসে, সেইসব স্মৃতিকথাই চটকা গানে রচয়িতাদের হাতে আবেগমিশ্রিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে লক্ষ্য করা যায়। এমনকি, চটকা গানে রাধাকৃষ্ণ পৌরাণিক দেবমূর্তি পরিত্যাগ করে রক্তমাংসের গড়া মানব-মানবীরূপে উপস্থিত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। এমনকি, উত্তরবঙ্গের চটকা গানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সামাজিক চিত্রও ফুটে উঠতে দেখা যায়। যেমন ---

নাক ডাঙবায় বেটাটা

চোখ ডাঙরীর নাতিটা

মোক ভুলালু সতের খাড়ু দিয়া।

তকনে না কছিস তুই রে

হাল চারিখান, গরু পাঁচ হাল

দেউটি গরুর নেকায় জোকায় নাই,

ঘরত আসিয়া দেখলু মুই

চাতুরালি করলু তুই

ঘরত হীনা তোর ছানি দিবার নাই।।

. . . ইত্যাদি।

আর একটি উত্তরবঙ্গের চটকা গান এখানে তুলে ধরছি। গানটি সাদামাটা। আঞ্চলিক ভাষা ফুটে উঠেছে গানটিতে বেশ ভালভাবেই। যেমন —

মোর সাধু আসিছে

তোক্ ছাড়া আর কাক্ কওঁ মুঞি

মোর সাধু আসিছে।

ও তুই খাস্‌রে দিলু দাঁত

আঃ তুই না ট্যালাইস্‌ গাত্‌

আর ফাসার ফুসুর না করিস্‌ তুই

ও মোর সময় লাগিছে।

এখানে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার দুটি চটকা গানের দৃষ্টান্ত রাখছি। যদিও কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির চটকা গানের মধ্যে তেমন ভাষাগত ব্যবধান বা পার্থক্য চোখে পড়ে না। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের সংগৃহীত চটকা গান যেমন ---

১. ও শাশুড়ি, মাই না পাই মুই ভাত রান্ধিবার,

মুই ত' মোড়লের বিটি

ভাত রান্ধিবার না জানি

ভাত খাও ত ধর আন্ধুনী।

ও শাশুড়ি মাই, না পারি মুই গোবর ফ্যালাইবার।

গোবর ফ্যালাইলে হাত গোন্ধাই

খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হয়,

ঝাঁটা মারি মুই গরুর কপালে। (কোচবিহার)

২. আগা নাও যে ডুবুডুবু পাছা নাও যে বইস

ঢোঙায় ঢোঙায় ছেকো জল রে ---

জল ছেকিতে জল ছেকিতে সেঁউতির ছিড়িল দড়ি,

গলার হার খুলিয়া কন্যা রে ---

ও কন্যা সেঁউতির লাগাইস দড়ি।

ভাঙ্গা নাওয়ে খেওয়া দিতে কেমন মজা পাও।

ভাঙ্গাও নোয়ায় চূড়াও নোয়ায় সোনা রূপায় গড়া,

বাজার হতিক পার করিছো ভরে, ও কন্যা, তোর বা কত ভাড়া।

সব সুন্দরীকে পার করিতে নিছও আনা, আনা আনা,

তোকে সুন্দরীকে পার করিতে নেগাইম কানের সোনা।। (জলপাইগুড়ি)

উপরিউক্ত চটকা গানগুলিতে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় চটকা গানে কোন সাহিত্য গুণ খুঁজে পান নি। তবে, তাঁর কথা যে শেষকথা নয়, তা অনেক চটকা গানে লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক ছবি, ঘটনা পারম্পর্যে জীবনযাপনের যে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা চটকা গানে উঠে এসেছে তার সাহিত্যের কোন গুণ নেই বলা যাবে না। উপরিউক্ত গানগুলিতে কিন্তু একটা জিনিস লক্ষনীয় — সরল মনের অভিব্যক্তির স্বপ্রকাশ। যা পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের ভেতরে ছড়াগীতে লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে।

তবে, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের চটকা গানে শব্দের নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। কারণ একটাই — আঞ্চলিক কথ্য ভাষার প্রভেদের জন্য এমনটি ঘটেছে বলা যেতে পারে। আর একটা কথা বলা বোধ করি উচিত হবে, চটকা গানের সুর পরবর্তীকালে অনেক আধুনিক বাংলা গানকেও প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে ব্যঙ্গ-রসাত্মক গানে চটকা গনের সুর লক্ষ করা যায়।

চটকা গানের আর একটি বিশেষ গুণ হলো, এ গান সমস্ত ধর্মীয়ও যাদুবিদ্যাগত প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। জীবনযাপনের ব্যক্তিগত কথা-ছবি কত সুন্দরভাবে চটকাগানে উঠে এসেছে তা বিস্ময়কর। এদিক দিয়ে চটকাগানে সাহিত্য গুণ লক্ষণীয়। রংপুর জেলার এরূপ গান এখানে তুলে ধরছি —

আসিয়া দ্যাকিয়া বসিনু কাইন
দিনমানে না পড়ে হাতের গাইন।
এ্যাকদিন মরায় কাম করে
তিনদিনে খায় তার বসিয়া
ছোট দেওরায় দেয় মোক কাপড়া আনিয়া

আবার —

আরে দাদা আইল কাঁলে ভালে
নাইয়োর নিয়া যাবার ছলে
পানিয়া মরা সেইদ্‌নে ধরি মারে
ওরে আইত পোয়াইলে মঙ্গলবার
শরীলটাত মোর নাইরে ভাল
বুদবারে তো যাওয়ায় হবার নয়।

সাখী গান

সাখীগান পশ্চিমবাংলার প্রচলিত একটি গান। এ গান অনেকটা তরজার মতোন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতে (বাংলার লোকসাহিত্য ৩য় খণ্ড), "মনসা পূজার ঘাটের জল আনিতে যাওয়ার সময় দুইটি দলের মধ্যে এক পক্ষ অপর পক্ষকে প্রশ্ন করে। উত্তর দানে সক্ষম হইলে তবেই অপর দল ঘটের জল লইয়া যাওয়ার অনুমতি পায়।

ইহা এই অঞ্চলের সাপের ওঝাদের মধ্যে প্রচলিত ঝাঁপান অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ। গুণী বা ওঝাদিগকে লইয়া ঝাঁপানের শোভাযাত্রা যখন গ্রামের পথ দিয়া অগ্রসর হয়, তখন পথিপার্শ্বস্থিত ওঝার আর একটি দল, মনসা ও সর্পচিকিৎসা-বিষয়ক কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, অন্যদল তাহার জবাব দিয়া পথে অগ্রসর হয়।"

আবদুল হাফিজ এ গান সম্পর্কে বলেছেন (লৌকিক সংস্কার ও বাঙালী সমাজ গ্রন্থে), "সাখীগান মৌলিকভাবে যাদুবিদ্যাগত (**megical**); কেননা ঝাঁপান অনুষ্ঠান ওঝা বা গুণিকদের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে গাওয়া হত।" সাখীগান তবে প্রশ্ন ও উত্তরে বেশ রসমধুর। তরজার মতোনই প্রশ্ন ও উত্তরে বেশ গভীর তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রীয়-প্রসঙ্গ ও পুরাণ এসে পড়ে। সাখীগানে কাশীরাম দাসের রামায়ণ পাঠের মতোন সুরও লক্ষ্য করা যায় সাখীগানে। ছন্দ ও মিল বেশ সুন্দর এখানে কটি সাখীগানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখছি —

১. প্রশ্ন — শুন শুন গুণিগণ করি নিবেদন।
অকস্মাৎ এক কথা হইল স্মরণ।
কেবা যাও তুমি ভাই বারি লইয়া।
এক কথা জিজ্ঞাসিব যাও হে বলিয়া।
পিতা মুখে শুনিয়াছি অপূর্ব কাহিনী।
কি হইতে মনসার এক চক্ষু কাণী।।
ইহার উত্তর যদি না বলিতে পার।
হরি-হর শব্দে তোমরা সাখী গাইতে নার।।

উত্তর — শুন শুন গুণিজন করি নিবেদন।
যে সাখী কহিলাম উত্তর কর হে শ্রবণ।।
পদ্মপাতে জলপান পদ্মার কুমারী।
অ-যোনি সম্ভবা তিনি শিবের নন্দিনী।।

একদিন বিশ্বনাথ ভাবিল অন্তরে।
মনসাকে লয়ে যান আদর করে।।
মনসাকে দেখে দেবী কোপ করিলেন।
ত্রিশূল আঘাতে চোখ ফোটাইলেন।।
সেই হইতে মনসার বাম চক্ষু কাণী।
সাখীর উত্তর বলে দিলাম আমি।
ঘরে গিয়ে গিয়ে পুরাণ খুলে বিচার কর তুমি।।

২. একদিন কংস রাজা সভাতে বসিল
দূত গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রে ধরিয়ে আনিল
কংস রাজা বলে কৃষ্ণ শুন মন দিয়া
কালিদ হইতে আন কলম তুলিয়া।
তাহার উপরে হরি ছাড়েন সিংহনাদ
সে শুনে কালি নাগে পড়েছে প্রমাদ।
মুখ বিস্তারিয়ে কালি ধাইল সত্বরে
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণকে পুরিল উদরে।
বলরাম বলে দাদা বদ্ধ কেন হও?
তোমার সেবক গরুড় তারে স্মরণ কর।
বলরামের বাক্যে কৃষ্ণের হইল চেতন
গরুড় গরুড় বলি কৃষ্ণ করিল স্মরণ
কুশল দ্বীপের মধ্যে গরুড়ের আসন টলিল,
আসন টলিতে গরুড় ধেয়ানে জানিল।
ধেয়ান যে জানিল গরুড় সর্ববিবরণ
কালিদে কালি নাগ গিলছে নারায়ণ
এক পঙ্খ করে গরুড় কালিদ বান্ধিল
আর এক পঙ্খ করে গরুড় কালিদ ছিচিল
সাত তাল জল গরুড় করিলে ছেচনি
কর্ণপাতে শুনে গরুড় লাগের সংশনি

এক ক্ষুদ্র সাপিনী গিয়ে কালিনাগে কয়
কোথা হতে মহাবীর গরুড় এলো কালিদে।
গিয়েছিলে কৃষ্ণচন্দ্রে উগাড়িয়া দিল
বিনয় করিয়া কালিনী ধরলো তার পায়
হর বিষ চাও ফিরে ভাই বিষের নাম গাই
চাইতে চুড়ার পানে আর বিষ নাই।

৩. চিনি চিনি করে বিষ ক্যাহা যাও তুমি।
ফটিক বরণ বিষ পান করি আমি।।
জঙ্গ বিজঙ্গ ভাই পলা ছিল বাজী
বত্রিশ দন্তের খালের সাপা বিষ করিলাম পান।
ধূলায় তো লিটিপিটি সরু বিষের জ্বালা
ভবান কাটিয়ে উড়িয়ে পালা
না চলে মেদিনী কম্পে বিষের তলা ভরা
নাম নাম বৃষ্টি ঘামুক খবর।
কুথা চণ্ডী বিষহরি বাশিবৃক্ষ মূলে
একবার এখানে আসিও।
সন্তানে না দেখিয়া ভাই আসে তাই আসে গুরুর সন্ধানে
আকাশে নাচিছে নাগিনী যত মনসার ভাসনে
জরৎকারু ছিলেন জানিয়ে মহিম মণ্ডলে
অস্তাদে বাঁধিয়ে ফেলে সাগরের জলে
কুজ্ঞান বিজ্ঞান কাটি করে খানি খানি
ভয়ে সাপাধাপা বলে করে আগুয়ান
মাতা কুজুবুড়ি ধীরে ধীরে আসে
বেহুলা কান্দে নিজের চক্ষের জলে ভাসে
আয় আট আয় হরি বিষহরির ঝি,
গরুড় মনসার দুই তোরে সিদ্ধি কামাক্ষ্যার আজ্ঞায়
শীঘ্র আয় শীঘ্র আয়।

৪. বিষ হরি বিষ হরি সাপিনী ডাকিনী করে ডর
গাছ পাথর উড়াইয়া লাগা বাধা চলাফেরা না সয়,
সাপা হারাইয়া রোজা থাকে হেট মাস
বলে বুড়ি চোর হইয়া থাক সাথে।
ছত্রিশ কোটি দামের মন্ত্র করে ভর যদি
হয় মিথ্যা, হয়ে তো যাবেন রসাতল
কার আজ্ঞা দিবি কামাখ্যার আজ্ঞায়।

৫. প্রশ্ন -- পশ্চিম হতে আস ভাই পুবে চলে যাও,
কাহার মন্দিরে তুমি ভিক্ষা করে খাও।
কোথায় তোমার ঘর দরজা কোথায় তোমার বাড়ী,
কিবা তোমার নিজ নাম কিবা তোমার জাতি।
চলিয়া সবার মাঝে রাখছে খেয়াতি।
সাখীর উত্তর যদি না বলিতে পার,
হরি হর শব্দে তোমরা সাখী গাইতে নার।

উত্তর --- শুন শুন গুনিগণ করি নিবেদন,
যে সাখী কহিনু উত্তর করহে শ্রমণ।
পশ্চিম হতে আসি ভাই পূর্বে চলে যাই,
শিবের মন্দিরে আমি ভিক্ষা করে খাই।
এগ্রাম সেগ্রাম বলি গণ্ডাপালে বাসা,
কেবল মাত্র মোর মনসা ভরসা।
নিজ নাম ঘনশ্যাম শুন সর্বজনে,
পিতার নাম রাধানাথ কহিনু এক্ষণে।
শিক্ষাগুরু লক্ষীকান্ত কহিনু এখন,
তাহার চরণ বন্দি সবার ভিতর।
মাহাতো মোর জাতি বলিয়া সবার মাঝে রাখিনু খেয়াতি।
সাখীর উত্তর বলে দিলাম আমি
ঘরে গিয়ে পুরাণ খুলে বিচার কর তুমি

সীতার সনে প্রয়োজন নাই তোমায় আমায় জোড়।
ঐ কথা শুন্যে দৌড়ে গিয়ে ধরল লক্ষ্মণ সূর্পনখার জটে
আহা কেনে বা আইলাম মান হারাইলাম পঞ্চবটীর বনে।

২. সাকী শুন সাকী নাথ গোকুলেরই কথা,
পঞ্চ অবতারে কৃষ্ণের জন্ম হলো কোথা।
জন্ম হলো এথা সেথা দৈবকীর ঘরে,
বাসুদেব তুলে নিল গোকুল নগরে।
গোকুল নগরের লোক বলে হরি হরি।
পুষ্প দেখে ঝাঁপ দিলেন মুকুন্দ মুরারি।
বিষজল ছিল ভাই অমৃত জল হ'লো।
তা দেখিয়ে গরুড় বীরকে স্মরণ করিল।
দেখ দেখ গরুড় বীর দেখ দুটি আঁখি।
এখনি ধরেছি সখো, নাহি মানে সাকী।।
এলেন সুপাত ভাই বেলের সে পাতা।
তা দিয়ে পড়াইব কুজ্ঞানের মাথা।

৩. পঞ্চবটীর বনে রাম বান্ধি কুড়াখানি।
কাল হইয়ে এলো রামকে সোনার হরিণী।
ঐ মৃগ দেখতে পালায় জানকী নন্দিনী।
ঐ মৃগ ধরে দাও হে রাম রঘুমণি।
ধরিতে নারীর মৃগ, মেরে জিব আমি
দুর্জয় গণ্ডীর বাঁধ লয়ে রাম চলিলেন শিকার।
আগে আগে যায় মৃগ পশ্চাতে শ্রীরাম।
নাচিতে নাচিতে মৃগ গেল দূর বন।
গাছের আড়ে থেকে থেকে মৃগ খেলেন বাণ।
বাণ খেয়ে ডাকে মৃগ কোথারে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলে কান্দে লাগিল।
সেই বাক্য শুনতে পেলেন জনক নন্দিনী।

মা মনসার চরণে অসংখ্য প্রণাম।

বাজুক বিষম ঢাক চলুক ঝাঁপান।।

সাখীগানে রামায়ণের কাহিনীও ভরপুর লক্ষ্য করা যায়। সাপের-মন্ত্রের মধ্যেও যে রামায়ণ কাহিনী বেশ রসময় হয়ে প্রবেশ করেছে। যা বেশ হৃদয়স্পর্শী। এখানে কটি উদাহরণ রাখছি যা রামায়ণ কাহিনীতে বেশ পুষ্ট —

১. সীতার বনে রঘুনাথ পঞ্চবটীর বনে,
জানকীর সহিত রাম বসিলেন একাসনে।
খেলিছেন রাম পাশাসারি।
হেনকালে রাইক্কস মেয়ে এল সেইখানে।
নাম তার সূর্পনখা চাউনি বাঁকা কানে মদন কড়ি,
কুঁচি (কুচি) করে পরে আছে কমলা পাড়ের শাড়ি।
দেখায় যেন মেঘের নীল কিনারা,
তায় দিয়েছে কোঁচা লম্বা হয়ে পড়ল মাগীর রাম কদলের মোচা।
মাগীর ঠম ঠমকা আড়ে ঘোমটা আড় নয়নে চায়,
বুকের উপর পীর পয়দা মুক্তা বেড়া তায়।
তিনি যেন তিলোত্তমা সত্যভামা উর্বশী মেনকা,
মেয়ে রূপে নবরূপে হলেন সূর্পনখা।
এলেন রামের কাছে মধুর ভাষে জোড় করি হাত,
একটি নিবেদন শুনহে ওহে রঘুনাথ,
আমি তায় অল্পকালে ব্রতছলে ছাড়িয়ে বসতি,
দেশে দেশে খুঁজে পাইনা মনের মত পতি।
ইহা যদি মনে লাগে তাহার আগে কি করিতে পারে।
খেলিব রসের খেলা হয়ে একত্রিত,
থাকিব নীলকমলে চাঁপার তলে,
সীতার সনে প্রয়োজন নাই তোমায় আমায় জোড়।
ঐ কথা শুন্যে দৌড়ে গিয়ে ধরল লক্ষ্মণ সূর্পনখার জটে —
গোটা দুই পাক দিয়ে ভূমে ফেলে টুটে গেল কান।
উঠেছে গুপ্তাচুড়ী ভেড়া দৌড়ি যেন উদাম সাড়ী,
জানকী হাসিয়ে বলে কি হল লো রাঁড়ী

সঙ্কটে পড়িয়ে রাম হে ডাকেন লক্ষ্মণ।

শুন শুন সাঁতা বলি গো তোমায়।

ত্রিভুবনে বীর নাই গো, রাম আইসে জিনে।

কে জানে কে জানে, প্রভু, তোমাদের মহিমা।

কটুবাক্য শুনে লক্ষ্মণ কর্ণে দিলেন হাত।

রামকুণ্ডু বলে লক্ষ্মণ দুয়ার দিলেন আঁক।

এই অঙ্ক যদি সীতা তুমি হও গো পার।

কখনো না দোষ দিবে লক্ষ্মণ তোমার।

রাম মন্ত্র শুনে তুই উড়ে যা।

ওৎ ভাইরে,

রাম গরল লক্ষ্মণ গরল গরল হনুমান

পশ্চাতে ঢলিয়া পড়েন নারী জাম্বুবান।

শুন বিনোদিনী —

শ্রীরাম স্মরণে বিষকে কইরা এলাম পাণি।

সাখীগানের ওঝার সাপের বিষ তাড়ানোর বৈশিষ্ট্য আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যতেও লক্ষ্য করা যায়। দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলাবুড়ো' নাটকে বিশেষ করে। যেমন ---

এলোচুলে বেনে বউ আলতা দিয়ে পায়

নোলক নাকে, কলসী কাঁকে জল আনতে যায়।

আঁচোল বয়ে উঠলো গিয়ে হলদে সাপের ব্যাং

ঘুমের ঘোরে কামড়ে ধরে, তার একটা ঠাং।

তাইতে সতী গর্ভবতী পতি নাইকো ঘরে

হায় যুবতী মৌনবতী, বাক্য নাহি সরে।

দৈবযোগে, অনুরাগে, সাপের ওঝা যায়,

কুলের নারী বলতে নারি, পেটে দিলে হাত।

ওঝার কোলে বিলের জলে, কর্ল্যে গর্ভপাত।

হাত পা হলো বেঙ্গের মত মানুষের মত গা,

গলা হলো হাড়গিলের মত মানুষের মত গা।

মা পালালো বাপ পালালো রইলো কচি খোকা।
কচমচিয়ে চিবিয়ে খেলে দশটা শুয়োপোকা।
ঘোড়া কেন্নো পুড়িয়ে খেলে কেঁচো দিয়ে তাতে,
আঙুল ধল্লে কেউটে দুটো গক্‌রো ধল্লে দাঁতে।
উড়ে এলো গরুড় পাকি আকাশের কাজ ফেলে,
এক ঠোকরে নিয়ে গেল শূয়োর মুখো ছেলে।'
আঙ্গুলগুলো রইলো পড়ে খগপতির ঘরে
চেঁচে ছুলো মুড়ো ঝাঁটা ওঝার বাপে করে।
ঝাঁটার চেটে, আগুন ওঠে কেউটের ভাঙে ঘাড়,
হাড়ির ঝি, পেঁচোর মার, আচ্ছা, শিগ্‌গির ছাড়।

সাখীগানের মতোন ওঝার কথা অবশ্য আধুনিক বাংলা নাটকে নানাভাবে এসেছে। এমনকি, ভূত তাড়ানোর প্রসঙ্গেও ব্যঙ্গ-কৌতুক রসে রসমণ্ডিত হয়ে।

ভাটিয়ালি গান

ভাটিয়ালি হলো পূর্ববাংলার একটি জনপ্রিয় প্রধান গান। ভাটিয়ালি সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেছেন (বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে), "পূর্ববঙ্গ অঞ্চল লইয়া বাংলা লোকসঙ্গীতের আর একটি আঞ্চলিক বিভাগ গঠিত হইয়াছে। মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ঢাকা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের প্রধান লোক-সঙ্গীত ভাটিয়ালি নামে পরিচিত। প্রকৃত পক্ষে ভাটিয়ালি বিশেষ কোন এক শ্রেণীর সঙ্গীতের নাম নহে, ইহা লোকসঙ্গীতের একটি সুরের নাম।"

গীতশ্রী সাবিত্রী ঘোষ তাঁর "বাংলা গানের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে ভাটিয়ালি গান সম্পর্কে বলেছেন, "সাধারণত এই ধরনের গান মাঝিরা নদীপথে গেয়ে থাকে। এ গানের মধ্যে আছে আত্মসমর্পণ ও আত্মনির্ভরতার আকুতি। মানুষ যখন নিজেকে একান্ত একা মনে করে, তখন সে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে --- প্রকাশ করে নিজ অন্তরের বেদনা।"

আশরাফ সিদ্দিকী মহাশয় তাঁর "লোকসাহিত্য" গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে ভাটিয়ালি গানের স্বরূপ সম্পর্কে দেখি বলেছেন, "নদীর ভাটি দিয়ে নৌকা বেয়ে যেতে সাধারণত নৌকার মাঝিগণ যে গান গাইত তাকেই ভাটিয়ালি বলা হ'ত। দিগন্তব্যাপী নদীর শূন্যতার উপর নায়ের বাদাম উড়িয়ে একক ভাবেই এ গান গাওয়া হ'ত --- যন্ত্রের কোনই ব্যবহার ছিল না। দিগন্তব্যাপী ঢেউ-এর উপর 'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে আমি আর বাইতে পারলাম না' প্রভৃতি গানের কলিগুলি যখন ছড়িয়ে পড়তো তা চিত্তনদীতেও ভাবের তুফান তুলতো।"

খালেদ হাসান মহাশয় আবার "ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া" শীর্ষক আলোচনায় ভাটিয়ালি গানের প্রধান উপজীব্য বিষয় হিসেবে প্রেমের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, "পার্থিব প্রেমের ভাটিয়ালি গানগুলি নারীমনের নানা ভাবের সাক্ষী। কিন্তু প্রায় সব ভাবেরই মূল এক -- আশাভঙ্গ।"

কিন্তু ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে (বাংলার লোকসাহিত্য ৩য় খণ্ড) মতে, "বিষয়ের দিক হইতে ভাটিয়ালি গানকে প্রধাণতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন, প্রথমতঃ লৌকিক প্রেমমূলক, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণপ্রেমমূলক এবং তৃতীয়তঃ বৈরাগ্যমূলক।"

দুটি ভাগই প্রেম-বিষয়ক বলেই সম্ভবত খালেদ হাসান মহাশয় ভাটিয়ালি গানে প্রেম বিষয়কেই প্রধান উপজীব্য বলে মনে করেছেন বলা যেতে পারে।

ভাটিয়ালিকে প্রকৃতির গানও বলা যেতে পারে। পূর্ববাংলার নদীমাতৃত বাংলা প্রকৃতিই এই গানের জন্মদাতা। বলা যায়, ক্ষণিক অবসর যাপমের নিমিত্ত এই ভাটিয়ালি গান প্রধাণতঃ

আপনা থেকেই সুরে সুরে জাল বুনে বেড়িয়ে আসে। ভাটিয়ালি গান হলো মূলত আবেগের গান। তবে, আসরাফ সিদ্দিকীর কথা মেনে নিলেও কিন্তু এ গান নদীর সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত নয়। বরং বলা ভালো — এ গান হলো প্রকৃতির এক মুক্ত আনন্দের গান। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাষায় বলা যায়, "কেবল মাত্র নদীর সঙ্গেই যে ভাটিয়ালি সম্পর্ক, তাহাই নহে — বিশাল প্রান্তরের দিগন্ত প্রসারিত বিস্তার, তাহার উপর দিয়া নিঃসঙ্গ অলস মন্থর গতি পথযাত্রা, প্রকৃতির মধ্যে উদাসী বিষন্ন বৈরাগ্যের রূপ — ইহারা ভাটিয়ালির প্রেরণা দান করিয়া থাকে। পূর্ববাংলার দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর বলিতে বিস্তৃত জলাভূমি বা হাওয়া বুঝায়। হাওর শব্দটি সাগর কথারই অপভ্রংশ। দিগন্ত বিস্তৃত হাওরের বুকের উপর দিয়া অলস মন্থর গতিতে ভাসমান নৌকার হাল ধরিয়া থাকিয়া যখন মাঝি দেহে এবং মনে একটু অবসরের সুযোগ পায়, তখনই ভাটিয়ালির সুর তাহার কণ্ঠে আপনা হইতে জাগিয়া উঠে। কিংবা হেমন্ত-শীতের বিষন্ন মধ্যাহ্নে হাওরের জলরাশি যখন শুষ্ক হইয়া গিয়া ইহার মধ্যে কেবল শূন্যতা হাহাকার করিতে থাকে, তখন কোন মহিষ কিংবা গো-রক্ষক যুবক কোন বৃক্ষচ্ছায়ায় যখন অবসর যাপন করিবার জন্য তাহার নিঃসঙ্গ তৃণশয্যায় আশ্রয় লয়, তখনই তাহার কণ্ঠে ভাটিয়ালির সুর জাগিয়া উঠে।"

এই ভাটিয়ালি গানের গুণাগুণ সম্পর্কে আরো কতকগুলি সুন্দর কথা বলেছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, "দেখা যায়, ভাটিয়ালির প্রকৃত অবকাশ একদিকে যেমন প্রকৃতির অন্তহীন বিস্তার, আর একদিক দিয়া তেমনই বিষন্ন নিঃসঙ্গতা। ইহা একক সঙ্গীত; ইহা বিশেষ অর্থে একক — এখানে গায়কের যেমন কোন সঙ্গী থাকে না, তেমনই গায়কের সম্মুখে কোন শ্রোতাও থাকে না; কাহারও মুখের দিকে তাকাইয়া, কাহারও রস ও রুচির উপর লক্ষ্য রাখিয়া এখানে গায়কের রসোৎসারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজন হয় না। এখানে গায়ক সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিজের নিতান্ত অন্তরের সঙ্গে তাহার একাত্মতার অনুভূতিতে তাহার কোন অন্তরায় নাই। কোন সংস্কার তাহার সহজাত অন্তরের অনুভূতিতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং ইহার মধ্য দিয়া গায়কের অন্তরটি যত স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পায়, অন্য কোন লোক সঙ্গীতের মধ্য দিয়া তাহা তত স্বচ্ছভাবে প্রকাশ পায় না। সেই জন্য ইহার প্রধান বিষয় প্রেম। তরুণ গায়কের কণ্ঠে তাহার ব্যক্তিগত প্রণয়-জীবনের আশা-নৈরাশ্যের সুর ইহার মধ্যে যেমন ধ্বনিত হইয়া থাকে, পরিণত-বয়স্ক গায়কের কণ্ঠেও তেমনই আধ্যাত্মিক আশা - নৈরাশ্যের সুর ধ্বনিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই গায়কের অন্তর মথিত করিয়া ইহার সুর উৎসারিত হয়। সেইজন্য লোক -সঙ্গীতের মধ্যে ইহাই 'সর্বাধিক আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ' হওয়ার জন্যই ভাটিয়ালি গানের জনপ্রিয়তা আজো এতটুকু কমেনি।

যেহেতু ভাটিয়ালি গানের মধ্যে প্রেম-ভাবের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়, সেহেতু এখানে কয়েকটি প্রেমমূলক ভাটিয়ালি গানের উল্লেখ করছি। যা বেশ রসপুষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী এবং একইসঙ্গে মনের সরল আবেগে টুইটুম্বুর —

১ একদিন দেইখাছি যারে, তারে তোলন না যায় গো।
সবাই বলে মেঘ মেঘ, নয় গো আভা,
তোমরা নি দেইখাছ সই, মেঘের আড়ে জবা গো।
একদিন দেইখাছি যারে তারে ভোলন না যায় গো।।
চরণে নূপুর বাজে, হাতে মোহন বাঁশী,
(অ) তার গলে শোভে বনমালা, মুখে মৃদু হাসি গো।
চূড়ায়ে ময়ূরের পাখা করে ঝিকিমিকি,
তারে মনে বলে প্রাণ সই, একবার দেখে আসি গো।।
একদিন দেইখাছি যারে, তারে ভোলন না যায় গো।
পীরিতি পীরিতি যতন, পীরিতি গলার হার গো,
এমন পীরিতি যে জন করে, সফল জনম তার গো।।
একদিন দেইখাছি যারে, তারে ভোলন না যায় গো।
আমার নয়ন নিল কালরূপে, মন নিল বাঁশী গো।
যারে শুইলে স্বপনে দেখি জাগিয়া না দেখি গো।।
একদিন দেইখাছি যারে, তারে ভোলন না যায় গো।।

২. মন না জেনে দিস্না নয়ন করি গো মানা।
নয়ন দিলে যাবে জন্মের মতন গো, আর ত তারে পাবি না
তোরা নয়ন দে গিয়ে তারে,
জান্তে পার্বি দুই দিন পরে, কেমন ঘটনা,
শেষে ঘরের বাহির হতে হবে গো, তবু তারে পাবি না।।
নেওয়ার বেলা কত সন্ধি
নিয়ে কর কপাট বন্ধি, -- কেমন ঘটনা;
ওর মত ভুলাইনে সন্ধি গো, জগতে কেউ জানে না।।
প্রেম করিলে প্রাণ সজনী,
আগে লও তা মরম জানি, নইলে হবে না;
না জানিয়ে প্রেম করিলে গো, শেষে হবে যন্ত্রণা।
রাধায় বলে প্রাণ সজনী,

সে যে মনোচোরার শিরোমণি, — ভাবে যায় জানা;
দেখ্‌তে ভাল, কথায় ভাল গো,
ও তায় স্বভাব কিন্তু ভাল না।।

৩. আমার মনের মানুষ, প্রাণ সই গো, পাই গো কোথা গেলে।
আমি যাব সেই দেশে যে দেশে মানুষ মিলে।।
যদি মনের মানুষ পেতেম,
তারে হৃদ-মাঝারে বসাইতেম, অতি যতন কইরে;
আমি মনসূতে মালা গেঁথে দিতেম তাহার গলে।।
ভেবেছিলাম মনে মনে,
সে যাবে না আমায় ছেড়ে, তারে আপন বইলে,
সে যে ফাঁকি দিয়ে গেল চলে,
এই কি ছিল মোর কপালে।।

৪. আমা দিয়ে হবে না নাগর, ঠিক ধরিয়ে বসেছি।
ভাব না জেনে ভাবে মজে, হুজুকেতে মজেছি।।
প্রেমের বাজার দেখতে ভাল
আমার ভাগ্য না হইল,
কত এল কত গেল, ব'সে ব'সে দেখ্‌তেছি।।
বড় কইরে ছিলাম আশা,
পূরাইব মনের আশা,
যেমন তাল গাছে বাবুইর বাসা, মেঘের জলে ভিজিতেছি।।
বামন হইয়ে চান ধরা,
আমার তেন্নি প্রেম করা,
মৃগী যেমন তৃষ্ণাতুরা মরুভূমে ঘুর্‌তেছি।

৫. অরে অ নাগর দেশে বরিষা রৈয়া যাওরে।
আইল বরিষা ছৈলানি বাইরে পেকচালা ভাঙ্গিয়া আইলা লাটুয়া গাবর রে।
আইল বরিষা কদম্বের মূলে, কদম্বের রেণু খাইয়ে ভোম্‌রায় গুঞ্জর রে।

আইল বরিষা খাবুর আর খুবুর করে, ঘরে রান্ধিয়া অন্ন কৈ খাইবা বইসা রে।

বরিষা ছয় মাস না যাইও দূরে কাটারি ফেলমু মুই নারী তোমারে রে।

মায় ত জিজ্ঞাসা করে অবলা গ ঝি, বৈদেশী নাগরের সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কি।

বৈদেশী না হয়, মা গ, মোর গলার হার, স্বদেশী কাটিয়া দিমু বৈদেশীর পায়।

পঞ্চগাভীর দুধ খায়, অ ননদিনী গ, কড়ার বল নাই তোর ভাইয়ের গায়।

হেলিয়া দুলিয়া পড়ে যেমন গৌড়ের সুন্ধি বেত, হায় গ রসের ননদিনী।

এই প্রেমের গানগুলিতে মূলত প্রেমের জন্য মনে-মনে আকাশকুসুম স্বপ্নের জাল বোনা থেকে প্রেমের জন্য শঙ্কা-ভয়, বিষাদ-বেদনা, আনন্দ ও মনের সহজ আকুতি ইত্যাদি মানবিক দিকগুলি ফুটে উঠেছে। ভাটিয়ালি গানে আবার কৃষ্ণপ্রেমও স্থান পেয়েছে। কৃষ্ণ ও রাধা দেবমহিমা নিয়ে আসেনি, এসেছে প্রধাণত লৌকিক চরিত্র হিসেবে। লৌকিক প্রেমের মধ্যে কৃষ্ণ ও রাধা চরিত্র এলেও কিন্তু গানের ভেতরে একটা নির্দিষ্ট পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। এ জন্যই ভাটিয়ালি গানে এটাকে একটা শ্রেণীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে বলা যেতে পারে। এই ধারাটি মূলত রাধাকৃষ্ণলীলা অনুসারী মাত্র। যেমন —

১. এই না কালরূপ আমার লাগিল নয়নে গো --

কলঙ্ক রইল্ জলে।

ভরা না দুইফরের কালে জল ভরিবার যাই,

জলের ছায়ায় কৃষ্ণরূপ গো --- যেমুন দেখিবারে পাই গো,

কলঙ্ক রইল্ জলে।

সব সখী লাল গো নিল গউর্ বরণ শাড়ি;

শ্রীরাধার পৈরনে শোভে গো কৃষ্ণনীলাম্বরী গো ---

কলঙ্ক রইল্ জলে।

২. দাদা, জিজ্ঞাসিয়ে দেখ চাই

কার রমণী কাল জলে যায়,

ধীরে ধীরে যায় গো রাধে হীরার কলসী কাঙ্খে,

মাঞ্জা চিকন হেইলে দুইলে যায়।

আগে পাছে পঞ্চদাসী, মধ্যে রাধা রাই রূপসী,

চন্দ্রবদন কেমন দেখা যায়।

৩. প্রাণের সুবল রে,—
আরে কার কামিনী জলে যায়।
সোনার নূপুর রাঙা পায়
রুনু ঝুনু বাদ্য শুনা যায়;
হাউল্‌কা মাজা পবনে হেলায়।
উল্টা খোঁপায় বান্ধা চুল,
খোঁপায় শোভে নানান জাতি ফুল,
ওরে মধুর লোভে ভ্রমর আসে যায়।
দুই সখী জলেতে যায়,
আরেক সখী হেইলা পড়ে গায়;
ওরে অনুভবে বুঝি রাধা যায়।

৪. জলে ঢেউ দিও না গো সখী –
আমি কাল রূপ -- ও রূপ নিরখি।
ওগো ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না।
(দিলে) তোমরা হবে পাতকী।
ঐ কদম-ডালে বইসে কৃষ্ণ
বাঁশী বাজায় বেইল ভাটি
ওগো বাঁশীর স্বরে পরাণ গো হবে,
ঘরে ফিরে যাব কি!

৫. আমি বিকাইলাম, গো রাই কমলিনী, রাধে তোমার চরণে।
ওগো তোমার প্রেমের খাতক হয়ে গো, আমি বেড়াই বনে বনে।
আপন হাতে কর্জপত্র
আমি লেইখে দিলেম মনের মত,
মহাজন বানাইলাম গো রাধা তোমারে।
ওগো তোমার প্রেমে ঋণী গো হয়ে
(ওগো, ও রাই কমলিনী)
আমি বেড়াই গহন কাননে।।

লেখে দিলাম দাসখত—
এই দেহ জনমের মত,
ধড়া চূড়া দিলাম গো, রাধে, তোমারে
আমি আর কিছু ধন চাই না গো রাধে
(ওগো ও রাই কমলিনী)
আমায় রেইখো রাঙ্গা চরণে।।

৬. ও প্রাণকৃষ্ণ বিনে,সখী, আমি মলেম প্রাণে,
ও কিসে ধৈরজিয়ে রব ঘরে গো।
কাইল ব'লে গিয়াছেন হরি, অক্রূরের রথে চড়ি গো
আইজ কাইল হইতে দুই দিন গণি
আমার ছেইড়ে গেছে মধুপুরী গো।
আমার অন্তিমকালে, তোরা সব সখী মিলে গো,
নিও ঐ যমুনার তীরে (প্রাণ থাকিতে থাকিতে)
কৃষ্ণ নামটি সুধাইও কর্ণমূলে;
ওগো তোমরা সবে বল, হরি হরি,
ওগো আমি প্রাণে মরি গো।

গানগুলিতে প্রেমের আবেগের সারল্য ও রচয়িতা শব্দ কৌশলের মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে শব্দের প্রতীকি ব্যঞ্জনায় —'হীরার কলসী কাঙ্খে', 'কলঙ্ক রইল জলে' ইত্যাদি। এরকম বহু ভাটিয়ালি গানে অবশ্য কৃষ্ণরাধা লৌকিক প্রেমের মধ্যে লৌকিক মানবী চরিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কৃষ্ণরাধা প্রেম সঙ্গীতগুলির মধ্যেও মানবীয় উৎকণ্ঠা, লজ্জা, শঙ্কা, আনন্দ-বেদনার সরল প্রেমানুভূতির উচ্ছ্বাস লক্ষণীয়, যা ভাটিয়ালি গানের মধ্যে এক বিশিষ্ট রূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

ভাটিয়ালি গানের এই প্রেম-গান বাংলা আধুনিক গানকেও পরবর্তীকালে সমৃদ্ধিশালী করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানে বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়। ভাটিয়ালি গানের আদ্যন্ত প্রেমবীণার ঝংকারে অমন সুর কবি রবীন্দ্রনাথকে সম্ভবত মহিত করেছিল। পূর্ব বাংলার নদী বক্ষে বহুকাল অতিবাহিত সময়ে ভাটিয়ালি গানের দরাজ সুরে মুগ্ধতায় সরল প্রেমে আকুতি ও উচ্ছ্বাস রবীন্দ্রনাথের কানেও সম্ভাবত পৌঁছেছিল বলা যেতে পারে। কবি রবীন্দ্রনাথ আদ্যন্ত প্রেমিক ছিলেন বলেই না তিনি 'প্রেম' কে ভাটিয়ালির মতন তাঁর কাব্য ভুবনে বিশেষ উপজীব্য

হিসেবে দেখেছেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন আমাদের এ-কথা—

তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে!

জানি না কি মরণ নাচে, নাচে গো ঐ চরণ মূলে!

এ উচ্চারণ কি ভাটিয়ালি গানের গায়কের মতোন নয়? প্রেমের জন্য আত্মসমর্পণ ভাটিয়ালি গানে যেমন তীব্র ভাবে লক্ষ্য করা যায়, তেমনি অবশ্য লক্ষ্য করা যায় বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের পদাবলী গীতে। আবার তেমনি লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের গানে।

আবার, বাংলা আধুনিক গানের রচয়িতারা কি সুন্দর কৌশলে ভাটিয়ালি গানের পংক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন আধুনিক বাংলা গানের ভেতরে তা-ও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে আধুনিক বাংলা গানে যখন শুনি আমরা এ-কথা —

'বউ কথা কও বলে পাখি আর ডাকিস না'— এ রকম উচ্চারণ।

এখানে একটি ভাটিয়ালি প্রেম-সঙ্গীতের তিনটি পংক্তির উদাহরণ রাখছি যা থেকে এ সত্যে সহজেই উপনীত হওয়া যেতে পারে। যেমন —

পাখি তোমার পায়ে ধরি মিনতি গো করি,

আর আমায় জ্বালাইও না—আমার মাথা খাও।

জ্বালাইও না — 'বউ কথা কও' বলে গো ডাইকো না।

ভাটিয়ালির বৈরাগ্যমূলক গানগুলি আবার যদিও অধ্যাত্ম বিষয়ক, তবে তাতে কিন্তু তত্ত্ব কথার কচ্‌কচানি নেই। কেবল রূপকের সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যা গানগুলিতে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। বাউল, মুর্শিদ্যা, মারফতি, গুরুবাদী, দেহ তত্ত্বমূলক ইত্যাদি গানই এর প্রধান অন্তর্ভুক্ত। এখানে কটি উদাহরণ রাখছি যেমন —

১. আমি আপিল করি, ও সাঁই,

শ্রীগুরুর আপিসে,

ভক্তি-প্রেমরসে।

ও সাঁইও, ছয়জন দুরাচার

হইয়া অতি জোরদার

নয়ন ধারা মতে দখল নিলে।

ভব-নদীর খরচ নাই

ওহে গুরু, চির-গোঁসাই

আমার দিকে দয়া নাহি কৈলে।

তব ধর্ম আদালত
সদা করি দণ্ডবৎ
(আমার) স্বত্ব গেল তামাদির দোষে।

২. মন পাগলারে, হরদম গুরুজির নাম লইয়ো।
(ওরে) দিবানিশি লইও নাম, কামাই নাহি দিয়ো।। (আমার মন)
ভাই বল,বন্ধু বলরে, সব সম্পদের সাথী,
অসময়ে নিদানকালে গুরুর নাম সারথী। (রে মন)
টাকা বল, কড়ি বলরে, সব পুরাণ হয়ে যায়,
আমার গুরুজির নাম সদা নুতন রয় (রে মন পাগ্‌লা)

৩. হিসেব করে দেখলি না মন এই বয়সে কি লাভ কৈলে।
ছিলাম যখন মাতৃকোলে,
গেলরে মন ধূলায় খেলে।
মায়া-রসে ডুবে রইলে কাল কাটালে অজ্ঞান ছলে।
আসল যখন সুখের যৌবন লাভ হবারই কথা রইলে;
কামরসে কামিনীর কোলে রঙ্গে রঙ্গে কাল কাটালে;
আসল যখন বিদ্ধাবস্থা সাধন ভজন সবই গেলে,
ভক্তিস্তুতি দূরে থাকুক উঠতে বসতে অক্ষম হইলে।
কত আশা করেছিলুম তিন কাল গেল বৃথা চ'লে,
কেবলমাত্র আছে ভরসা গফুর আমার দয়াল বলে।

৪. ওরে দয়াল, তোমায় ডাইকা সামাল না পাই কূল রে;
ওরে দয়াল, আমার কাণ্ডারী হইওরে।
ওরে তোমার নামের গুণেরে দয়াল,—
দয়াল আমার কাণ্ডারী হইওরে।
তোমার বালক রে দয়াল,
ডাইকা সানাল না পায় কূল রে;
তোমার নামের গুণে রে দয়াল ফিরিয়া ত লইও রে।
তোমার আসন, তোমার বসন রে দয়াল,

সানাল ফিরিয়া ত লইও রে।

ওরে দয়াল আমার কাণ্ডারী হইও রে।

আগে যদি জানতাম রে ভাই, মাঝির এতই চোট,

ওরে তবে কি রে দিতাম যা 'গা তেমাল্লার ওপর ---

আরে মাঝি বাইয়া যাও রে।

মাঝি বাইয়া যাও রে --- এলাহ্ দরিয়ার মাঝে।

আমার ভাঙ্গা নাও,

আরে মাঝি বাইয়া যাও রে।।

৫. ডুবল রে তোর মানবতরী ভবসাগরের পাকে প'ড়ে।

আরে এমন বান্ধব কেবা আছে, কে তুলিবে কেশে ধরে।

এসেছে মন ভবের বাজারে,

কুসুঙ্গাসুরায় (অসুরে) লাগুর পেইলে সব নিবে কেড়ে;

কি দোষ দিব বিধাতারে সকলই কপালে করে।

মানবতরীর মাল্লা ছয় জনা,

ছয় জনা ছয় দিকে টানে, কেউ ত শোনে না;

গুণ ছিঁড়িয়া সব পলাইল আমি একা রইলাম পড়ে।

ভবনদীর তুফান রে ভারি,

যে দিকে চাই সেই দিকে নাই কাণ্ডারী;

গুরু বিনে এই নিদানে কে নিবে আর ভব পারে!

ভাটিয়ালি গানে গৌরাঙ্গ-বন্দনাও লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু গৌরাঙ্গের সঙ্গে বৈরাগ্যের সম্পর্ক আছে বলে গৌরাঙ্গ-বন্দনা গানে ভাটিয়ালি সুর লক্ষ্য করা যায়। যেমন ---

ও গউর চাঁদ, তোরা দেখ, আইসে গো চাঁদ

নদে উদয় হইয়াছে।

চাঁদের মালা চাঁদ গাথনি কে গাঁইথা দিল

(সজনী লো এমন রূপ আর জনম তারে দেখি নাই গো)

হাতে চাঁদ, কপালে চাঁদ

চাঁদে চাঁদে আলয় কইরাছে।

লেগেছে এক চাঁদের বাজার তাকি জান না,

ওর তার পাদপদ্মে কোটি চাঁদ করে সাধনা,

ওগে ব্রহ্মার বাঞ্ছিত যে চাঁদ

চাঁদে চাঁদে মিশা গিয়াছে।

এখানে একটা কথা বলা বোধকরি উচিত হবে, বৈরাগ্য-সাধনায় মুক্তি লাভের বাসনা যদিও রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসিকতায় বদ্ধ মূল ধারণা হিসেবে কখনো চেপে বসেনি — তবে, ভাটিয়ালি গানের মতোন বৈরাগ্যের সুর কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়।

যদিও রবীন্দ্রনাথ নিজেও কয়েকটি ভাটিয়ালি গান রচনা করেছেন। তিনি জমিদারী দেখাশোনার তদারকি কাজে নিযুক্ত থাকার জন্য পাবনা ও রাজসাহী জেলার গ্রামে-গ্রামে প্রায়ই ভ্রমণ করতেন। বলা ভালো, প্রায়ই ভ্রমণ করতে হতো, তখন তিনি সেখানকার চাষী ও মাঝি-মাল্লাদের মুখে ভাটিয়ালি শুনে মুগ্ধ হয়ে কয়েকটি ভাটিয়ালি গান রচনা করেন। যদিও ভাটিয়ালির বিষয়বস্তুকে তিনি তাঁর গানে প্রাধান্য দেননি। তিনি ভাটিয়ালি সুরে প্রধাণত দেশাত্মবোধক ভাটিয়ালি গান রচনা করেছেন। বলা যায়, ভাটিয়ালি গানে তিনি এইভাবে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত একটি বিষয়কে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলে ভাটিয়ালি গানকে আরো জনপ্রিয়তার দিকে এককদম এগিয়ে দিয়েছেন। যেমন ---

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।।

ও মা, ফাল্গুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে, মরি হায়, হায় রে –

ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে, আমি, কি দেখেছি মধুর হাসি।।

উপরিউক্ত এই গানটি গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে' এই বাউল গানখানির সুরে রচিত। তবু, এই গানটিকে বলা যেতে পারে সুরের দিক থেকে ভাটিয়ালি ঢঙের বাউল। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রবীন্দ্রনাথের এই দেশাত্মবোধক ভাটিয়ালি সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান কথা বলেছেন তাঁর "বাংলার লোকসাহিত্য" গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে, "পল্লীর ভাটিয়ালির দীর্ঘায়িত চড়া স্বরের মধ্যে যেমন কোন মাত্রা নাই, গায়ক তাহার মেজাজ ও রুচি অনুযায়ী যত খুশী তাহা দীর্ঘায়িত ও চড়া করিতে পারে, রবীন্দ্রনাথের ভাটিয়ালিতে তাহা হইবার উপায় নাই -- কারণ, তাহা যত দীর্ঘায়িতই হোক, তাহা সুনির্দিষ্ট মাত্রা দ্বারা সীমায়িত; মাত্রার শাসন এখানে লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। পল্লীর ভাটিয়ালির অনিয়মিত বিস্তারিত স্বরকে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত করিয়া লইয়া ভাটিয়ালির স্বর সম্পর্কিত স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করিয়াছেন। পল্লীর ভাটিয়ালির

কথা অপেক্ষা স্বর প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাটিয়ালিতে তাহার অন্যান্য রচনার মত স্বর অপেক্ষা কথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।"

এখানে রবীন্দ্রনাথের আর একটি দেশাত্মবোধক ভাটিয়ালি গানের উদাহরণ রাখছি -

গ্রাম ছাড়া এই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে।

ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে লুটিয়ে যায় ধুলায় রে।।

ও যে আমায় ঘরের বাহির করে, পায়ে পায়ে পায়ে ধরে ---

ও যে কেড়ে আমার নিয়ে যায় রে, যায় রে কোন চুলোয় রে।

ও যে কোন বাঁকে কোন ধন দেখাবে, কোন খানে কি দায় ঠেকাবে --

কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে, ভেবেই না কুলায় রে।।

এই গানটির দিকে দৃকপাত করলে ডঃ আশুতোষবাবুর কথাগুলি যে বর্ণে-বর্ণে সত্য তা বোঝা যায়। সুরের ওঠানামার মধ্যে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই গানটি 'ভাটিয়ালি ঢঙে'র গান বলা যেতে পারে। যদিও পুরোপুরি ভাটিয়ালি গান বলতে আমরা যে গান বুঝি, সেরকম গান রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করতে পারেন নি। বরং এভাবে বলা ভালো, হয়তো তিনি সেভাবে নির্মাণ করতে চাননি। ভাটিয়ালি ঢঙটিকে নিয়ে তিনি সম্ভবত বাংলা গানের এক নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চেয়েছেন। কাজেই, রবীন্দ্রনাথের রচিত ভাটিয়ালি গান একান্তই 'রাবীন্দ্রিক ভাটিয়ালি' বলা যেতে পারে।

আবার ভাটিয়ালি গানের মধ্যে দেহতত্ত্বের ব্যাপার যেখানে এসেছে, সেখানে ভাটিয়ালি গানগুলি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। বিশেষ করে ভাবের গভীরতায় যেমন সুপরিপক্কতা লাভ করেছে, তেমনি প্রকাশভঙ্গিতে ততধিক পরিচ্ছন্ন ও নির্মল। এমনকি, বাংলার জনমানসে যে লোকায়ত দর্শনের অনুভূতির সার্থক প্রকাশ দেখা দিয়েছিল তা এই দেহতত্ত্বমূলক ভাটিয়ালিতে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। এখানে এরকম সার্থক একটি দেহতত্ত্বের ভাটিয়ালি গানের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি ---

আরে, মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে

আমি আর বাইতে পারলাম না।

আমি জনম ভইরা বাইলাম বৈঠা রে ---

তরী ভাইট্যায় বই আর উজায় না।

ওরে জঙ্গি রসি যতই কসি,

ওরে হাইলেতে জল মানে না!

নায়ের তরী খসা, গোড়া ভাঙ্গা রে ---

নায় ত গাব গয়নি মানে না।

এমনকি, রূপকথাও ভাটিয়ালি গানে সুন্দরভাবে ঠাঁই পেয়েছে। বিশেষ করে যেখানে রূপকথায় রয়েছে শাশ্বত প্রেমের কাহিনী। প্রেমই ভাটিয়ালির প্রধান উপজীব্য বিষয়বস্তু হওয়ার জন্যই সম্ভবত রূপকথার শাশ্বত প্রেম স্বাভাবিক কারণে ভাটিয়ালি গানে উঠে এসেছে বলা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত রাখতে এখানে মধুমালার কাহিনীর যে অংশ ভাটিয়ালি হয়ে উঠে এসেছে তা তুলে ধরছি —

আমি স্বপ্নে দেখি মধুমালার মুখ রে,
স্বপ্ন যদি মিথ্যা রে হইত,
গলার হার কি বদল হইত রে, লোকজন!
স্বপ্ন যদি মিথ্যা রে হইত,
অঙ্গুরি কি বদল হইত রে, লোকজন!
মদন কুমার যাত্রা করে,
মাস্তল ভ্যাঙ্গ্যা পানিত পড়ে রে, লোকজন।

এখানে লক্ষণীয়, প্রেমে নৈরাশ্য যেমন আছে, তেমনি আছে নৈরাশ্যের সমাপ্তিতে মিলন।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতে (বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড), "এই ভাবে বাংলার রূপকথায় যে সকল অংশ বিরহ ও বিচ্ছেদমূলক, তাহা অতি সহজেই ভাটিয়ালিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ভাটিয়ালি মূলতঃ মাঝি-মাল্লা ও রাখাল মহিষালের গান হইলেও কিংবা নদীমাতৃক দেশের সঙ্গে ইহার মৌলিক সম্পর্ক থাকিলেও, ইহা অন্তঃপুরের বর্ষীয়সী নারীর কণ্ঠেও গীত হইয়া সার্থক আবেদন সৃষ্টি করে, রূপকথার রহস্যময় পরিবেশকে ইহা আরও রসঘন করিয়া তোলে। সেখানে নদীও থাকে না, প্রান্তরও থাকে না; তবে ভাটিয়ালির আর একটি যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, অর্থাৎ অবসর, এমন নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে যে, সঙ্গীতের সুরে ও কাহিনীর বর্ণনায় মিলিয়া তাহা এক সহজ অখণ্ডতা সৃষ্টি হয়।"

যথার্থই বলেছেন আশুতোষবাবু। এরপরেই তিনি আরো কতকগুলি কথা বলেছেন তাও প্রণিধান যোগ্য। বিশেষ করে ভাটিয়ালির জাত বিচার প্রসঙ্গে। তিনি বলেছেন — "বাংলার লোক-সঙ্গীতের মধ্যে ভাটিয়ালি যে কেবল মাত্র প্রাচীনতমই তাহা নহে, ইহার মধ্য দিয়া সমগ্র বাংলার লোক-সঙ্গীতের মৌলিক গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেইজন্য এ'কথাও মনে হইতে পারে যে, বাংলার অধিকাংশ অনুরূপ ভাবমূলক লোক-সঙ্গীত ভাটিয়ালির ভিত্তির উপরই রচিত হইয়াছে। বাংলার কীর্তন এবং বাংলার টপ্‌পার সঙ্গে যে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাটিয়ালির আশ্চর্যজনক ঐক্য রহিয়াছে, তাহা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। এমনকি, এই সকল তথ্য হইতে এমনও মনে হইতে পারে যে, বাংলার লোক-সঙ্গীতের একাংশের ভিত্তিই ভাটিয়ালি, ইহার উপর আশ্রয় করিয়া বাংলার বহু আঞ্চলিক লোক-সঙ্গীত আনুপূর্বিক

রচিত হইয়াছে। পূব বাংলার বাউল, দেহতত্ত্ব, মুর্শীদ্যা, মারফতী প্রভৃতি তত্ত্বমূলক বহু সঙ্গীতই ভাটিয়ালির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অন্তরের সুগভীর ভাব ও সূক্ষ্মতম অনুভূতি প্রকাশ করিবার ভাটিয়ালির যে শক্তি, তাহা বাংলার আর কোন লোক-সঙ্গীতের নাই। সেই জন্য জীবনদর্শনের সুগভীর বিষয় সমূহ অতি সহজেই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। বাংলার আর কোন লোক-সঙ্গীতের এই গুণ নাই।"

কাজেই, আমরা অনায়াসে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথাগুলি মেনে নিয়ে লোকসঙ্গীতের আসনে ভাটিয়ালিকে সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী বলে অভিহিত করতে পারি। আর একটা কথা না বললে নয় --- আমার মনে হয় ভাটিয়ালি গানের জনপ্রিয়তার মূল কারণ হলো এই গান বর্ণাত্মক না হয়ে কেবল ভাবাত্মক বলে। এ কারণে সংক্ষিপ্ত হয় গানের আকার। এবং পংক্তিবিন্যাসে সদা-সর্বদা স্বচ্ছ থাকে। কথাতেও সাবলীল। যা সহজেই হৃদয়গ্রাহী। স্বরের তুলনায় কথার অংশ অপ্রধান বলে বর্ণনার যেটুকু বাহুল্য থাকে তা কখনো গীতের মধ্যে ভার হয়ে ওঠে না। কারণ, একটিমাত্র চড়া সুরের দীর্ঘায়িত উচ্চারণ গানের কথাও ভাষাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে। বলা যায়, ভাটিয়ালি গানের শিল্পের এটাই একটা উৎকর্ষের প্রধান দিক। এখানে একটি উদাহরণ রাখছি ---

কৃষ্ণহারা হইলাম গো,
কৃষ্ণহারা হইয়া কান্দ্ছি গো বনে নিশিদিনে।
ওগো আমার মত দীন দুঃখিনী
কে আছে আর বৃন্দাবনে।
সখি গো, যার যে জ্বালা সেই জানে,
অন্যে কি আর জানে,
আমার অরণ্যে রোদন করা
কার কাছে কই, কেবা শোনে।
সখি গো, নয়ন দিলাম রূপ নেহারে
প্রাণ দিলাম তার সনে,
ওগো, দেহ দিলাম, অঙ্গের বসন
মন দিলাম তার শ্রীচরণে।
সখি গো, কৃষ্ণ শূন্য দেহ গো আমার
কাজ কি এ'জীবনে,
অধীন কালাচাঁদ কয় রাই মরিল
রাই মরিল শ্যাম বিহনে।

এই গানটিতে লক্ষণীয় বিষয়টি হলো, প্রথম পদটির মধ্য দিয়ে গানের স্বর ও ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পাচ্ছে। পরবর্তী পদগুলির মধ্যে কেবল ব্যাখ্যা ও পুণরুক্তি মাত্র প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই গানটি কখনোই বর্ণাত্মক হয়ে ওঠেনি, কেবল ভাবাত্মকই বলা যেতে পারে।

অবশ্য ভাটিয়ালি সব গানেই সাধারণত প্রথম পদটিই একসঙ্গে গীত হবার পর এই গানের সর্বশেষ স্বরটি দীর্ঘায়িত হয়ে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

আবার, 'ভাটিয়ালি' শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে অবশ্য বিচার-বিশ্লেষণ করতে বসলে অনেক কথাই বলা যায়। এ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত আছে। তবে, সাধারণের বিশ্বাস হলো -- ভাটি অঞ্চলের সঙ্গীত বলেই এর নাম ভাটিয়ালি। বাংলাদেশের নিম্নভূমি অর্থাৎ সাধারণত যে সকল অঞ্চল বর্ষায় জলমগ্ন হয়ে যায় তাই ভাটি বলে পরিচিত। কাজেই এই অর্থে পূর্ববঙ্গের কথাই আমাদের মনে আসে। বিশেষ করে ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ঢাকা। ভাটিয়ালি গান অবশ্য এইসব অঞ্চলেরই জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত। এ ছাড়াও যে পূর্ববঙ্গে এসব অঞ্চলের চারপাশে ভাটিয়ালি গান বিস্তারলাভ করেছে তা-ও লক্ষ্য করা যায়। ভাটি বলতে অবশ্য খুলনা, বরিশালের দক্ষিণ অংশকেও বুঝায়। আবার, সুন্দরবন অঞ্চলের অরণ্যবেষ্ঠিত নিম্নভূমিও ভাটিয়ালি বলে পরিচিত। সুন্দরবন অঞ্চলের লৌকিক দেবতা দক্ষিণ রায় ভাটীশ্বর বা আঠার ভাটির অধিপতি বলা হয়ে থাকে। তবে, সে অঞ্চলের যে লোকসঙ্গীতের প্রচলন আছে তা ভাটিয়ালি নয়। বলা যায়, এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য লোকসঙ্গীত হলো গাজীর গান। কাজেই, সব দিক বিবেচনা করে পূর্ববঙ্গের প্রচলিত বিশেষ প্রকৃতির লোকসঙ্গীতই ভাটিয়ালি বলে চিহ্নিত করতে তাই এতটুকু কুণ্ঠা বোধ হয় না। সাধারণত পূর্ববঙ্গের মাঝিরা নদীর ভাটিতে নৌকা ছেড়ে দিয়ে অলসভাবে বৈঠাটি ধরে স্থির হয়ে বসে এ গান গেয়ে থাকেন। এ কারণে এই গান ভাটিয়ালি গান বলে পরিচিত।

সংক্ষিপ্ত আকারে ভাটিয়ালি গান ভাষাগত বুননের দিক থেকে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে তার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায় ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহ করা কটি গানে। এখানে সুনীতিবাবুর সংগৃহীত গান থেকে কটি গান দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরার আগে ক'টি কথা বলে রাখি, গানগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ময়মনসিংহ, ঢাকা ও ফরীদপুরের কতকগুলি লোক যখন জাহাজে বসে গাইছিল, তখন তিনি তা শুনে লিখে নেন। এখানে তিনটি গান দৃষ্টান্তস্বরূপ রাখছি --- ভাবের গভীরতায় ও ভাষার নিপুণ বুননে যা অতুলনীয় -

১. মনের মানুষ পাইবার আশে
ঘুইর‍্যা ফিরি দেশ বিদেশে।
কতো মানুষ আইল গেল,
মনের মানুষ না মিলে।
মনের মানুষ কে, তারে পাই কই গেলে,

মনের মানুষ গত্তর-মণি, দর্শনেতে নেয় গো প্রাণী!
কাইন্দ্যা ফিরি পাগলিনী, বুক ভাসে চইক্ষের জলে।।

২. আমি কার কাছে কইব মনোদুঃখের বেদনা।
পুরান বাকসের তালা নতুন চাবি ঘুরেনা।
মনে মন মিশাইয়া গো বন্ধুর মন আর পাইলাম না।
ফুল-তলাতে চাষী লইয়্যা প্রাণবন্ধু যায় গো চইল্যা,
এখন তালা খুইল্‌বার পারিনা।
ও তালা খুইল্‌বার আশে বইস্যা রইলাম গো সখি।।

৩. মনের মানুষ না হইলে মনে কথা কইও না।
কথা কইও না, কথার প্যাঁচে থাইকো না।
পুরুষেরি এম্‌নি ধারা, চোরের নায়ে সাউধের পারা —
দেখ্‌তে দেখি সাউধের মত কাজে দেখি না।
আপনার তালে তাল না পাইলে রঙ্গে নাইচো না।
মাকাল-গোটা দেখতে ভালো, উপরে লাল ভিতরে কালো,
শিমুল ফুলে ভমর বসে না।
চাম্পা ফুলে ঝাম্প দিও না;
প্রাণ সুজনী গো
মনের মানুষ না হইলে মনের কথা কইও না।

প্রবাসী ১৩২৪-এর বৈশাখ সংখ্যায় ক্ষিতিমোহন সেন 'হারমণি' নামে অজ্ঞাত কবির যে গানটি সংকলিত করেছেন, সেই গানটি ভাবের দিক থেকে ভাটিয়ালি বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। গানটির রচনাশৈলীর উৎকৃষ্টতা বেশ নজর কাড়ে। বন্ধনীযুক্ত বহু পংক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়। এই রীতিটি গানটিকে ভাবের দিক থেকে যেমন গভীরতা দিয়েছে, তেমনি টেকনিক গত দিকে উৎকৃষ্টও বলা যেতে পারে। এইরূপ বন্ধনীযুক্ত পংক্তি সম্বলিত গানটিকে সহসা একটি আধুনিক কবিতা বলে মনে হয়। যেমন ----

পরাণ আমার সোতের দীয়া।
(আমায় ভাসাইলে কোন্ ঘাটে)
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার, আন্ধার নিশুইত ঢালা,

আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা (গো)।
তারার তলে কেবল চলে নিশুইত রাইতের ধারা
(তারার তলে চলে চলে নিশুইত রাইতের ধারা)
সাথের সাথী চলে বাতি নাই গো কূল কিনারা (গো)
দিবারাতি চলে গো বাতি জ্বলে সাথে সাথে (গো)।
অচিন ফুলে নদীর কূলে ডাকে গো কারা
(টানে গো পরাণ)
(কূলে ভিড়া, ক্ষেণেক জিরা, সোতেরে ছাড়া)
অকূল পাড়ি থামতে নাড়ি, আর চলে যে ধারা
(আর চলি বে-ঠিকান)।
অকূলের কূল গো, দইরার সাগর গো,
আয় কয় বা কে, কেমন ডাকে পাইমু গো লাগর (গো)।
তোমার কোলে লইবা তুইলে, জুড়াইমু গিয়া
(তোমার বুকে নিঝুম সুখে, জুড়াইমু গিয়া)

এমনকি, সংসার যুদ্ধে বিপর্যস্ত মানুষের অসহায়তাও ভাটিয়ালি গানে উঠে এসেছে। এখানে 'প্রতিভা' পত্রিকায় ১৩১৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিতের ছয়টি ভাটিয়ালি গানের মধ্য থেকে এরূপ একটি গান তুলে ধরছি। গানটিতে বিপর্যস্ত মানুষের অসহায়তার মর্মস্পর্শী ভাব লক্ষ্য করার মতোন, যা মনকে স্পর্শ করে ---

আরে মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে --
আমি আর বাইতে পারলাম না।
আমি জনম ভইরা বাইলাম বইঠা রে
তরী ভাইটায় সয় আর উজায় না।
ওরে জাঙ্গী রমী যতই কসি,
ওরে হাইলেতে জল মানে না,
নায়ের তলী খসা, গুরা ভাঙ্গা রে,
নায় ত গাব গয়কি মানে না।

গণ আন্দোলনের ঢেউও ভাটিয়ালি গানে পরবর্তীকালে আছড়ে পড়ে। এখানে এরকম একটি গান তুলে ধরছি --

ফিরাইয়া দে, দে, দে মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে --

মালাবারের কৃষকসন্তান

তারা কৃষকসভার ছিল প্রাণ

অমর হইয়া রহিবে দেশের দশের অন্তরে।।

কৃষকসভার রাখতে ইজ্জতমান

তারা ফাঁসীকাষ্ঠে দিল প্রাণ

ফিরিয়া পাবনা রে মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে।।...

লোকসঙ্গীতের মধ্যে ভাটিয়ালি গান বাউল গানের মতনই সমানে জনপ্রিয় থেকে ক্রমশ জনপ্রিয়তার দিকে এগিয়ে চলেছে। এযুগের আধুনিককালের সুশিক্ষিত মানুষজনেরা বাউল গানের মতন ভাটিয়ালি গানকে মর্যাদা দিয়েছেন। দেশভাগের পর অবশ্য এ বঙ্গে ভাটিয়ালি গানের প্রচার বেড়েছে। কলকাতার দূরদর্শন ও বেতারে প্রায়ই ভাটিয়াল গান প্রচার করা হয়। প্রয়াত আবাসউদ্দীন অহমেদ থেকে শচীনদেব বর্মন, নির্মলেন্দু চৌধুরী ও অমর পাল প্রমুখ গায়কেরা ভাটিয়ালি গান শিক্ষিত জনমানসের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। মোদ্দাকথা হলো, ভাটিয়ালি গান হলো লোকসঙ্গীতের যেমন একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তেমনি বাংলাদেশের এক অমূল্য সম্পদ। ভাটিয়ালি গানের মধ্যে রয়েছে আমাদের বাঙালীর জাতীয় জীবনের অনেক কথা ও ভাবধারা। আধুনিক কবিদের মধ্যে আবার কেউ কেউ দেখি ভাটিয়ালির কথাও কবিতার মধ্যে তুলে ধরে আধুনিক কবিতাকে একটা নতুন ডাইমেনশন্ দিতে চাইছে। চাইছে বাংলা কবিতাকে আরো অনেক মানুষের হৃদয়ের কাছে, মনের কাছে নিয়ে যেতে।

তরজা গান

বহু প্রচীন কাল থেকেই বাংলার লোকসঙ্গীতের একটি বিশেষ রূপ হিসেবে তরজা গানের প্রচলন আছে। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' তরজা উল্লেখ থেকেই আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তরজা গানের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে। চরিতামৃতে আছে —

তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা,
তাঁর যেই আজ্ঞা করি মৌন করিলা।

কাজেই, এ থেকে আমাদের বুঝতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ হয় না তরজা গানের প্রচলন যে চৈতন্যযুগেও ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে থেকেই ঢোল কাসি নিয়ে ছড়া কেটে কেটে গান করার রীতি ছিল, ছড়াগুলি সাধারণত শৈব সন্ন্যাসীরা ধর্মঠাকুর ও শিবের গাজন উপলক্ষ্যে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে গেয়ে বেড়াতেন। এই ছড়া কেটে কেটে গান গাওয়ারই নাম হলো 'আর্যা' বা 'তরজা'।

'তরজা' শব্দটি সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড"-এ বলেছেন, "তর্জা শব্দটির মূলে আছে আরবী শব্দ ত্বরজ, যার অর্থ হল 'কাঠামো', রীতি বা ধরণ।"

তরজা গান সম্পর্কে কবি জসিমুদ্দিন আবার বলেছেন, "বিচার ও তরজা গান" শীর্ষক আলোচনায়, "তর্জাগান ছড়াসর্বস্ব। দলপতি ছড়া কেটে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করে। দুইজন দোহার মাঝে মাঝে ধুয়া গান গাহিয়া দলপতিকে বিরাম দেয়। বিচার গানের মত এই গানেরও উদ্দেশ্য তত্ত্বকথা প্রচার করা। সেইসঙ্গে মুসলমানদের নবী কাহিনী আর হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী এসে পড়ে।"

জনাব আসকার ইবনে শাইখ আবার "তরজা গান" শীর্ষক আলোচনাতে তরজা গানের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে তরজা গানের প্রতিষ্ঠাতা হলেন -- "কবিওয়ালা হোসেন খাঁ। মতি পসারী তার তরজা গানের প্রতিদ্বন্দ্বী। অর্থাৎ বলা চলে মতি পসারীর সাহায্যে প্রথম হোসেন খাঁ দেশে তরজা গানের রীতি প্রবর্তন করেন এবং দেশে তা চালুও করেন। আর হাফ আখড়াই গানের রীতি প্রতিষ্ঠা করেন মোহন চাঁদ বসু। তরজা এবং হাফ আখড়াই উভয় গানই কবি গানের পরিবর্তিত রূপ মাত্র।"

গানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলো, "তরজায় মুসলমানদের নবী-রসুল এবং অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে সাধারণতঃ সীমিত অর্থাৎ বিশেষ করে মুসলমান জনসাধারণের প্রয়োজনেই যে তরজা গানের সৃষ্টি হয়েছিল তা লক্ষ্য করা যায়।"

বিভিন্ন সুধীজনের তরজা সম্পর্কে যতই বাগ-বিতণ্ডা থাকুক না কেন — বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে তরজা শব্দটি ছড়া অর্থেই ব্যবহৃত হয় এবং এককালের হেঁয়ালী বা

প্রহেলিকাময় আর্যাই পরবর্তীকালে 'তরজা' বা 'তর্জায়' রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে এ গান মুসলিম ঐতিহ্যেরও বাহন হয়ে ওঠে। কিন্তু চরিত্রগত ধারা হিসেবে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ধর্মীয়তাই এই তরজা গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তবে, মূলত অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কবিগানের মধ্যে তরজা গান প্রেরণা লাভ করার ফলে এটিকে দুদলের প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়া গান বোঝায়। বর্তমানে অবশ্য তরজা গান একটি পৃথক স্বতন্ত্র রূপ পেয়েছে। এবং এ রূপ পেয়েছে প্রধাণত কবিওয়ালাদের দল থেকে পৃথক হওয়ার জন্যে। তরজা গানে একজন ছড়াকার ছড়ার ভেতর দিয়ে প্রশ্ন করে। সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তার প্রতিপক্ষ তৎক্ষণাৎ একটি 'চাপান' বা নতুন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। নানা পৌরাণিক কাহিনীর লৌকিক ব্যাখ্যা অবলম্বনে বেশ রসপুষ্ট হয়ে গড়ে ওঠে এই তরজা গান। তরজা গানের বৈশিষ্ট্যগুলি এরকম ঃ

(ক) তরজা গানের আগে বন্দনা গান গাওয়া হয় মূলত বিভিন্ন দেবদেবীকে উদ্দেশ্য করে।

(খ) তরজা গানে প্রশ্ন উপস্থাপিত করা হয়। যাকে বলা হয় 'চাপান'। প্রশ্নটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হেঁয়ালীমূলক হয়। তবে তা সাধারণত পৌরাণিক ও অনেকক্ষেত্রে তা লৌকিক ব্যাখ্যার দ্বারা পরিমার্জিত।

(গ) চাপান-এর উতোর অর্থাৎ প্রশ্নের পর উত্তর দেওয়া হয়। এই 'চাপান-উতোর'-এর মধ্যে বাদ-প্রতিবাদের ভঙ্গি থাকে। খানিকটা তর্কযুদ্ধের মতন আর কি! একে তরজা লড়াই বলা হয়ে থাকে।

এখানে একটি উদাহরণ রাখছি। যেমন —

প্রথম ব্যক্তির শুরুতে তরজার বন্দনা গান ঃ

যদি দেব নিরঞ্জনে যার বদে সর্বজনে
এ ভুবনে যায় অপার
আর ইন্দ্র সভা চন্দ্র সভা মনোহর মনোলোভা
প্রভা যার বিশ্বের মাঝপর।।...

চাপান ঃ

এই বারেতে তর্জাগান আরম্ভ যে হবে।
দশজনে সভাস্থলে বসে শুনতে পাবে।।
... ...
আমার হেথা যাবার কথা বেশী কিছু নাই।
পাল্লাদারের ঘাড়ে কিছু চাপান দিয়ে যাই।।
চাপান করে, চাপান কেটে চাপান দিতে হবে।

তরজা গানের তরজা মা আজ এইখানেতে হবে।।
শিবের নাম ত্রিপুরারী কেমন করে হলো।
ঠিক যথার্থ করে অর্থ আজকে হেথায় বলো।।
আরও একটি নাম শিবের গঙ্গাধর যে হয়।
এ নামের কি কারণ --- বসন ভূষণ ত্যাজি মহাশয়।।

দ্বিতীয় ব্যক্তির বন্দনা ঃ

কোথায় মাগো শ্বেতবরণী বাগ্‌বাদিনী বীণাপানী।
আজি তব চরণ হাণি করে, মাগো মার।
নেমেছি তরজার আসরে, ডাকি, মা, আয় বারে বারে,
মম কণ্ঠে বিরাজ হও, মাগো করিতে উদ্ধার।।

উতোর ঃ

গোল করেন বাবুমশাই করি গো বিনয়।
তরজা গানের শুরু এবার আস্তে আস্তে হয়।।
পাল্লাদার আমার উপর চাপান দিয়ে গেছে।
ত্রিপুরারী নাম শিবের কেমনে হয়েছে।।
গুরুর জোরে ডঙ্কা মোর সংক্ষেপে জানাই।
নামের কিবা তাৎপর্য শুনুন মহাশয়।।
ত্রিপুরাসুর নামে অসুর মহা ভয়ঙ্কর।
তার ভয়ে দেবগণ শঙ্কিত কলেবর।।
মহাবাণ ছাড়িলেন দেব ভোলানাথ।
তিনপুর ভেদিয়া করিলেন নিপাত।।
ত্রিপুরারী নাম শিবের এই ভাবেতে হয়,
গঙ্গাধর নামের এবার দেব পরিচয়।।

তরজা গানের এই যে প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গি বা রীতিটি পরবর্তীকালে আধুনিক যুগের নাট্যসাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে দেখা যায়। মনমোহন বসুর "সতী" নাটকে ছড়া ও প্রশ্নোত্তরমূলক সংলাপের ব্যবহার লক্ষণীয় —

সকলে — ও ঠাকুর -- নমস্কার।
—নমস্কার কর তাঁরে
যে আছে এই হৃদ মাঝারে।

সভা — তোমার হাতে কি ঠাকুর?

—রঞ্জি গঞ্জিকা ইনি;
হাতে স্বর্গ দান যিনি।

সভা — -তোমার গুরু ঠাকুরটি এখন কোথায়?
ভাবে ঘোরে ভবঘুরে
এখন তিনি দক্ষ পুরে।

সভা— ও ঠাকুর . . . . . . করে।
—গাছ তলাতে একদিন বসে
গাছগুলি কসে কসে,
নারদ ঠাকুর চলে যান
বল্লেম ঠাকুর দাঁড়ান দাঁড়ান।

. . . . . .

দয়াল ঠাকুর দয়া করে;
আমি এলাম কাছে সরে।
আমি বল্লাম মাথা খাও,
কোথা যাবে বলে যাও
তিনি বল্লেন —, 'গোলকধামে'
দেখতে যাব রাধা শ্যামে।
আমি বল্লাম 'ভাল হ'লো।'
এই বেটাকে এইটি বলে —
ভজন পূজন সাধন বিনা
আমার গাঁজা ভিজবে কিনা।

. . . . . .

নারদ বল্লেন, 'নারদ আমি,
গোলক যেথে পথ ভুলেছি
উই ঢিবিতে তাই পড়েছি।'
যোগী বলে — ভাগ্য ভালো
এই কথা ঠাকুরকে বলো,
তার তপস্যা চরণ ধ্যানে,
দশহাজার শীত কাটলো বনে,
উই পোকাতে খেলে ছাল,

জপে মাথা কত কাল?।।
বলবো বলে গেলেন গোঁসাই
আমি গেলেম্ আমার ঠাঁই।

তরজার চাপান উতোরের মধ্যে যে নাটকীয়তা ও তাৎক্ষণিক উত্তরের কৌশল বর্ত্তমান ছিল তা পরবর্তীকালে অমৃতলাল বসু, গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও দীনবন্ধু মিত্রর প্রমুখ নাট্যকারদের নাটকেও সংলাপ সৃষ্টির মধ্যে এসেছে। এখানে দুটি উদাহরণ রাখছি। যেমন ---

১. গিরীশচন্দ্রের "হারানিধি" নাটকে ---

প্রশ্ন — নবদাদার তুই?

উত্তর — খুঁড়ির ভেয়ের ছেলে।

প্রশ্ন — কেমন আদরে আছিস?

উত্তর -- আহ্লাদের পুতের এমন হয় না।

প্রশ্ন —দাদার কখনও কিছু করেছিস?

উত্তর -- ভাত মেরেছি, কাপড় ছিঁড়েছি, আর বৈঠকখানা জোড়া করে বসে আছি।

২. অমৃতলাল বসুর "যাদুকরী" নাটকে ---

দৈ — দেখলি ব্যাটা দেখি?

তিন — হ্যাঁ, টেনে দিচ্ছি শিকলী।

দৈ -- সে কিরে শালা?

তিন -- এই আঁটলুম তালা।

দৈ -- পায়ে পড়ি তোর দেরে খুলে?

তিন -- আর কি ভবী কথায় ভোলে।

তরজা গানের মধ্যে যে সংলাপ ছড়ার রীতিটি লক্ষ্য করা যায় আধুনিক বাংলাকাব্যেও বেশ সূক্ষ্মভাবে ঢুকে পড়েছে। বিশেষ করে রমেন্দ্রকুমার আচার্য্যচৌধুরীর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। এ রীতি ও ভঙ্গির সুষমা "ব্রহ্ম ও পুঁতির মউরি" কাব্যগ্রন্থে 'ধৃত ময়নাপাখির সঙ্গে মানুষদের ভয়ংকর গল্প' কবিতাটিতে। যেমন ---

প্রথম মানুষ -- পাহাড় থেকে পেড়ে এনে খাঁচায় তোকে পুরে,
রেখে দিয়েছি, পোষ মানাতে, আমার বন্ধু রে!

দ্বিতীয় মানুষ -- ঘর দিলাম, শালীনতার প্রশ্ন হয় না কি?
সুরক্ষিত সৈন্য পুষি, ডাইনে-বাঁয়ে রাখি।।

তৃতীয় মানুষ -- কণ্ঠখানি মিষ্টি বটে, সুরী কি অসুরী।

আমায় গুণগান করবি, সেই ভয়েই মরি।।

চতুর্থ মানুষ— একটি পালক বসিয়ে নিতে (চকাস্ চোখ লোভে!),

চেঁচিয়ে পাড়া মাত করিস ত্রাহি ত্রাহি রবে।।

তৃতীয় মানুষ — চমৎকার ছব্বাখানা বসে আছিস রঙে।

যেন কোনো দুঃখই নেই, রাগিয়ে দিস ঢঙে।

পঞ্চম মানুষ — আমরা যদি এক্ষুনি পেরেক দিয়ে ঠুকে,

তীক্ষ্ম ক্রুশে আটকে রাখি, চিহ্ন দেগে বুকে!

চতুর্থ মানুষ — রক্তে ছুপাই তখনো কি গাইবি কৃষ্ণনাম?

ছিটিয়ে দেবো মুখে থুতু, থাকবে সম্মান!

সংলাপ ছড়ার রীতি-প্রকরণ যে তরজা গানের মধ্যে রয়েছে তা আধুনিক বাংলা কবিতার নির্মাণের মধ্যেও ঢুকে পড়েছে বেশ সূক্ষ্মভাবেই, বলা যায় কিছুটা পরিশীলিত হয়ে। এরকম অনেক উদাহরণই রাখা যেতে পারে। সংলাপ ছড়ার মধ্যে যে নাটকীয়তা বা নাট্যরস লক্ষ্য করা যায় তরজা গানে, তা-ও আধুনিক বাংলা কবিতায় ঢুকে পড়েছে দেখা যায়।

তরজা গানকে প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘের শিল্পীরাও দেখি তাঁদের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন। বিরোধী পক্ষকে ঘায়েল করতে তরজার আসরে শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশ্যে গাওয়া হয় এ গানটি—

হায়রে হায় মান বাঁচালেন কি করি উপায়।

ঘুরে ফিরে পড়েছি এক জোচ্চোরের পাল্লায়।।

পুষলে পরে কাকের ছানা

কা' ছাড়া কেষ্ট বলে না

যতই বুলি শিখাও না ভাই তায়

ছুঁচোর গায়ের গন্ধ কি আর গোলাপ জলে যায়।।

তরজার তীক্ষ্ন ব্যঙ্গবিদ্রূপে শ্লেষে, উপমা ও উৎপ্রেক্ষায় শোষক, শাসক ও তাদের অনুচরদের ঘায়েল করতে রমেশ শীলের চেয়েও তীক্ষ্নধী ছিলেন গুরুদাস পাল। গুরুদাস পালকেই এ কারণে বলা যেতে পারে অদ্বিতীয় গণশিল্পী।

বলতে কুণ্ঠা নেই, তরজা গান নিজ শিল্পগুণে সহজে শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে বলে আজো তরজা গানের কদর আছে। আজো শহর ও গ্রামবাংলায় তরজা গানের আসর অনুষ্ঠিত হয়।

বোলান গান

'বোলান' শব্দটি খুব প্রাচীন। প্রাচীন বাংলা কাব্যে এই গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেনের মতে — "শিবের গাজন উৎসবে মূল সন্ন্যাসী গাঁয়ের পথে পথে ঘুরিয়া যে তর্জা ছড়া বলিত তার বিশিষ্ট নাম বোলা। ভ্রমণ অর্থে-বুলা ধাতু হইতে।"

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর 'বাংলা লোকসাহিত্য" গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে বোলান গান সম্পর্কে বলেছেন, 'চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উপলক্ষে যাহারা সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যা হইয়া থাকে, তাহারা গ্রামের পথে পথে ঘুরিয়া অনেক সময় তর্জার মত ছড়া বলিত এবং নানা পৌরাণিক বিষয় লইয়া গান রচনা করিয়া গাহিত, তাহাকেই সাধারণতঃ বোলান গান বলে।"

প্রাবন্ধিক সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর " লোকনাট্য বোলান"শীর্ষক একটি নিবন্ধে (লোকশ্রুতি, ষষ্ঠ সংখ্যা চৈত্র ১৩৯৬) এই বোলান সম্পর্কে সুন্দরভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিবন্ধটির শুরুতে। যা প্রণিধানযোগ। তিনি বলেছেন, "অন্তিম চৈত্রের ফাল্গুনী আসর পশ্চিমবাংলার বিশেষ কয়েকটি সংলগ্ন ভূখণ্ডে যে বিশেষ গীতরূপের ভঙ্গীতে রূপ নেয় তার চলতি নাম বুলাম বা বোলান গান। বিশেষ করে উত্তর ও পূর্বরাঢ়ের কয়েকটি অঞ্চল চৈত্র মাসের শেষ কটা দিন বোলান গান ও নাচে উত্তাল হয়ে ওঠে। এই অঞ্চলগুলি প্রধানত হল বর্ধমানের কাটোয়া - কেতুগ্রাম - দেবগ্রাম - পাগলাচণ্ডী - সাহেবনগর ও বীরভূমের কিছু অংশ। অর্থাৎ চারটি জেলার সীমান্ত অঞ্চলের পরস্পর সংলগ্ন বেশ কয়েকটি গ্রাম অংশ নেয় এই লোক উৎসবে। বোলান গান সাংবাৎসরিক গাজন উৎসবে অনুষঙ্গী অনুষ্ঠান। গ্রাম বাংলার সহজিয়া মানসে শিবঠাকুর, ধর্মঠাকুর ও বুদ্ধ একত্র হয়ে এক মিশ্র দেবতার রূপ নিয়েছে বহুদিন ধরে। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বুদ্ধপূর্ণিমা পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলের লোক উৎসবগুলির নিগূঢ় সমীক্ষায় এই সত্য ধরা পড়ে। তাই গাজন ও বোলান তারই সাংস্কৃতিক স্ফূরণ। সেই জন্যই বোলান গান সারাবছর অনুষ্ঠিত হয় না। লোকগীত বা লোকনাট্যের অনেকগুলি শাখার মতো বোলান নির্বিশেষ নয়। এ গান নিতান্ত উপলক্ষিক, ঋতুকেন্দ্রিক ও সাময়িক। পুরো চৈত্রমাস ধরে এইসব অঞ্চলে অঞ্চলে শৈব আবহ তৈরী হয়। নীল পূজো, গাজন ও চড়ক এই তিন ধর্মীয় কৃত্যের পূর্বালাপ হিসেবে উপবাস, 'বত্' করা ও নিরামিষ ভোজনের সংযমে 'ভক্তা'র দল ও সাধারণ মানুষ মেতে ওঠে কৃষিদেবতা ও শিবের ভজনে। এই উপলক্ষে লোকায়ত জীবনের সহজ বিনোদনের ছাঁচে ঢালাই করে 'বোলান' গান ও বোলান যাত্রা বানানো হয়। অর্থাৎ শুধু গান নয়, যাত্রাও। কাহিনীধর্মী, অভিনয়িক, গীতময় ও নৃত্যছন্দে চপল। বোলান গান রূপায়ণের প্রাকৃতিক পটভূমিও চমৎকার। ক্ষান্ত বসন্তের পুষ্পবিকশিত লাবণ্য আর গ্রামীণ অনাহত হাওয়ার পথে উন্মত্ত বোলান গানের সুর সারাদিনরাত উচ্ছ্বসিত হয়ে জাগিয়ে রাখে গ্রামীণ মানুষের সহজ উদ্দীপনাকে। বোলান গানের 'গাহক' ও শ্রোতা

উভয় পক্ষই এই সময়ে থাকে স্বভাবী ও মেজাজী। গ্রামীণ অর্থনীতি বছরের এই সময় একটু স্বপ্ন দেখে। যুবক ও কিশোররা বোলানের দল বাঁধে। গান গাইতে গাইতে পার হয়ে যায় নিজের জেলার চৌহদ্দি। সারাদিন গান গায় মেরাপে মেরাপে, সারারাত গান গায় সম্পন্ন গৃহস্থের উঠোনে উঠোনে। রক্তনেত্র তবু অক্লান্ত। জাগর ও সদাচঞ্চল। তবে সে চাঞ্চল্য অকারণে নয়। সমস্ত দেহ বেপথু ও ছন্দিত হয়ে ওঠে প্রায়শই দিশি মদের অন্তর স্পন্দে।"

বোলান গান হলো আসলে স্বল্প পরিসরে বিশেষ এক ধরনের পালাগান। প্রতিটি পালাই অবশ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ। পালাগুলি সাধারণত এরকম — দুর্বাশার অভিশাপ, অভিমন্যু বধ, সীতার বনবাস, বিশ্বামিত্র মুনির ধ্যান ভঙ্গ, দাতা কর্ণ পালা ইত্যাদি পালাগুলি কখনো - সখনো সংলাপযুক্তও হয়। লৌকিক সুরেই পালাগান গাওয়া হয়। বাজনা হিসেবে প্রধানত ব্যবহৃত হয় মাদল, বাঁশি, মন্দিরা। বোলান গান পুরুষরাই গেয়ে থাকেন। পুরুষদের মধ্যেই এক বা একাধিক জন নারী সাজে। বোলান গানের সঙ্গে নৃত্য যুক্ত থাকে। বলা যেতে পারে, বোলান গান হলো গীতি কাহিনী। এখানে একটা কথা বলা বোধকরি সমীচিন হবে কবি রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে গীতিনাট্যের পরিচয় আমরা পাই, যেমন 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা' ইত্যাদি — তা লোকসাহিত্যের ধারা ধরেই এসেছে। বলা বোধকরি উচিত হবে, বোলান গানের এই গীতি কাহিনীই পরবর্তীকালে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের কাহিনীর দিকে দৃক্‌পাত করলে এ সত্য স্পষ্ট হয়। বিশেষ করে বোলান গানের মতনই লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যে পুরাণ কাহিনীর ছড়াছড়ি। কাজেই, বোলান গানে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাব যে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যে পড়েছে তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। যেহেতু রূপকার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, সেহেতু তাঁর গীতিনাট্যের প্রসাদগুণ হলো — তিনি বোলান গানের মতন রঙ্গ-রসিকতার লঘুতাকে যেমন তাঁর গীতিনাট্যে বর্জন করেছেন, তেমনি বর্জন করেছেন গীতিনাট্যের শুরুতে বোলান গানের মতন বন্দনা গীত। তবে বোলানগানের সূক্ষ্ম প্রভাব যে ফাল্গুনদীর মতন ভেতরে-ভেতরে প্রবাহিত তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না।

বোলান গানের শুরুতে যে বন্দনাগীত গাওয়া হয় তা দেব-দেবীকে উদ্দেশ্য করেই গাওয়া হয়। বন্দনা গীত ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতে, "গণেশ কিংবা সরস্বতী উভয়েরই হইতে পারে।" ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে (বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস), "শুধু গণেশ বা সরস্বতী নয়, বন্দনা গীতে শিবও স্থান পান। আর এই স্থান পাওয়াটা স্বাভাবিক, যেহেতু বোলান গান চৈত্র সংক্রান্তিতে শিব পূজা উপলক্ষ্যে রচিত ও গীত হয়। আবার কালীও স্থান পান বন্দনা গীতে।" এখানে দুটি বন্দনা গীত তুলে ধরছি —

১. প্রণামি গণরায় আমারে দেয় অভয়
তোমারি করুণায় বেদনা দূরে যায়।

দয়াময়ী দীনতারিণী সেজো না আর পাষাণী
ভবানী ভৈরবী তুমি পাষাণের নন্দিনী।।

২. আমরা সবে ভক্তি ভাবে, প্রণাম করি শিবে।
ভবভোলা তোমার খোলা কি বুঝিবে জীবে,
নিজগুণে ভক্তিহীনে মুক্তি দিতে হবে
পতিত পাবন নামটি তোমার তবে জানা যাবে

৩. ঝোলা মালা খোলা হাতে করে
এসো হে ভোলা দিগম্বর
কোথায় আছ মহামায়া
দেমা দাসে পদছায়া
হর জায়া গণেশ জননী
ভজন না জানি
হরজায়া গণেশ জননী।

বৈষ্ণব পদাবলীর একটি লৌকিক রূপও যে এই বোলান গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাও লক্ষ্য করা যায়। এখানে এরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি —

১. মাকে বল সাজাইতে ধড়া চূড়া দিয়ে।
অলকা তিলকা ভালে পদে নূপুর লয়ে।।
একবার নেচে নেচে আয় রে।
দেখ গোষ্ঠের সময় যায় রে।।
ওরে মায়ের কোলে থাকলে কেনে তেমন সুখ পাই না।
আমরা কাকে করব রাখাল রাজা তুমি বাদ যাবে না।

২. ও ভাই, বল রে কানু।
কে বাজাবে মোহন বেণু।।
তোরে লয়ে গোষ্ঠে গেলে।
বড় সুখে থাকি কেলে।।
বনফুলে সদাই হারে।
গাঁথিয়ে পরাই তোরে।।

৩. আপনি শিঙার ধ্বনি করে হল সারা,

কেন আর বিলম্ব কর, ও ভাই, মাখনচোরা।

ডাকিছে ডাকিছে দাদা।

শিঙার স্বরে বলাই দাদা।।

ও তুই কেমনে রইলি ঘরে ওরে কেলে সোনা।

ওরে নির্দয় কেন রাখাল প্রতি বল না, বল না।।

কেন নির্দয় হলি ভাই,

কি দোষ করিলাম সবাই।।

এখানে লক্ষণীয়, এইসব গানগুলির সহজ ও সরল প্রকাশভঙ্গি। বোলান গানের মধ্যে এই যে গোষ্ঠ-গীতি তা বেশ সুমিষ্ঠ। গাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। আবার, শ্রীকৃষ্ণকে 'জীবনদাতা' রূপেও কল্পনা করা হয়েছে, বিশেষ করে পরমপুরুষ, শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যের কথা ভেবে। যেমন —

১. জলে কিবা অনলে, ভাই, তুই রে জীবনদাতা।

তুই জানিস আর আমরা জানি আরকে জানে তা।

ও ভাই অন্যে কেউ তা।

জানে না, তোর আমার মরমের কথা।

ও ভাই বনবিহারী,

বনে যেতে কেন রে দেরী।।

তবে আর কেন ভাই, চরাতে গাই, যেতে করছ দেরী।

মায়ের কাছে বল বল।

গোষ্ঠসাজে সেজে চল।

এলো এলো ঐ দেখ বলাই।

হেতা দিস না ব্যথা ভাই।

২. হাসি হাসি, কালশশী, আমরা আসি ভাই রে।

তোর আশাতে আশা মোদের অন্য আশা নাই রে।।

একবার এস ভাই, এস ভাই,

আমরা নেচে নেচে গোষ্ঠে যাই।।

ও ভাই, গিরিধরা পড়বে ধরা ধৈর্য ধরতে নারি।

ও তুই, রাখাল মাঝে এলি সেজে আনন্দে বিহারি।।

দুঃখ দিও না, হরি।

আয়রে, ভাই, তোর পায়ে ধরি।

যদি, ভাই, তোর পায়ে বাজে।

কাঁধে করব বনমাঝে,

এখন মা যে নাচন দেখতে চায় রে,

নেচে নেচে আয় রে।।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুন্দর কটি কথা বলেছেন নিরক্ষর পল্লী কবির এই রচনাগুলি সম্পর্কে, "নিরক্ষর পল্লী কবির রচনা বলিয়া ইহারা বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর মধ্যে স্থান পাইতে পারে নাই। কিন্তু এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী রচয়িতাদিগের রচনার তুলনায় ইহারা অধিকতর আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। এমনকি, রচনার মধ্যেও কোন গ্রাম্যতা অনুভব করা যায় না।" ডঃ আশুতোষবাবুর কথার যথার্থপ্রমাণস্বরূপ এখানে আর একটি বোলানের উদাহরণ রাখা যেতে পারে। রচনার উৎকর্ষতা আমাদের বৈষ্ণবপদাবলীকেই কেবল স্মরণ করিয়ে দেয় না, মহৎ কবির রচনায় যে গুণ থাকা দরকার তা এখানে বিদ্যমান – ছন্দনৈপুণ্যে ও পংক্তি গঠনের মুন্সীয়ানায়। যেমন —

রাখালের বিনয়বাণী নীলমণি শুনিয়ে।

প্রণমিয়ে দাঁড়াইল মায়ের কাছে গিয়ে।।

বলে, সাজাইয়ে দাও, মা।

বিলম্বে কাজ নাই, জননী।।

তখন নন্দরাণী নীলমণি সাজাইয়ে দিল।

অমনি মায়ের পদে প্রণাম করি রাখালরাজ বলিল।।

মিশো না রাখালদলে রাখালসাজে রাখালরাজ।

আগে আগে চলে ধেনু, মাঝে চলে রাম-কানু।

শিঙা বেণু বাজায়ে বাজায়ে নেচে নেচে গেয়ে গো।

রাখালগণ আনন্দ মনে পাছু পাছু যায় গো।

আনন্দের আর নাইকো সীমা কত শোভা পায় গো।

সবাই নেচে নেচে চলিল গো, ধেনু চরাইতে।

ওগো, সৃষ্টিধর কয় সখ্যভাবে যাই বলিহারি।

মনে এই বাসনা উপাসনা ঐরূপ যেন করি, দিবা

ঐরূপ শয়নে স্বপনে হেরি, দশের পদে প্রণাম করি।

পদরজঃ শিরে ধরি, বদনেতে বল হরি হরি।

তবে, বোলান গান প্রধানত পুরাণ কাহিনী মূলক হলেও কিন্তু বোলান গানে সমসাময়িক জীবনবোধের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় এ-ও লক্ষ্য করা যায় পৌরাণিক কাহিনীর চরিত্রে লৌকিক কাহিনী এবং চরিত্র মিলেমিশে গেছে। এখানে সমসাময়িক জীবনবোধের কিছু চিত্র বোলান গান থেকে উল্লেখ করছি। যেমন ---

১. কপাল ভাল হবে তোমার বিয়োগে,

৭০ (সত্তর টাকার জামা পরো গায়েগে।।

সিল্কের চাদর ভারি --

তার কদর স্টকিং জুতো পায়ে গো।।

২. ভাল করে চুল বেঁধেছে, ফুল দিয়ে,

তখন সে আরো বড় মেয়ে

কাল চুলে চিরুনী পড়েছে রুক্মিনী,

স্যামিজ শোভিছে রাঙ্গা গায়ে।

'বর্তমান' দৈনিক পত্রিকার ৭ই জুলাই, ১৯৮৫-র সংখ্যায় অপূর্ব কুমার সরের একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে "বীরভূমের লোকগীতি বোলান" শীর্ষক নামে। অপূর্ব কুমারবাবু এই বোলান গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন, "এমন এক ধরনের পালাগান যা আসরে ঘুরে ঘুরে গাওয়া হয় উচ্ছ্বাস পূর্ণ নাচ ও বাজনার তালে তালে, এবং যে পালার প্রতিটি গানের কিছুটা অংশ মূল গায়েনের গাওয়ার পর সেই একই অংশ গেয়ে থাকে সমগ্র দল এবং এভাবে গানটি শেষ হয়, আর যেখানে গানে উত্তর প্রত্যুত্তরও চলে কিংবা মাঝে মাঝে থাকে সুরহীন আবৃত্তি বা ছড়া কাটা।"

অপূর্ববাবুর কথাগুলি যে ফেল্না নয় তার সমর্থন হিসেবে প্রাবন্ধিক সুধীর চক্রবর্তীর কটি কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সুধীরবাবু পালা বোলান বা বোলান যাত্রায় দশ পনেরজনের অংশ নেওয়ার কথা বলেছেন। ছেলেরা যে মেয়ে সাজে যা আগেই বলেছি। আসরে বৃত্তাকারে সবাই দাঁড়ায়; মাঝখানে খাতা হাতে একজন প্রম্পটার মূল গায়ককে পংক্তি বাতলে দেয়। সুধীরবাবুর কথামতন ("লোকনাট্য বোলান", লোকশ্রুতি ষষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৯৬) গায়ক তখন গেয়ে ওঠে। পরবর্তী গায়কদল সম্মেলক কণ্ঠে গেয়ে ওঠে ঐ একই পংক্তি। সুধীরবাবুর মতে, "একই গান তিনবার রূপায়িত হয়। প্রথমে মূল গায়ক, তার পরে আগদল, সবশেষে সমবেত কণ্ঠে। একক চরিত্রাভিনয়ের সুযোগ নেই। রামের গান

সবাই গায়, লক্ষ্মণের জবাবও সবাই গায়। এই হলো বোলানের নিজস্ব গীতরীতি। উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক, কিন্তু সমবেতভাবে গেয়।" বোলান দলের সাজ-পরিচ্ছদ ও সমগ্র দলটির পরিকাঠামো সম্পর্কেও সুধীরবাবু উক্ত প্রবন্ধে পরিষ্কারভাবে বিস্তারিত তথ্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন, "সস্তা পাউডার, লাল রং লিপস্টিক, উগ্রবক্ষবন্ধনী এবং অবশ্যই চোখে গগ্‌লস্‌ ও হাতে রুমাল। সিনথেটিক শাড়ির নিচে অধোবাস হয়ত ফুলপ্যান্ট এবং তা প্রকাশ্য। তাতে কিছু আসে যায় না। শিবপূজা উপলক্ষে বোলান গান হয় অথচ পালার উপজীব্য কখনই শিবমহিমা বিষয়ক নয়। নানা পৌরাণিক প্রসঙ্গ নিয়ে পালা বাঁধা হয়। যিনি বাঁধেন সেই 'কবেল', 'ছড়াদার' বা 'বইদার' গ্রামের একজন মান্য ও পুরাণ বিশারদ ব্যক্তি। বাঁধা গানে যিনি সুর দেন তাঁকে বলে 'মাস্টার'। আর যিনি দল গঠন, পরিচালনা ও বায়না নেওয়া ইত্যাদি ঝক্কি নেন তিনি 'ম্যানেজার'। গ্রামের 'মোরপে' মাস খানেক অধিক রাত পর্যন্ত মহড়া চলে। অবশেষে ২৭/২৮ চৈত্র নাগাদ বোলান দল বেরিয়ে পড়ে। ড্রেস, মেকাপ নিজেদের। ফ্লুটবাদককে হয়তো ভাড়া নেওয়া হয়।"

পালা বোলানে অবশ্য বন্দনা অংশ গাইবার পরেই পালা দলের পরিচয় দেওয়া হয়। সুধীরবাবু এরূপ একটি উদাহরণ তাঁর নিবন্ধে রেখেছেন। সেটি এখানে তুলে ধরছি ---

মোদের বোলান গানের করি সমাধান।

সাহেব নগর বাড়ী মোদের সবার বাসস্থান।

গৌর হয় দলপতি শুনুন গো ভারতী।

জলধর করে গো ম্যানেজারি তাহার বাতিক ভারি।

সুশীল দলে করে মাস্টারি, প্রদীপ চন্ডী নাচে কায়দা করি।

কার্তিক চন্দ্র রচিল এ গান।

সর্বাঙ্গপুর তাহার বাসস্থান।

অর্থাৎ এই বোলান পালা দলের 'কবেল' হলেন কার্তিকচন্দ্র, নিবাস সর্বাঙ্গপুর। সুশীল হলেন সরকার, জলধর ম্যানেজার, গৌর দলপতি বা মূল গায়েন, প্রদীপ ও চণ্ডী নর্তক। সমগ্রদলের ঠিকানা সাহেবনগর গ্রাম।

পাঁচালীর মতোন দীর্ঘ রচনাও বোলান গানে লক্ষ্য করা যায়। এখানে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের সংগৃহীত একটি গান উল্লেখ করছি ---

প্রথমে বন্দিব আমি গণেশের চরণে।।

দক্ষিণে জলদা নদী বন্দি জগন্নাথে।

যার প্রসাদ খেয়ে লোক হাত বুলায় মাথে।।

জগন্নাথের কি মহিমা, বলে কে জানাই সীমা।

গণেশ থাকিতে যেবা অন্য লোকে পূজে।
নানা বিঘ্ন হয় তার সিদ্ধ না হয় কাজে।
আমি দেখে এলাম পাতাল পুরে, গণেশ পূজে ঘরে ঘরে।
বন্দনা করিতে আমার হবে অনেকক্ষন।
একই বারে বন্দিব সকল দেবগণ।।
মন দিয়া তোমরা শুন, হরি হরি মুখে আন।
শয়নেতে ছিলেন নন্দ রত্নসিংহাসনে।
শুনিয়া কোকিলধ্বনি উঠিল বিহানে।।
উঠ্‌রে বাপ, নীলমণি, উঠে খাওরে ক্ষীর-নবনী।
কত নিদ্রা যাওরে, গোপাল, আমি তো না জানি।
জাগিল গোকুলের লোক পোহাল রজনী।

একবার উঠে আয়রে কোলে,
চাঁদ মুখে ডাক মা মা বলে।

উঠে নন্দ শ্রীদাম মোর সুদাম বলে ডাকে।
গোচন করিয়া ধেনু লয়ে যায় রে মাঠে;
গগনেতে বেলা হলো, কানাই এবার গোঠে চল।
রাম নাম বলে তখন শিঙায় দিল সাড়া।
বলরামের শিঙার স্বরে, সাজিল গোয়ালা পাড়া।
বলরামের শিঙার স্বরে, গোধন হাম্বা চাম্বা করে,
তখন বাথানে জড়ো দ্বাদশ রাখাল।
সকল রাখাল মিলে ডাকাইছে পাল,
গগনেতে বেলা হলো, গোষ্ঠের সময় বয়ে গেল।
তায় প্রাণের ভাই বলে শ্রীদামও চলিল।
মায়ের কথায় কানাই ঘরেতে রহিল।।
গগনেতে বেলা হলো, ধেনুগুচ্ছ সকল খোল।
গগন পানে চেয়ে দেখ গোষ্ঠে বেলা হলো।
আসি বলে গেল চলে, বসে আছে মায়ের কোলে।।
শ্রীদাম সুদাম মোর তিলেক রেখ ধেনু।

ঘরে গিয়ে পাঠাইব শ্রীনন্দের কানু।।
হরি হরি বলে, ভেসে যাই নয়নজলে।
রাখাল প্রবোধ দিয়ে শ্রীদামও চলিল।
মায়েরও নিকটে গিয়া দরশন দিল।।
কোথায় কা গো নন্দরাণী, গোঠে পাঠাও তোর নীলমণি।।
করেছি কঠোর রত সাগরে ঢেলে গা।
অনেক ভাগ্য হয়ে আছি গোপালের মা।
শিবের মাথায় ঢেলে মধু, কোলে পেলাম সোনার যাদু।।
কানাই ভাইকে রেখে যদি আমরা যাব গোঠে।
ভাই বিনা কে তরাবে বিষম সঙ্কটে।।
ফলে যদি যাব গোঠে, কে তরাবে এ সঙ্কটে।।
একদিন মরেছিলাম বিষজল খেয়ে।
বাঁচিয়ে দিল ভাই কানাই প্রাণদান দিয়ে।।
মরেছিলাম বিষ খেয়ে, বাঁচিয়েছিল কানাই ভেয়ে,
কে যাবি যে যাবি তোরা কানাইকে আনিতে।
সুবল বলে, আমি ভাইরে পারব না যাইতে।
শুন শ্রীদাম আমার বাণী, যাতে এসে নীলমণি,
সুবল বলে আমি, ভাই রে, গিয়েছিলাম কাল।
কানাই-এর মা নন্দরাণী দিয়েছিল গাল।।
তোর মায়ের কি কঠিন হিয়ে, দয়া নাই চাঁদমুখ চেয়ে।।

বোলান গানে কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ছাড়া পুরাণের অনেক কাহিনীই এসেছে। বিশেষ করে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী চরিত্র নিয়ে এরকম সুদীর্ঘ বোলান গান রচিত হয়েছে।

এখানে আর একটা কথা বলা উচিত হবে, বোলান গানের মতন মূল গায়েনের গাওয়ার পর দলবদ্ধভাবে যে গাওয়ার রীতি আছে তা এযুগের হিন্দী গানেও লক্ষ্য করা যায়। আর একটা কথা বলা উচিত হবে, বাংলা নাটকে আমরা যে কোরাস গানের পরিচয় পাই তা বোলান গানের এই রীতি অনুসরণেই সৃষ্টি হয়েছে বলা যেতে পারে।

আবার, পরবর্তীকালে বিশেষ করে বোলান গানের রং পাঁচালী অংশ গ্রাম্য কবির আশ্চর্য সমাজ সচেতনতা ও রাজনীতির প্রতি গভীর মনস্কতাও উঠে এসেছে। বোলান গানে সমাজজীবনের অনেক ঘটনা, চিত্র পারম্পর্যভাবে উঠে এসেছে সামাজিক মূল্যবোধের

পরিপ্রেক্ষিতে। সুধীরবাবুর মতে, "সমাজ বিজ্ঞানী ও জীবনরসিকদের চিন্তা ভাবনার অনেক খোরাক এসব গানে মেলে। এখনকার ছেলেমেয়েদের পোশাকের অভ্যবতা, অবিবাহিতা মেয়ের দুঃখ, পণপ্রথার করুণ শোষণ, ভ্যাসেকটেমি, জমিতে সার প্রয়োগে ফসলের স্বাদহীনতা, লোডসেডিং ও অকেজো টেলিফোন,-- এতসব বিভিন্ন, বিচিত্ররসের প্রসঙ্গ রংপাঁচালীতে এসে যায়। কোথাও তার ব্যঙ্গের চাবুক, কোথাও অসহায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "কল্কি অবতার" নাটকে আবার সংলাপ ছড়াগীতের মধ্যে বোলান গানের ছড়াগীতের মতন সমাজ সম্পর্কে বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

শিরোমণি -- বলতে কি সত্যি কথাটা নিজেদের মধ্যে
হিঁদুয়ানির অবস্থাটা, বলবে সবে বৈদ্যে,
দাঁড়িয়েছে খারাপ; দেখ, আসল পাপ সব বাদ নিয়ে
সমাজটা করেছি খাড়া ভ্রমণ এবং খাদ্যে;
আরও মেটাও এরকম ম্লেচ্ছের উপর ক্রোধে
যেন মুসলমানী অত্যাচারের প্রতিশোধ-এ।

(১ম অঙ্ক/১ম দৃশ্য)

একালের আধুনিক নাট্যসাহিত্যেও লক্ষ্য করা যায় প্রচ্ছন্ন বোলান গানের প্রভাব। বিশেষ করে "মারীচ সংবাদ" নাটকটির নাম করা যেতে পারে।

বোলান গান এখনো যে নব্য আধুনিকতার মিশ্রণে কিছু বদল হলেও কিন্তু মূলত টিকে আছে এর উৎকৃষ্ট শিল্পগুণ ও সহজ-সরল মর্মস্পর্শী প্রকাশ ও কাহিনীসম্বলিত পালাগানের জন্য। বোলান গান তাই আজো গ্রামবাংলার মানুষদের মনে দেয় আনন্দ। মনকে নানাভাবে করে রসবোধে আপ্লুত।

ঘাটু গান

পূর্ববাংলায় বিশেষ করে মৈমন সিংহ জেলার পূর্বাঞ্চল, ত্রিপুরা জেলার উত্তরাঞ্চল এবং শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিমাঞ্চলের একশ্রেণীর প্রচলিত গীতের নাম ঘাটু গান। এই গান মূলত বালিকাবেশী বালককে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। অনেকে মনে করেন পূর্ববঙ্গে প্রচলিত গাঁড় গান ঘাটু গানেরই নামান্তর। এ সম্পর্কে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর "লোকসাহিত্য" গ্রন্থের ২য় খণ্ডে বলেছেন, "পূর্ব মৈমনসিংহ, ত্রিপুরার কিয়দংশ এবং সিলেট অঞ্চলে এক প্রকার আঞ্চলিক গীতি প্রচলিত আছে। এগুলি স্থান ভেদে ঘাটু, গাড়ু, গাঁড়ু, গাটু , ঘাঁটু ইত্যাদি নানাভাবে উচ্চারিত হয়। পশ্চিমা কুলিরা আবার উচ্চারণ করে 'গানটু'। শব্দমূল বিচারে 'ঘাট আর গান' এই দুইটি শব্দই প্রধান মনে হয়।"

যদিও এই 'ঘাটু' শব্দটির উদ্ভবের ইতিহাস ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে (বাংলার লোকসাহিত্য ৩য় খণ্ড) তেমন স্পষ্টভাবে গ্রহণ যোগ্য নয়। তাঁর মতে, "ইহাকে প্রধাণতঃ একদিক দিয়া ঘাটের গান বলা যায়, তাহা হইতেও ইহা ঘাটু গান বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিতে পারে। ঘাটের গান শব্দের অর্থ এই যে, এই গানের ক্ষেত্রে প্রধাণতঃ যমুনার ঘাট; নদীমাতৃক পূর্ববাংলার নদীর ঘাটের ছবিই ইহার প্রধান অবলম্বন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া যমুনার জলে তাহার ছায়ামূর্তি প্রতিবিম্বিত হইতেছে, অপলক দৃষ্টিতে সে দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার কলসী কখন স্রোতের জলে ভাসিয়া গিয়াছে, ইহাই সাধারণতঃ ঘাটু গানের বিষয়; সেইজন্য ইহাকে ঘাটের গান হিসেবে ঘাটু গান বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।" তিনি আরো বলেছেন, "কেহ মনে করেন, শব্দটির উচ্চারণ গাঁড়ু এবং গুজরাটি গান্টু শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ মনে করেন, গানের সঙ্গে ঘাট শব্দ যুক্ত হইয়া ঘাটু হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত আসিয়া পৌছিতে পারা যাইতেছে না।"

সিরাজ উদ্দীন কাসিমপুরী আবার 'বাংলা একাডেমী' পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন (১৩৬৮) , ঢাকা সংখ্যায় "লোকসাহিত্য গাঁড়ু গান" শীর্ষক একটি আলোচনায় যে কথা বলেছেন তা-ও প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর তথ্যানুসারে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'গানটু' নামে বালকদের নৃত্য - সম্বলিত এক প্রকার গান বৃন্দাবন মথুরা থেকে গঙ্গার তীর ধরে রাজমহল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, সে বিচারে গানগুলির নাম 'গাঁটু','গাঁড়ু' হওয়াই স্বাভাবিক। এই গানের ইতিহাস সম্পর্কে ডঃ আশুতোষবাবু বলেছেন (বাংলার লোকসাহিত্য ৩য় খণ্ডে), "এই অঞ্চলে যে কোন কারণেই হোক, মধ্যযুগ হইতেই বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ প্রভাব স্থাপিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বিথলঙ্গের আখড়া, কিশোরগঞ্জের শ্যামসুন্দরের আখড়া, বাজিতপুরের হরিবোলের আখড়া, আচমিতার গোপীনাথের আখড়া এই অঞ্চলেই অবস্থিত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই

শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করিতে আসিয়া এই অঞ্চলেরই মঠখলা গ্রামে যে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তাহার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে। সেইজন্য চৈতন্যদেবের জীবন ও আদর্শ দ্বারা এই অঞ্চলের সমাজ তখন হইতেই বিশেষভাবে প্রভাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।"

সিরাজউদ্দীন কাসিমপুরী 'বাংলা একাডেমী পত্রিকায়' (১৩৬৮ সালের ২য় সংখ্যা, ঢাকা) আবার লিখেছেন, "ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীহট্টের আজমিরীগঞ্জের নিবাসী জনৈক আচার্য্য রাধিকার বিরহভাবে আকুল হইয়া (রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের জন্যে যে ভাবে উন্মাদিনী সাজিয়াছিলেন) সংসারের মায়া কাটাইয়া কোথায় উধাও হইয়া গেলেন। বেশ কয়েক বৎসর পর তিনি স্বীয় গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আপন আবাস-বাটীর সম্মুখস্থ পুকুরের ধারে কুঞ্জ নির্মাণ করিলেন এবং বিরহিনী রাধিকার বেশে মথুরাবাসী কৃষ্ণের অপেক্ষায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। ভাবাবেগে অধীর হইয়া কখন তিনি ফুল তুলিতেন, কখনও অপরূপ কুঞ্জ সাজাইতেন, কখন কলসী কাঁখে জল ভরিতে যাইতেন, কখনও বা প্রাণ - বেণুর রব শুনিয়া প্রিয় শিষ্য উদয়াচর্যের গলা জড়াইয়া কাঁদিতেন, কখন বা কোকিলার কুহুতানে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেন — তন্ময় হইয়া পড়িতেন।"

তিনি আরো বলেছেন, "ধীরে ধীরে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; নিম্ন শ্রেণীর অনেক ছেলেও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল বা শিষ্য করিয়া লওয়া হইল। এই সকল ছেলেকে রাধিকার সখী বেশে সাজান হইত। ছেলেরা নীরবে নাচিয়া ভাব প্রকাশ করিত; বিরহ-সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ ও ভাবাতুর করিত। ক্রমে এই ছেলে শিষ্যদিগের যোগে গড়িয়া উঠিল গাঁড়ুগান। গাঁড়ুগানের সম্যক বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভের পূর্বে উক্ত উদয় আচার্য্য তদীয় গুরুদেবের আচরিত সাধন পদ্ধতির কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করিয়া ইহাকে পালাগান বা গাঁড়ু গান আসর, ভজন, সালাম, সাজন, গৌর, গোষ্ঠ, বংশী, জলভরা, জলরূপ, ফুলতোলা, কুঞ্জ সাজানো, নিদ্রা, স্বপন, কোকিল, বিচ্ছেদে, ভোর, মধুমাস, সখী সংবাদ, সন্ধ্যা প্রভৃতি অঙ্কে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক অঙ্ক আবার সাধারণ গান, খেয়াল গান ও সমগানে বিভক্ত।

উদয় আচার্য্যের মৃত্যুর পর এই সাধন পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া লোক সঙ্গীতে পরিনত হইল। শাশ্বত বিরহের পরিবর্তে নর-নারীর স্বাভাবিক আকর্ষণ-জনিত প্রেম সঙ্গীতের রূপ লাভ করিল।"

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী (লোকসাহিত্য ২য় খণ্ড) ঘাটুগানের উৎপত্তি সম্পর্কে 'রাধার বিরহ'কে প্রধান বলে মনে করেন। তাঁর মতে, "গানগুলির সংক্ষিপ্ত — দুই পদী বা তিনপদী। গায়কেরা এগুলিকে 'দোহারী' এবং 'তিহারী' বলেন। চম্পক অঙ্গুলি সঞ্চালন করে নৃত্যের ভঙ্গিমায় বর্ষা-মেদুর প্রকৃতির পটভূমিতে ঘাটু বালকের বিরহ সুরে শ্রোতাদের তন্ময় করে তুলতো।" তাঁরই গ্রন্থে সংকলিত উদাহরণ থেকে তুলে ধরছি--

কি হেরিলাম যমুনায় আসিয়া গো সজনী বলমালী তরুয়া মূলে।

যাইতে যমুনার জলে সেই কালা কদম তলে ওরূপ চাইতে কলসী নিল সোতে।

তিনি এ-ও বলেন, ঘাটুগানের এক পর্যায়কে তেলেনা বলে। এতে উর্দু ও হিন্দীর মিশ্রণ থাকে। যেমন তিনি তাঁর "লোকসাহিত্য" গ্রন্থের ২য় খণ্ডে এ প্রসঙ্গে যে উদাহরণটি তুলে ধরেছেন তা এখানে তুলে ধরছি —

পিয়ারী তোমকো পিত লাগাওয়ে, রুম ঝুম তেলেনা গাওয়ে।

রুম ঝুম্ ঝুম্ তেলেনা গাওয়ে, রুম ঝুম্ ঝুম্ তানা নানা নাছ নাছ।।

তিনি গানটি সম্পর্কে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, স্পষ্টই মনে হয় নাচের জন্য গানটি রচিত। যথার্থই বলেছেন তিনি। গানটির কথা ও সুর নাচের উদ্দাম ছন্দ ও তালের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

যাইহোক, সিরাজউদ্দীন কাসিমপুরী যে তথ্যের উপর নির্ভর করে ঘাটুগানের উৎপত্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন তা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে এ কথা বলা উচিত হবে ঘাটুগানে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক আধ্যাত্মিকথাই প্রাধান্য পেয়েছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টচার্য্যের সংগৃহীত গান থেকে দুটি দৃষ্টান্ত রাখছি —

১. আরে বংশী বাজে কোন্ বনে।
শুনিয়া বন্‌শী তান, উদাস হৈয়াছে প্রাণ
চিতে আমার ধৈরয না মানে।।
আরে সখীরে --
দাঁড়ায়ে কদম তলা, বাঁশী বাজায় চিকন কালা,
গলায় শোভে বনমালা।
বাজায় বন্‌শী সুতানে, ধৈর্য নাহি মানে।।

২. শোন গো, পরাণ সই, তোমাকে মরণ কই,
বাঁশী মোরে করল উদাসী, সখী রে।।
কি ধ্বনি পশিল কানে,
সে অবধি পরাণ আমার
কেন লয় মোর মনে,
বাঁশী কি যাদু জানে
গৃহ কর্ম না লয় আমার মনে, সখী রে।।

ঘাটু গান সম্পর্কে আর একটি কথা বলা সমীচিন হবে তা হলো, সম্ভবত ব্রজবুলি ভাষার অনুকরণের জন্যই ঘাটুগানে হিন্দী শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। হিন্দী ও উর্দু

শব্দযুক্ত ঘাটুগানকেতো আবার ডঃ আশরাফ দিদ্দিকী তেলেনা গান বলে অভিহিত করেছেন অবশ্য একটি পর্যায়ের গানকে। যা ইতিপূর্বে বলেছি। এখানে এরূপ কটি দৃষ্টান্ত রাখছি যা ব্রজবুলি ভাষার প্রতিধ্বনিরূপ যেমন আমাদের কানে লাগে, তেমনি হিন্দী শব্দের রমরমা বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে যা ঘাটুগানগুলিকে একটা আলাদা ঘরানায় হাজির করেছে বলা যেতে পারে। যেমন --

১. ললিতে গো কুঞ্জ সাজাও
মনে বাঞ্ছা পুরাইতে আসবেন গোলকবিহারী।।
ফুলের রত্ন সিংহাসনে,
বইসে রইলাম রাই একা কুঞ্জে
আসবে বৈলে আশায় আশায়,
পোহাইলাম নিশি,
প্রাণ সখীরে, আইল না পোড়া বিদেশী।।
কোন না কামিনী সনে কাটাএ দিন রাতিয়া।
পিউয়া আরে দহে মেরা ছাতিয়া।।

২. ক্যা রূপ হেইরে আইলাম যমুনায়, সখী গো, আইলাম যমনায়।
ও সখী, আচানৌকা রূপ হেরিলাম তরুয়া মূলে।
ওরে মেরা মন হৈরে নিল -- নিলরে ঐ কাল বরণে।।
একেত আচানৌকা রূপ হেরি -- হেরিত যমুনায়।
সেইত অবোলা বামা ধৈরষ না মানে হামারি।
মনেরি মন হৈরে নিল -- নিল ঐ কাল বরণে।।

৩. কুলের শেজ্‌জুয়া বিছাও, রামা, লইয়া চল মালঞ্চি,
কুঞ্জে আসবে বাঁকা শ্রীহরি।।
জাঁতি জুঁতি, কৃষ্ণ, বেলী,
গন্ধরাজ কুসুম কলি ,
ফুলেরি শেজ্‌জুয়া বিছাও ওরে।।
জ্বালাইয়া কাঞ্চনের বাতি,
জাগব আমি সারা রাতি,
ভোরের কোয়িল কণ্ঠে আমি শুনব বন্ধুর গীতি।।

৪. আমার বিরহ না জ্বালায় গো চিত্ত দহে।
কোথায় রইলা প্রাণের পিউ আইন্যা মিলাও হে।।
যয়বন জোয়ারের পানি,
ধাইয়া ধাইয়া উড়ে গো নিষেধ মানে না।
নিষেধ মানে না গো প্রাণে সবুজ মানে না।।

৫. আজুকা স্বপনে গো সখী দেখলাম পিয়াকো,
জাগিয়া না পেখনু তাহারে।
স্বপনে পেখনু সই গো পিউয়া হামারি শিউরে।।
উঠ গো, উঠ গো, বইলে ডাকে হামারে,
শিয়রে বসিয়া পিউয়া হাত ধৈরা টানে,
জাগিয়া নেহারি পিউয়া নাই হামারি।।

৬. আরে আরে মধুমাসে -- এদিন আর কবে হবে।
পিউয়া নাই মহল মে -- সখী সখী রে।
বিফলে দিন যায় গুঁইয়ে, দিন যায় রে গুঁইয়ে।
সখী, সখীরে।।
আরে, দরদী কেউ নাই -- নাই রে হামারি,
পিউ কু মিলায় মহল মে, জিউরায় ত যায় রে বইয়ে।।
যয়বন-জোয়ার উথালিয়া যায় মেরা.
পিউ বিনা শূন্য দেখি রে জিউরা।
সখী, সখীরে।।

উপরিউক্ত গানগুলির ভাষা কিন্তু বেশ প্রাঞ্জল। তবে গানগুলির মূল বিষয় বিরহ। কাজেই সহজেই গানগুলি থেকে অনুমান করা যায় প্রেমের নৈরাশ্যের দিকটাই এখানে অধিক প্রকটিত হয়েছে। উপরিউক্ত গানগুলি কিন্তু সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়। সাধারণত ঘাটু বালক যে একক সঙ্গীত গেয়ে থাকে তা প্রেম-সঙ্গীত। নৃত্যের সঙ্গে তা গাওয়া হয়।

তবে, পরবর্তীকালে ঘাটুগানে সমসাময়িক ঘটনাও উঠে এসেছে সময়ে সঙ্গে তাল মিলিয়ে লোকসাহিত্যের চিরাচরিত ধারা অনুযায়ী। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকীর (লোকসাহিত্য ২য় খণ্ড) সংগৃহীত একটি গান এখানে উদাহরণ হিসেবে রাখছি। যেমন ---

দেখরে ইংরাজ লোকে কি কল কৈরাছে। সাস্- সাগর পাড়ি দিয়া রাজ্য পাত্যাছে। জংগল কাইট্যা শড়কে তবে বসাইছে দিনের খবর ঘড়িত্ আইনাছে।।

ঘাটুগানের সঙ্গে 'ঘাট' শব্দটির একটি মাহাত্ম্য জড়িয়ে আছে তা ইতি পূর্বে বলেছি। এ আলোচনাটির পরিসমাপ্তি কালে দু-চারটি কথা বলা উচিত হবে বোধকরি, এর সম্যক ধারণা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল। বিশেষ করে তিনি যখন পূর্ববঙ্গে তাঁর পিতৃপুরুষের জমিদারীর দেখভাল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তখনই সম্ভবত তিনি ঘাটুগানের সম্পর্কে বিস্তারিত ওয়াকিবহাল হন। বলতে তাই কুণ্ঠা নেই 'ঘাট' শব্দটি রবীন্দ্রকাব্যে সম্ভবত তাই নানা অলংকারে ও বিশেষণে সজ্জিত হয়েছে বার বার। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা ভালো, ঘাটের মাহাত্ম্য কবি রবীন্দ্রনাথের কবি মনকেও আলোকিত করেছে। তাঁর ''খেয়া' কাব্যগ্রন্থে যেমন পাই 'প্রতীক্ষা' কবিতায় ঘাটের প্রতি কবি-মনের আত্মসমর্পণের কথা —

বাঁধা তরী ঢেউয়ের দোলা লাগে

ঘাটের'পরে মরবে মাথা কুটে।।

তেমনি দেখি ''গীতাঞ্জলি'' কাব্যে কবি-মনের দার্শনিক ভাবনার ভেতরে চলমান সময়ের মহাকালের চিত্রপটে এক নতুন ব্যঞ্জনায় ---

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি;

ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।।

তবে, ইদানীংকালে ঘাটুগানে আগের মতোন স্নিগ্ধতা ও গভীর ব্যঞ্জনা ও চিত্ররূপময় ব্যাপারটি লোপ পাচ্ছে ক্রমশ সস্তার চমক ও অশ্লীল শব্দের আমদানির জন্য। এ ব্যাপারে রচয়িতাদের সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

ভাওয়াইয়া গান

ভাওয়াইয়া গান হলো প্রেমের সঙ্গীত। প্রেমভাবনায় একনিষ্ঠ বিভোরতাই ভাওয়াইয়া গানের বিশেষত্ব। রংপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারই হলো এই গানের পীঠস্থান। ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর "বাংলার লোকসাহিত্য (৩য় খণ্ড)" গ্রন্থে বলেছেন, "অরণ্য প্রকৃতির স্তব্ধতার মধ্য হইতেই ভায়াইয়ার সঙ্গীতের সুরে দীর্ঘ টানের জন্ম হইয়াছে, ইহার দীর্ঘ টান কিংবা চড়া সুর সম্পূর্ণ ভাটিয়ালির মত নহে; ভাটিয়ালির রসুরে কোন ভাঁজ নাই, কিন্তু ভাওয়াইয়া দীর্ঘ একটানা চড়া সুরের মধ্যে ভাঁজ আছে; অবশ্য এই ভাঁজ তালপ্রদান সঙ্গীতের মত স্পষ্ট নহে। ভাঁজের ভিতর দিয়াও এক টানা চড়া সুরের গতি ব্যাহত হয না।"

এ কারণে ভাওয়াইয়া গানে সম্ভবত একটা মাদকতা আছে। এবং শিল্পগুণে এক ধ্যানগম্ভীর ভাব। প্রেম ভাবনার সঙ্গে জীবনের এক নিবিড়তার যোগ লক্ষ্য করা যায় ভাওয়াইয়া গানে। "লৌকিক সংস্কার ও বাঙালী সমাজ" গ্রন্থে আবদুল হাফিজ যথার্থই বলেছেন — "বিরহের বিষয়বস্তুকে এমন গভীরভাবে আর কোনও লোকসঙ্গীত গ্রহণ করেনি।"

বিরহ বা বিচ্ছেদের অংশ কেন্দ্র করেই ভাওয়াইয়া গান কেবল মাত্র রচিত। প্রেমের সঙ্গীত হিসেবে এই ভাওয়াইয়া গান এ কারণে বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রেমের দিকটি বিশেষ করে কৃষ্ণের জন্য রাধার বিরহের ভাবটিকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনকি, এই প্রেম সঙ্গীতে মিলনের মুহূর্তেও বিচ্ছেদের আশঙ্কার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণব-কবিদের মতনই ভাওয়াইয়াগানের পল্লী কবিগণ প্রেমের সার্থকতা বিরহ বা বিচ্ছেদের মধ্যেই দেখেছেন, এবং বিরহ ও বিচ্ছেদের মধ্যেই নরনারীর পার্থিব প্রেমে স্বর্গীয় মহিমা আছে বলে এ সত্য বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বৈষ্ণব কবিতায় আমরা দেখি সম্ভোগের পর বিরহ, কিন্তু ভাওয়াইয়াগানে সম্পূর্ণ বিপরীত — সম্ভোগ ব্যতীতই বিরহ। বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে শিল্পগত ভাবের এখানেই একটু তফাত। তবে, এ কারণে কিন্তু ভাওয়াইয়াগানে বেদনার অনুভূতি প্রকট হওয়ার জন্য পার্থিব কলুষতা থেকে মুক্তি লাভ ঘটেছে। ভাওয়াইয়া গানের বিশেষ শিল্পগুণ এটি। বৈষ্ণবসাহিত্যের মতনই ভাওয়াইয়া গানে নায়ক রূপে কানাইয়ের উপস্থিতিও লক্ষণীয় --

> ও কি নাগর কানাই তুই মোরে
> উজান ছাড়ি ভাটির দ্যাশৎ
> কল্লেন মায়াবাড়ী --
> ওরে যৌবন কালে দোনো জনায়
> হলং ছাড়াছাড়িরে।

তোমার বাড়ী আমার বাড়ী

(নাগর) অনেক দূরের ঘাটা,

ওরে, কেমন করি হইবে দেখা

ঝোরে চোখের পানি রে।

ভোমরা খালি উড়িয়া পড়ে

ফুলের মধুর বাদে,

ওরে, তুই ভোমরার বাদে আজি

মোর না পরাণ কান্দেরে

নাচার কানাই . . . ।।

এখানে একটা কথা বলে রাখি ভাওয়াইয়া গানের মর্মস্পর্শী পংক্তি ও ভাব আধুনিক বাংলা গানেও পর্যন্ত কখনো-সখনো ঢুকে পড়েছে। বিশেষ করে 'লালকুঠি' চলচিত্র যারা দেখেছেন সকলেই সেই চলচিত্রের ভেতরে একটি গান শুনেছেন যেখানে উপরিউক্ত ভাওয়াইয়া গানটির ষষ্ঠ পংক্তিটি 'তোমার বাড়ী আমার বাড়ী' কথাগুলি প্রতিধ্বনিত করে এক বেদনা-করুণ রসে চলচিত্রের গানটি কে বেশ সুশ্রাব্য ও একসঙ্গে অর্থবহ করে তুলেছে।

তবে, শ্রীকৃষ্ণের হাতে যেমন বাঁশী, তেমনি অনুরূপ ভাবে ভাওয়াইয়া গানে প্রেমিক নায়ক মইষালের হাতে লক্ষ্য করা যায় দোতারা। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বাঁশীর সুরে গোপবালাকে ঘরছাড়া করতেন, তেমনি এই দোতারার শব্দও পল্লীবালাদের মন টানে এক দুর্নিবার আকর্ষণে-

রায়ডাক নদীর ঘাটৎ বসি

দোতরা বাজাও আপন খুশী

দোতরায় মোক করিছে বাড়ীছাড়া।

মোর দোতরার মৈষালী ডাঙ্গে

পাড়ার চেংড়ীর মনটা ভাঙ্গে

বগলৎ ডাকায় চক্ষুতে ইশিড়া

দোতরায় মোক করিছে বাড়ীছাড়া।।

ও মোর মৈষাল বন্ধুরে,

না বাজান তমান খুটারে দত্‌রা।

নারীর মন মোর

করিল রে ঘর ছাড়া।

ওর এ্যাখেতে সুতারো বাইজন রে;
কিনা সুর বাজে।
তোর দতরার বাইজন শুনি
মন না অয় মোর ঘরে।

রাধাকৃষ্ণ কাহিনী যে সমগ্র ভারতব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লৌকিক প্রেমকাহিনীর দিকে দৃক্‌পাত করলেই বোঝা যায়। ভাওয়াইয়া গান এর ব্যতিক্রম নয়। উপরিউক্ত গানেতেই লক্ষণীয় বৈষ্ণব পদাবলীর মিল সাদৃশ্য। যেমন গ্রাম্য যুবতীর ভাষায় ভাওয়াইয়া গানে 'দোতরায় মোক করিছে বাড়ীছাড়া'- কথাগুলির সঙ্গে তুলনা করা চলে বৈষ্ণব পদাবলীর 'বাঁশীর শবদেঁ, বড়ায়ি, হারায়িলো পরাণী' কথাগুলির। রাধাকৃষ্ণের মাধ্যমে যুবক-যুবতীর নরনারী শাশ্বত বেদনা যেমন বৈষ্ণব পদাবলীতে লক্ষ্য করা যায়, তেমনি লক্ষ্য করা যায় অনুরূপভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর মতনই ভাওয়াইয়া গানে।

বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যে কৃষ্ণ যেমন নায়ক, তেমনি ভাওয়াইয়া গানের নায়ক প্রধাণত দুর্গম অরণ্যপথচারী মৈষাল। আবার উত্তর বাংলার দুস্তর পার্বত্য নদীর নৌকার মাঝিও ভাওয়াইয়া গানে নায়ক রূপে আবির্ভূতও হয়েছে। গ্রামের মাঝি নদীর তীব্র স্রোতের মধ্যে নৌকা ভাসিয়ে যে গান গায়, সেই গানে রিক্ত নারীদের বেদনার দীর্ঘশ্বাস ফুটে ওঠে। আসলে, মাঝিদের ঘরছাড়া জীবনের মধ্যে সম্ভবত প্রিয়ার বেদনাতুর মুখকে স্মরণ করেই তারা এরূপ গান বেঁধে থাকেন। যে গানে প্রকাশ পায় স্বামীসঙ্গ ছাড়া নারীদের বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাস —

নাইয়ারে —
চাপাও নৌকা কমলাসন্দরীর ঘাটে রে।
নাও বাইয়া যাও নাইয়া রে
তোর সে মনের সুখ।
ওরে, নায়র বাদাম তুলিয়া, নাইয়া রে,
দেখাও চান্দ মুখ রে,
মনে বড় সুখ নাইয়ারে,
চিত্তে বড় দুখ।
ওরে নদীর পাথারের মত
ভাঙ্গে নারীর বুক রে।।
নদীর মাঝে থাক নাইয়ারে
নায়েব কাণ্ডারী।

ওরে অভাগিনী নারীর নাইরে, নাইয়া,

যৈবনের ব্যাপারী রে।।

জীবন যতই কঠিন হোক না কেন, প্রেম যে চিরন্তন। কঠিন জীবনযাপনের মধ্যেও তাই কাঠ সংগ্রহ করতে এসে তিস্তা নদীর তীরে বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমিতে মৈষালদের সঙ্গে সাক্ষাতে এক প্রেমের ঝলকানি হৃদয়ের গভীরে দোল দিয়ে যায়। রাধার কাছে কৃষ্ণ যেমন পরম সখা, তেমনি গ্রাম্য যুবতীদের কাছে পরম বন্ধু মৈষাল। গ্রাম্য যুবতীকে কাঠ কেটে দিতে মৈষাল এগিয়ে এলে চকিতে মুখোমুখি দর্শন লাভ ঘটে এবং পরমুহূর্তে এক আত্মীয়ভাব জেগে ওঠে। প্রেমের আলোর ঝলকানির জন্যই তখন গ্রাম্য কুমারী অন্য গাঁয়ের মৈষালকে গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে বাড়ির পথে এগিয়ে দেবার জন্য মৈষালের হাত ধরে আকুতি জানাতে কুণ্ঠা বোধ করে না। প্রেমের আসল স্বরূপইতো এই — ভেদজ্ঞান লুপ্ত করে দেয়। এ কারণেই গ্রাম্য কুমারীমেয়ে পরপুরুষ ভিন গাঁয়ের মৈষালের হাত ধরতে কুণ্ঠিত বোধ করে না। অলক্ষ্যেই কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয় ঘটে যায় 'হৃদয়ে হৃদয় যোগ'। এখানে এরূপ একটি ভাওয়াইয়া গানের উদাহরণ তুলে ধরছি — যেখানে প্রেমের চিরন্তন রূপ প্রকাশ পেয়েছে কঠিন জীবনের মধ্যে এক চিল্‌তে আলোর ঝলকানি নিয়ে —

তিস্তা নদীর পারে পারে

ও মোর বাই গে;

না জানি মৈষাল বন্ধু মোর,

ভইষ চরেবার আসে।।

আজি খড়ি কাটিয়া দেরে মৈষাল,

বোঝা বান্ধিবার দে।

হাতধরোঁ, মিনতি করোঁরে মৈষাল,

মাথাত তুলিয়া দে।।

হাত ধরোঁ মিনতি করোঁরে মৈষাল

আজি আগ্‌বাড়েয়া দে।

আগে বাড়েয়া দেরে মৈষাল,

বাড়ীত পঁছেয়া দে।।

আবার, উত্তর বাংলার নদনদীর প্রকৃতির সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নদনদীর ভৌগোলিকভাবে প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকার জন্য যে ভাওয়াইয়া গানেও পার্থক্য এড়ায় না। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর "বাংলার লোকসাহিত্য (৩য় খণ্ড)" গ্রন্থে মূল্যবান কটি কথা বলেছেন

এ-প্রসঙ্গে, যা প্রণিধানযোগ্য — "উত্তর বাংলার মাঝি খরস্রোতে নদীর মাঝি, পূর্ববাংলার মাঝি ধীর স্রোতা নদীর মাঝি। পূর্ববঙ্গের মাঝির কণ্ঠে যে ভাটিয়ালি গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সুরে ধীর মন্থর গতির স্পর্শ অনুভব করা যায়, উত্তরবঙ্গের মাঝির কণ্ঠেই তাহার ব্যতিক্রম আছে। সেখানে স্বভাবতঃই তাহাতে একটু দ্রুততা আসিয়া যায়। উত্তর বাংলার নদীর রূপের মধ্যে প্রশান্তির ভাব নাই, ইহাদের ক্ষিপ্র গতির মধ্যে যে তাল ও ছন্দ ফুটিয়া ওঠে, তাহাই সেখানের সঙ্গীতের সুরেও প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ববঙ্গে নিম্নভূমির অন্তহীন বিস্তারের মধ্যে নদী গতিবেগ হারাইয়া ফেলে, সেইভাবেই সেই অঞ্চলে মাঝির কণ্ঠে যে ভাটিয়ালি সুর শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে গতিবেগ অনুভব করা যায় না। যেখানে গতি নাই, সেখানে তাল (**rythm**) -ও নাই; সেইজন্য ভাটিয়ালী সুরে তাল নাই; কিন্তু ভাওয়াইয়া গানের সুরে তাল আছে; ভাটিয়ালী ঢঙ্গের গান হওয়া সত্ত্বেও ভাওয়াইয়া দীর্ঘ টানগুলি ভাঁজে ভাঁজে খণ্ডিত হইয়া প্রবাহিত, ভাটিয়ালীর মত সরল রেখায় লম্বিত নহে। প্রকৃতির মধ্য হইতেই মানুষ তাহার গানের সুর খুঁজিয়া পায়; পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের নদনদীর প্রকৃতিগত পার্থক্যের মধ্যেই এই দুই অঞ্চলের মাঝির গানে এই পার্থক্যটুকুর সৃষ্টি হইয়াছে।"

পূর্ববঙ্গের রংপুর জেলার কটি ভাওয়াইয়া গান এখানে উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরছি যা থেকে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপরিউক্ত কথাগুলির অর্থবহ বোঝা যায়। যেমন ---

১. আসিক বন্‌দুরে --
পরের জন্নে কাঁদচে আমার মোন।
পরের জন্নে পরোকাল হারাইলাম,
তবু পরের মোন না পাইলাম . . . .
যায় বুঝি জেবোন।
আসিক বন্‌দুরে
পরের জন্নে কাঁদচে আমার মোন।
কি করিতে কি করিলাম
সুদা বুলি বিষ খাইলাম
আজি যায় বুজি জেবোন।
আসিক বন্‌দুরে
পরের জন্নে কাঁদচে আমার মোন।

২. আহা রে মোনের আশা
দুই জোনে বান্দিলাম বাসা

কিরে মজার দক্কিনারে হাওয়ার হাওয়া
একলার গাছ্ কাটিয়ারে
এনা ভুরা বানেয়ারে
যামোঁ হামরা সোনা বন্দুর বাড়ী।।

গান কয়া ভুরা বয়া
যামোঁ নদীর বাকে রে
যামোঁ হামরা অইনা বন্দুর বাড়ী।।

মোনের হাউসে বান্দিলাম খোপারে
আউলাইল বাতাসে।
দ্যাকিলে সোনা বনদু
জাগিবে আমার সনেরে
যাঁমো আমরা অইনা বন্দুর দ্যাশে।।

৩. এ পারে গাও ধেয় গোয়ালের নারী
ও পারে বইদো আচে চায়া,
না পাবু না খাবুরে বইদার
না পুরিবে তোর আশা
ওরে বইদো মিচায় আচিস্ তুই চায়া।

কি করে তোর উপে হে কইন্যা
কি করে তোর ক্যাশে
গুহে কইন্যা পাগোল করিলে মোক
তোর কালো মুকের হাসি রে।

কালো নদীত্ কুমীরের ভয়
মানুষ গরু ধরিয়া খায়
ওহে কইন্যা,
এই দরিয়া ক্যামনে হবো পার।

৪. ও পান সকিরে

ও পারে কামরাংগার গাচ

টিয়ায় কাটে বোটা।

চ্যাংড়ার সাথে করিয়া পিরীত

কুলোত্ হইলো খোটারে।।

ও পারে মণ্ডলের বেটি

শাগ তোলে বতুয়া

বুকের ওপরোত্ দুকনা জ্বলে

মানিকের কটুয়া।।

শাগ তুলবার গেই নোঁ দিদি

গইল ঘরের পাচে

কোন বা সাপে কামোড় মাল্লে

দুই উরাতের ফাঁকে।।

৫. কইন্যা রে . . . .

ময়া নাগেয়া ছাড়িয়া না যান মোরে।।

এ্যাতোই যদি কইন্যা ছিলো মোনে

এ ময়া নাগাইলেন ক্যানে।

তোর কইন্যার পীরিতির আশে

বাপো ভাই ছাড়িলাম সবে

পীরিত করি কইন্যা

ভাসাইলেন সাগরে।।

তোর কইন্যার পীরিতির চানা

ভাসি যাঁও সাগোরের ফ্যানা রে

তুমি বিনা ওহে কইন্যা

না দ্যাকি কিনারা।।

ভাওয়াইয়া গানে কেবলই নারীহৃদয়ের বেদনার গভীর অভিব্যক্তি প্রকাশ ঘটে বলেই নারীমনের একটি মাত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হলেও কিন্তু বৈচিত্র্যহীনতার নামগন্ধ নেই। বরং বলা যায়, নারীহৃদয়ের বেদনা প্রগাঢ় হওয়ার জন্যই ভাওয়াইয়া গানে একটি বিশেষ আবেদন লিরিক্যাল মেজাজে ফুটে ওঠে। এ কারণে ভাওয়াইয়া গান সুরের নিপুণ ক্রীড়ায় সহজেই শ্রোতাদের হৃদয়ের মর্মমূলে পৌঁছে যায়। যা সার্থক সঙ্গীতের বিশেষ গুণ। এই গুণের জন্যই ভাওয়াইয়া গান আজো গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষদের কাছে আদরণীয়। কবির কথাতেই আছে, বেদনার মধ্যে দিয়েই জীবনের মধুরতম সঙ্গীতের সুর বেজে ওঠে – **'Our sweetest songs are those that telleth of saddest thought'**. ভাওয়াইয়া গান করুণ রসের জন্যই বাংলার লোকসঙ্গীতের মধ্যে মধুরতম।

তবে, ভাওয়াইয়া গানে নারীই কেবল গায়িকা তা নয়, পুরুষরাই নারীর অন্তর্বেদনাকে ভাষা দিয়ে গান বাঁধে, গায়ও। তবে, গানের বিষয়বস্তু কিন্তু নারী কেন্দ্রিক। ভাওয়াইয়া গানের কথা কত মর্মস্পর্শী এবং কত হৃদয়কে সহজেই ছুঁয়ে যায় এক অনাবিল বেদনার করুণ রসে আপ্লুত করে, এবং কত মধুরতম তার দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি গান এখানে তুলে ধরছি। যা ঠিক বৈষ্ণবীয় প্রধান পদরচয়িতার রচনার কথা মনে করিয়ে দেয়। যেমন —

ও পতিধন, প্রাণ বাঁচেনা যৈবন জ্বালায় মরি –

সখিরে, মনোকে বুঝাব কত!

সখিরে, চিতোকে বুঝাব কত!

আজি আকাশেতে নাইরে চন্দ্র কি করে তার তারা,

যে নারীর সোয়ামী নাইরে দিনে আঁধিয়ারা।

তোলা মাটির কলা যেমন রে হল্‌হল্‌ ফল্‌ফল করে,

ঐ মতন নারীর যৈবন দিনে দিনে বাড়ে রে!

সখিরে . . . .

খোপেতে যে নাইরে কাইতর কি করে তার খোপে,

যে নারীর সোয়ামী নাইরে, কি করে তার রূপে,

সখিরে . . . .

এই গানটি বিশেষ করে উল্লেখ করচি এই কারণে, এখানে বাউলগানের সুর বিদ্যমান। দেহতত্ত্বও এখানে বিদ্যমান। কিন্তু নারী হৃদয়ের বেদনার অভিব্যক্তির চরম প্রকাশ ঘটেছে। এই বেদনাবোধ আমরা পাই বৈষ্ণবপদাবলীর রচয়িতাদের পদাবলী গীতেও।

তবে, ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে যে বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহৃত হয় সেই দোতারা যন্ত্রটি তারযন্ত্র, সাধারণত কাঠের তৈরী। চারটি তার সংযুক্ত আছে। তবে দুটি তার অঙ্গুলির স্পর্শ পায় বলেই

যন্ত্রটি দোতারা নামে পরিচিত। ওয়াকিল আহমেদ তাঁর "বাংলার লোক-সংস্কৃতি" গ্রন্থে 'দোতারা' সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রেখেছেন। এখানে তা উল্লিখিত করছি। তিনি বলেছেন, "একতারার মত দোতারা এক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। তারের কম্পনের সুরধ্বনি ওঠে। জনপ্রিয়তার দিক থেকে বাঁশীর পর দোতারার স্থান। 'ডই' এর মতো দেখতে কাঠের মূল কাঠামর সহিত তার ও চামড়া জুড়ে যন্ত্রটি তৈরী করা হয়। তার ও চামড়া ছাড়া এক অন্যান্য অংশ কান, ঘোড়া, ফেসি ও সটি। কাঠের ফ্রেমের প্রশস্ত অংশ বা 'তলা' ছাগলের বা গুঁই সাপের চামড়া দিয়ে আবৃত করা হয়। যন্ত্রের মাথায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাঠি যুক্ত থাকে, আঞ্চলিক ভাষায় এগুলিকে কান, পাখরা বা কেড়কি বলে। কান ঘুরিয়ে সুরের লয় ঠিক করতে হয়। তার বাঁধা থাকে তলার শেষ প্রান্তে ফেসি নামে একটা লোহা বা পিতলের চাকতির সাথে। চামড়ার ছাউনির উপরে মাঝামাঝি জায়গায় অর্ধচাপের আকৃতির এক টুকরা কাঠ বা হাড় থাকে। এর নাম ঘোড়া। ফেসি থেকে তারগুলি ঘোড়ার উপর দিয়ে কাঠামর মাঝ বরাবর গিয়ে কানের সাথে বাঁধা থাকে। দোতারার অপর একটি অংশ কটি। এটি গরু-মহিষের শিং, হাড় বা কাঠের একটা চ্যাপটা টুকরা। রংপুরে এর নাম 'চুটকি', অন্যত্র তা 'খুটনি' নামে পরিচিত।"

দ্যোতারার পরিমাপ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আনুমানিক দু'হাত লম্বা হালকা এ বাদ্যযন্ত্রটি বাম হাতে আড়াআড়িভাবে ধরে ডান হাতে কটির ঘর্ষন দিয়ে বাজান হয়।" তিনি আরও কটি মূল্যবান কথা বলেছেন এ যন্ত্রটি সম্পর্কে -- "নামানুসারে দোতারার তারের সংখ্যা দুটি হওয়া উচিত, কিন্তু আসলে তার কোথাও চারটি, কোথাও ছ'টি।" তবে, সাধারণতঃ চারটি তারই বেশীভাগ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। এই চারটি তার সম্পর্কে ওয়াকিল আহমেদ মহাশয় বলেছেন, "ধ্বনির দিক থেকে তারের চারটি ভাগ --- জিল তার, সুর তার, কম তার ও গম তার। এসব তার থেকে 'ওদারা', 'মুদারা' ও 'তারা' সুর ধ্বনিত হয়।"

বাংলা একাডেমী ঢাকা কর্তৃক নিয়োজিত নিয়মিত সংগ্রাহকরা দোতারার অবশ্য চারটি তারের নাম দিয়েছেন এরকম--- "কম, টন, টিল ও সরুয়ালী"। তাঁদের মতে, "বাম 'মোটা' সুর, টানে 'চিকন' সুর, টিলে 'ছোট' সুর এবং সরুয়ালীতে 'চড়া' সুর তোলা হয়।"

তবে, ভাওয়াইয়া গানে দোতারা সাধারণত বাজনা হলেও এর সঙ্গে বাঁশী এবং জুড়িও থাকে। ভাওয়াইয়া গান ছাড়াও জাবি, মুর্শিদী ও কবিগানেও দোতারার প্রচলন আছে। দোতারার প্রাচীনতম উল্লেখ 'পদ্মপুরাণে' পাওয়া যায়। আঠার শতকের কবি আলী রজার 'ধ্যানমালা' সঙ্গীতগ্রন্থে দোতারার উল্লেখ আছে। বসন্ত-রাগের সহিত তালসঙ্গত হিসেবে যে সব যন্ত্র বাজে দোতারা তাদের মধ্যে একটি। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির মতনই মৈষালের দোতারার সুর পল্লীবালাদের গৃহছাড়া করে। ভাওয়াইয়া গানে কথাতেই তা লক্ষণীয় ---

ও মোর মৈষাল বন্ধু রে,

না বাজান তমান খুটা রে দতারা।

নারীর মনমোর করিল রে ঘরছাড়া।।

ওর এ্যাখেতে সুতারো বাইজন রে;

কি না সুরে বাজে।

তোর দোতরার বাইজন শুনি

মন না অয় মোর ঘরে রে।।

দোতারা ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে অনিবার্য বলেই ভাওয়াইয়া গানকে আবার দোতারার গানও বলা হয়।

যদিও অন্য কোনো লোকসঙ্গীতে দোতারার প্রচলন দেখা যায়। তবে দোতারার অনিবার্যতার জন্য স্বভাবত ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ-কথা বলেছেন, "ভাওয়াইয়া গানের জন্যই দোতারার জন্ম হইয়াছে।" তবে, উত্তর বাংলার পুরুষ সমাজ দোতারা বাজিয়ে ভাওয়াইয়া গান গেয়ে থাকেন। স্ত্রীসমাজে যে গান প্রচলিত আছে তার অধিকাংশের মধ্যেই নৃত্য সংযুক্ত থাকলেও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার নেই। কেবল প্রয়োজনে নৃত্যের তাল বজায় রাখার জন্য তালি বাজানোর রেওয়াজ আছে।

ভাওয়াইয়া গানে নায়ক বৈষ্ণবপদাবলীর কৃষ্ণ বা কানুর পরিবর্তে গ্রামীন 'চ্যাংরা' বা যুবক। গানেতেই তা উল্লিখিত —

এমন মন মোর করে রে, বিধি, এমন মন মোর করে,

মনের মতন চ্যাংরা দেখি ধরিয়া পালাও দূরে,

রে বিধি নিদয়া।

বৈষ্ণবপদাবলী কাব্যে কৃষ্ণের বাঁশীর সুর শুনবার জন্য রাধা উন্মুখ হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি ভাওয়াইয়া গানেও চ্যাংরা বন্ধুর গান শুনবার জন্য পল্লীবালার মনও উন্মুখ হয়ে ওঠে। যেমন —

ঢেঁকি কো কাটিম রে,

ছাইলা কো পুতিম রে,

কেম্‌নি শুনিম্ মুএঃ্ এঃ চ্যাংরা বন্ধুর গান রে।

তবে, ভাওয়াইয়া গানে প্রেমের আকুতি ও আর্তির মধ্যে যে সত্যটি প্রকাশ পায় তা হলো, রক্তমাংসের প্রণয়ীর মর্মরূপের প্রকাশ। কোথাও দেবতার স্থান নেই। এখানে একটা কথা বলা বোধকরি উচিত হবে, পল্লীবালাদের যে মনোবেদনা বার বার উঠে এসেছে বিরহের জ্বালা নিয়ে তা পরবর্তীকালে বাংলা আধুনিক কাব্যেও প্রভাব সঞ্চার করেছে। রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কাব্যের 'ব্যক্ত প্রেম' কবিতাটির শেষ তিনটি পংক্তির মধ্যে প্রেমের বিরহ ও মনোকষ্টের যন্ত্রণা পাই তা ভাবের দিক থেকে ভাওয়াইয়া গানের সমতুল বলা যেতে পারে। যেমন —

ভালোবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে, একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভাবের মাঝে বিবসনাবেশে।

প্রেম যে চিরন্তন, এবং বিরহের মধ্য দিয়েই যে প্রেমের সার্থকতা ও সিদ্ধি ভাওয়াইয়া গানের এ-ভাবনা রবীন্দ্রনাথের "শেষের কবিতা"তেও লক্ষ্য করা যায়। তবে, "শেষের কবিতা"য় এ-ভাবনা রবীন্দ্রনাথ কেবল নায়কের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। তফাৎটা এখানেই। ভাওয়াইয়া গানে পল্লীবালার মাধ্যমে প্রকাশ ঘটেছে, "শেষের কবিতা"য় অমিতের মাধ্যমে - তফাৎটুকু এখানেই। কাজেই বলতে কুণ্ঠা নেই, প্রেমের অনিন্দ্যসুন্দরের কথা রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর কাব্য ও গানে বহুলভাবে এক-একটি উজ্জ্বল প্রস্ফুটিত পদ্মের মতন ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি মাঝে-মধ্যে প্রেমের বিরহের ও মনোবেদনার যন্ত্রণার দীপ্ত স্বরূপটিকে নিপুণ হাতে অঙ্কিত করেছেন। কাজেই, ভাওয়াইয়া গানের লোকসঙ্গীতের যে সুর ও ভাব তা রবীন্দ্রনাথের হাতেও সিদ্ধিধাতা গণেশের মতন নিপুণভাবে সার্থক হয়ে উঠেছে। কেবল পরিবর্তিত রূপ পেয়েছে ভাষার ম্যার-পাঁচের কবি মানসের দার্শনিক-সত্ত্বার আলোকে আলোকিত হয়ে।

ভাওয়াইয়া গান সম্পর্কে ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর "বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস" গ্রন্থে সুন্দর কতকগুলি কথা বলেছেন। কথাগুলি আমার কাছে যথার্থ বলে মনে হয়েছে। তিনি বলেছেন — "ভাওয়াইয়া প্রেম সঙ্গীত হওয়া সত্ত্বেও রাধা কৃষ্ণের প্রসঙ্গ এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেনি। কথায় বলে 'কানু ছাড়া গীত নেই, সেই কানুর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হবার সুবর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ভাওয়াইয়া গানে রাধা-কৃষ্ণের বিষয়কে প্রায় সযত্নে পরিহার করে যাওয়া হয়েছে। আর তার ফলে এই গানের অকৃত্রিম মানবিক আবেদন বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে।"

"সপ্তর্ষি" পত্রিকার অষ্টম বর্ষের (মাঘ-চৈত্র, ১৩৭১) সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয় "উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য" শীর্ষক দীর্ঘ নিবন্ধে উত্তরবঙ্গের প্রচলিত লোকসঙ্গীত বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে 'ভাওয়াইয়া' শব্দের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, "ভাব শব্দটি থেকে ভাওয়াইয়া শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ভাব+ইয়া প্রত্যয় যোগে ভাবিয়া, তার থেকে হয়েছে ভাওয়াইয়া। অর্থাৎ যে গানের সুর এবং বিষয়বস্তু অন্তরকে দোলা দেয়, ভাবিয়ে তোলে।"

যদিও 'ভাওয়াইয়া' শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে বিতর্ক আছে। কারো কারো মতে কোচবিহার, দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের বাউ দিয়া সম্প্রদায়ের নামানুযায়ীই শব্দটির উৎপত্তি। বাউ দিয়া হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় শ্রেণীর মানুষ নিয়ে গঠিত যে যাযাবর সম্প্রদায়, সেই সম্প্রদায়ের গানই হলো ভাওয়াইয়া। তবে, যতই বিতর্ক থাকুক না কেন, রমেন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয়ের যুক্তিকেও খণ্ডন করা যায় না। বরং তাঁর অভিমতে সঠিক যুক্তি আছে এই কারণে

যে, ভাওয়াইয়া গানের সুর ও বিষয়বস্তু সত্যিই অন্তরকে দোলাও যেমন দেয়, তেমনি ভাবিয়েও তোলে। সম্ভবত এই কারণে বলা যায় ভাওয়াইয়া গান আজো জনপ্রিয়তা হারায়নি। আজো ভাওয়াইয়া গান গীত হয়, এবং শ্রোতাবৃন্দকে মুগ্ধ করে।

আবার, ভাওয়াইয়া গানে সংকীর্ণ ধর্মান্ধতার পরিবর্তে যে স্বচ্ছ ও উদার মানসিকতার তীব্র ভাব লক্ষ্য করা যায় তা কেবল আমাদের বিস্মিতই করে না, মুগ্ধও করে। সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধিশূন্যতার অনেক ঊর্দ্ধে উঠে ভাওয়াইয়া গানের কবি যেন বিশ্বমানবতা মুখীন এক প্রেমলোকের সন্ধানে সদা সচেতন বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। ধর্ম যেন সেখানে একদেহে লীন। উত্তরবঙ্গের একটি ভাওয়াইয়া গানে বিভিন্ন দিকে প্রণাম নিবেদন প্রসঙ্গের মধ্যে যা লক্ষণীয় —

আমরা পছিমে বন্দনা করি গো
আমরা আল্লাবী-ধাম।
তাহারি কারণে তাহারি চরণে
আমরা জানাইলাম সেলাম।
আমরা উত্তরে বন্দনা করি গো
ঐ না দেবী মায়ের চরণ,
তাহারি কারণে আমরা জানাইলাম প্রণাম।
আমরা পূরব বন্দনা করি গো
ঐ না ধর্ম নিরঞ্জন,
তাহারি চরণে আমরা জানাইলাম সেলাম।
আমরা দক্ষিণে বন্দনা করি গো
ঐ না ক্ষীর নদী-সাগর,
সেখানে হারাইছে সেরা আলি খেলাড়ি পাথর।।

এই গানটিতে লক্ষণীয় হলো, পশ্চিম দিককে 'আল্লার ধাম' বলে কবি সেলাম নিবেদন করেছেন, তেমনি আবার প্রণাম জানিয়েছেন উত্তরে 'দেবী মা'য়ের চরণের উদ্দেশ্যে। ভাওয়াইয়া গানের এ-ভাবনা অবশ্য বাউল গানে বেশ তীব্রভাবেই লক্ষ্য করা যায়। বাউলদের কাছে হরি ও আল্লা এক। কোনো প্রভেদ নেই। বলা যায়, ভাওয়াইয়া গানের ও বাউল গানের 'ঈশ্বর' বা 'আল্লা' সম্পর্কে যে ভাবধারা তা সঙ্গীত রচয়িতাদের উৎকৃষ্ট মানসিকতা ও বিশুদ্ধ আত্মারই পরিচয় বহন করে। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলা বোধকরি উচিত হবে, ভাওয়াইয়া গানের ভেতরে সমাজ সচেতনার যেমন তীব্র প্রতিফলন ঘটতো, তেমনি প্রতিফল ঘটতে দেখা যায় রচয়িতাদের ধর্মীয় সচেতনতার।

আলকাপ গান

মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও রাজসাহীতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একশ্রেণীর লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে, তার নাম আলকাপ। এই গানের দুটি অংশ — গান ও ছড়া। এই গানের মৌলিক বিষয় বস্তু হলো রাধাকৃষ্ণ। তবে, দু'এক স্থলে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী নিয়েও রহস্যময় কাহিনীর কথাও উল্লেখিতভাবে উঠে আসতে দেখা যায়। ফকির বিষয়ও এ গানে উঠে এসেছে। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এ গান যে এককালে খুব জনপ্রিয় ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছড়ার অংশে অবশ্য সমসাময়িক অনেক ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গে তেমন উল্লেখ নজরে আসে না। আলকাপ গানের মধ্যে রাঢ় অঞ্চলের সংগৃহীত ঝুমুর গানের সাদৃশ্য বেশ নজরে আসে। ঝুমুর গানের মতনই আলকাপ গানে একটা লিরিক্যাল ব্যাপার চোখে পড়ে। আলকাপ গানগুলিতে প্রেমই মুখ্য বিষয়। প্রেমের মধ্যেই মান-অভিমান, ব্যথা-বেদনা ও আনন্দ সব কিছুরই প্রকাশ ঘটেছে। এই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক আলকাপ গানগুলিতে কবিত্বশক্তির উৎকর্ষতা চোখে পড়ে শব্দ শৃঙ্খলায় ও প্রতীকী ব্যঞ্জনে। এখানে কটি প্রেম বিষয়ক গান দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরছি —

১. বলে কানুর বাঁশি বাজিল রে।
সুর ও সোহাগে মন মাতিল রে।
পুলকে পুলকে উথলিয়া প্রেমে গদগদ হ'ল হিয়া;
মরমে মরমে আকুল প্রাণে,
আমার মনে ঘন ঘন বাজিল রে।

২. আমি কার তরে সাজালাম রে, কুঞ্জফুল সাজ দিয়া।
সুখের নিশি প্রভাত হ'ল, আমার এল না কালিয়া রে।
ধেরজ ধরিতে নারি, বল সখি কিবা করি,
প্রেম আগুনে জ্বলে মরি, আমার শ্যামের লাগিয়া রে

৩. পীরিতের কি রীতি রে, মন দিয়া মন পেলাম নাক তার।।
গোপনেতে প্রেম করেছি জানে না তা কেউ,
প্রতিদানে পেলাম শুধু বিরহেরই ঢেউ,
সাধের আশায় বাধ সাধিল রে সরল প্রাণে আমার।
মন জড়িত যৌবন বনে গুঞ্জরিবে অলি,

মন মাতান সুরে আমি করব সদা ঢুলি;
নিঠুরতা করে সে কুজন এল নাক আর।।

৪. কত দেখলাম সেধে সেধে
হলাম না তার মনের মতন রে।
এ দুঃখ দিল পদে পদে।।
তোর জন্যেতে পাগল পারা বেড়ায় বনে বনে,
তুমি যা বলেছ তাও শুনেছি, তবু ঝোলা দিলে স্কন্ধে।
তোর মানের দায়ে যোগী সেজে রে, ভিক্ষা মাগি সদনে;
আমি নাপিতের বেশ ধরেছি রে
তব আলতা দিলাম পদে।।

৫. প্রাণ বন্ধুরে, তোমার আশায় জীবন করলাম ক্ষয়।
যে দেশেতে ঘুরি ফিরি পাড়ার লোকে করে দোষী।
আমার সকল মন্দ কয়, তোমার আশায় জীবন করলাম ক্ষয়।।
তোমার ঘরে মনে প'লে ঘরের জলকে বাইরে ফেলে,
আমি যমুনাতে যাই, তোমার আশায় জীবন করলাম ক্ষয়।।

৬. স্বপনে ছিল গো, স্বপনে ছিল গো,
তোমাকে দিয়া যাব আমার পরাণ।
আমি যদি জলকে আসি একবার উঠি একবার বসি,
বাঁশীতে দিয়ে টান তোমারে দিয়ে যাব আমার পরাণ।।
কালা যখন বাজায় বাঁশী, ঘর হইতে বাইরে আসি,
নয়নে দিয়া টান তোমায় দিয়া যাব আমার পরাণ।

৭. প্রাণের দেবতা গো তুমি আসিলে রজনী প্রভাতে।।
বনমালা গলে নেপুর চরণে তাই,
বনের কোকিলা মাতে আসিলে রজনী প্রভাতে।
প্রাণেরই দেবতা তুমি, রূপেরই প্রতিমা।
মেঘের বিজলী সম দিলে মোরে দেখা,

মুখে মধুর হাসি, সেও তো কালা শশী।
মোহন বাঁশরী হাতে আসিলে রজনী প্রভাতে।
পাগল করেছ আমায় শির শির মন্তরে।
পরনে তো পীতধড়া দেখা দিলে মোরে।
মাথায় ময়ূর পাখা সেও তো কালো সখা।
মোহ বাঁশরী হাতে আসিলে রজনী প্রভাতে।

৮. আমারে না পড়ে তোমার মনে, হে বন্ধু,
দূর বিদেশে গিয়া।।
আমি আয়নাতে না দেখতে পেলাম তোমার সোনার মুখ।
হাল্‌কা বাতাসে যেন মনে পড়ে দুখ।
বুঝালে না বুঝে পরাণ, বুঝাই তারে কি দিয়া,
নিশীথে জাগিয়া।।
বন্ধু থাকে দূর বিদেশে, আমি থাকি পাগল ভ্যাসে,
বুঝালে না বুঝে পরাণ, বুঝাই তারে কি দিয়া,
নিশীথে জাগিয়া।।

৯. এই বাঁশীতে ডাকে কে শুনেছি সে আজ
মোর পরাণ কাড়িতে চায়।
সে রাখাল রাজ মোর, পরাণ কাড়িতে চায়।।
তার কাছে যেতে যদি কাঁটা ভঁকে পায়।
শাশুড়ী ননদী মুখে কালি দিতে চায়।
তবে নিকটে যাব না মানি সমাজ মোর,
পরাণ কাড়িতে চায় সে রাখাল-রাজ।
যাক কুল যাক মান ক্ষতি নাহি তায়,
এ পুড়া পরাণ আমি সঁপিব তার পায়।
মিটাইতে সাধ মিছে না মানি কো লাজ,
মোর পরাণ কাড়িতে চায় সে রাখাল-রাজ।

১০. আমি বন্ধুর লাগিয়া হইলাম আকুল, বন্ধু মেলা বড় দাই-গো,

ভূধর, কন্দর, সরিত, সাগর খুঁজিয়া নাহিক পাই গো,

আমি বন্ধুর লাগিয়া . . . . . .।

দুর্গম অটবী মাঝে বন্ধু নাই মন বলে,

গগন-বলাকা চাঁচর কেশ বন্ধুর ঝলে

হায় গো বন্ধু কোথায় আছে;

জলে নাই বন্ধু, স্থলে নাই বন্ধু, আছে বুঝি ঘরে,

পবন নন্দন করিয়া ভ্রমণ বন্ধুরে না পেলে শেষে।

বলি রাজা দানে বাউনে ব্রাহ্মণে, পাতালে যাইল শেষে,

বলি হায় গো তবে কোথায় পাব?

আমি কোথা গেলে বন্ধু পাব, হায় গো, তবে কোথা পাব!

করিয়া প্রণয় বিবাদ বাড়ে, কি ভাবে তুষ্ট জানিব কি করে,

কি করে জানাব কি ভাবে সন্তুষ্ট বন্ধু, কি করে জানিব।

মনের ভিতরে হৃদয় মাঝারে বন্ধু আছে বুঝি হায় গো।

আমি বন্ধুর লাগিয়া হইলাম আকুল, বন্ধু মেলা বড় দাই গো।

এ রকম বহু দৃষ্টান্ত রাখা যেতে পারে। উপরিউক্ত গানগুলিতে লক্ষণীয় ব্যাপারটি হলো, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমের কথা যেমন উঠে এসেছে আলকাপ গানে, তেমনি ব্যক্তিগত লৌকিক-প্রেমের দর্পণটিও উদ্‌ভাসিত হয়েছে। তাই আলকাপ গান সহজেই হৃদয়কে স্পর্শ করে। বুকের গভীরে আনন্দ-বেদনা, মান-অভিমানের এক শিহরণ জাগায় মধুর প্রেমের রস আস্বাদনের! এই আলকাপ গানের সূক্ষ্ম ও রুচিপূর্ণ মধুর প্রেমের সুখানুভূতির স্পর্শের রঙ লাগাতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে। যেমন —

তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে!

জানি না কি মরণ নাচে, নাচে গো ওই চরণমূলে!

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক আলকাপ গান আবার গীতি-নাট্যের আকারে লেখা হতো, এবং অভিনীত হতো। যাদুবিদ্যার প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও কিন্তু এই আলকাপ গানগুলিতে ধর্মীয় প্রভাব থাকতো। রাজসাহীর সংগৃহীত এরূপ গীতি-নাট্যের আকারে লেখা দুটি অংশ এখানে তুলে ধরছি —

১. কৃষ্ণ ঃ আমি এসেছি রাধে,

অভিমান আর কর না

একবার নয়ন মেলে দেখ না।।
শুন ওগো রাধে পেরি
কেন কর মন ভারি,
আজ কে দিয়েছে মনের বেদনা।
গিয়েছিলাম দূর বনে
আসতে দেরি সেই কারণে
আজ ঘুচাব তোমার মনের বাসনা।।

রাধা ঃ সহে না সহে না সহে না
বিরহ আজ বাজে পরাণে,
বিরহ বিচ্ছেদ জ্বালা,
তুমি কি বুঝিবে কালা
রাখাল মনের সরম কিজানে।।

২. বৃন্দে ঃ হরি, করি হে প্রণাম তোমার চরণে
তোমার ঐ চরণের দাসী আমি হে
একবার দেখ ও নয়নে।।
ধর ধর পত্র ধর
তুমি হে শ্যাম নটবর
তুমি রাজা বিচার কর হে
বিচার করবে না কেনে।
কি লিখেছ কমলিনী
পড়ে দেখ চিন্তামণি
ও তোমার মধুর সুখের বাণী হে
আমি শুনিব কানে।।

কৃষ্ণ ঃ বল কে তুমি ধনি, চিনি না তোমায়
তুমি কার রমণী সুবদনী হে
বল যাবে হে কোথায়।।
চিনতে নারি কার রমণী

নাই তোমার সঙ্গের সঙ্গিণী
দেখি তোমায় একাকিনী হে
তোমার সঙ্গে কেহ নাই।
কেবা তোমার মাতাপিতা
বল ধনি যাবে কোথা
তুমি যুব-নারী কেমন করে হে
বল এসেছ হেথায়।।

'মূল্যায়ণ' পত্রিকার ১০ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় (১৩৮১) মানিক সরকারের "বাংলা লোকনাট্যের ধারা ও আলকাপ" নামে যে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে, সেই লেখাটিতে মানিকবাবু মুর্শিদাবাদের জনাব মোহাম্মদ নৈনুদ্দিন মণ্ডলের কাছ থেকে সংগৃহীত করে যে আলকাপটি মুদ্রিত করেছেন, সেই গানটিতে সরস্বতীকে বন্দনা করে আলকাপটির সূচনা। এই পালাটিতে সঙ্গীত যুক্ত, কিন্তু নাচের নামগন্ধ নেই। এর গদ্যের সংলাপও লক্ষণীয় ব্যাপার! আলকাপটিতে পুরুষ শাসিত সমাজেরই প্রভাব পড়েছে বোঝা যায় মোড়লকে সাক্ষী রেখে পালাগানটিতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কে বড়? -- এই বিতর্কে! মোড়ল যদিও দু'পক্ষকেই তুষ্ট করতে চেয়েছেন। তবে শেষমেষ পুরুষকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

ডঃ সুভাষ বন্দোপাধ্যায় তাঁর "বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি" গ্রন্থে আলকাপ গানের ক্রম অবনতির সম্পর্কে বলেছেন -- "আলকাপ গান ক্রম অবনতির পথে অগ্রসর হয়ে প্রথমত ছড়া ও তারপর রং-পাঁচালীতে পরিণত হয়েছে। রং-পাঁচালী নিতান্ত লৌকিক স্তরের লঘু রচনা, ছড়ার ধর্মই এতে প্রাধান্য লাভ করে, কোন কোন ক্ষেত্রে নাটকীয়তাও থাকে। সামাজিক আচার ব্যবহারের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অসঙ্গতির কথাও নাট্যাকারে প্রকাশ পায়। স্ত্রী পুরুষের দ্বৈত গীত সংলাপই এর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।" তিনি স্ত্রী পুরুষের দ্বৈত গীতির একটি উদাহরণ হিসেবে একটি গীত তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেটি এখানে তুলে ধরছি -

স্ত্রী -- পূজার সময় জামাই আনতে হবে।
শুন হে খুকীর বাপ ভাত রাঁধব তবে।।
পুরুষ -- পূজার সময় জামাই আনতে বলছ আমায় সুন্দরী
এ বছরের ব্যাপার দেখে আমি যে ভেবে মরি!
নূতন জামাই আনলে কিবা খেতে দিবে।
স্ত্রী -- এলো মেলো ত্যাজ্য ক'রে জামাই হাজির কর।
নইলে তুমি পূজার দিনে বাড়ী হতে সর।

এই দ্বৈত গীতিই পরবর্তীকালে যাত্রা ও বাংলা নাটককে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে গিরীশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে এর প্রচ্ছন্ন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

ডঃ সুভাষ বন্দোপাধ্যায় আলকাপ গান ও তার পরিবেষন সম্পর্কে আরো কতকগুলি কথা বলেছেন বিস্তৃতভাবে। তাঁর অভিমত হলো, "আলকাপ গানে ধর্মীয় প্রভাব একটা খুব বেশী পরীলক্ষিত হয় না, তাই অনেক সময় অনেক রুচি বহির্গত বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। আলকাপের সাধারণত এক একটি দল থাকে এবং তার মধ্যে একটি কিশোর এবং অপর একটি বালককে কিশোরী সাজান হয় এবং এই কিশোর কিশোরী নৃত্যগীতের মাধ্যমে গীত ও কাহিনী পরিবেষন করে। এই কিশোর ও কিশোরী অনেক সময় স্বামীস্ত্রী সেজে অনেক রঙ্গ ব্যঙ্গমূলক বিষয় পরিবেষন করে এবং শ্রোতা ও দর্শকদের লঘু পরিহাসমূলক কৌতুকপ্রদ কাহিনী বা বিষয় উপহার দেয়। দলের এই দুজন ছাড়া আর প্রায় সকলেই দোহারের কাজ করে। পুরুষ ও নারীবেশে বালকদ্বয়ের দ্বৈতসংগীত ও সংলাপ-এর মধ্যে তারা ধুয়া ধরে এবং কখনও কখনও ছড়া কাটে। আলকাপের বিষয় সাধারণতঃ লঘু ও সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত হলেও রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ, রামায়ণ -এর বিষয়, নানা পুরাণের বিষয়, শিব ও অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য ইত্যাদি পালার বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হয়েছে। কতকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে আলকাপের পালাগুলি রচিত, যেমন, প্রারম্ভে বন্দনাগীত বা আসর বন্দনা, গীত, ঠেস পাঁচালী, রং-পাঁচালী, ছড়া, উক্তি, প্রত্যুক্তি ইত্যাদি, সমসাময়িক ঘটনা ও পৌরাণিক বিষয় ছাড়াও প্রেম ও মানবজীবন সম্পর্কের নানা বিষয়ের রচনাও আলকাপে লক্ষ্য করা যায়।" সুভাষবাবুর কথাগুলি থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার তা হলো, আলকাপের বৈচিত্রময়তা। এত বৈচিত্র ও ঐশ্বর্যশালীর জন্য আলকাপ গান ও ছড়া পরবর্তীকালে বাংলা নাটককে প্রভাবিত করেছিল বলা চলে। অত্যাধিক সাহিত্যগুণের জন্যই আলকাপ গান ও ছড়া এত ঐশ্বর্যশালী বলা যেতে পারে। তৎকালীন বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার একটি সামাজিক জীবনের প্রতিবিম্বিত রূপই হলো আলকাপ গান ও ছড়া। আলকাপের মধ্যে দ্বৈত চরিত্রের কথা কাটাকাটি ও উত্তর - প্রত্যুত্তরের মধ্যে যে অসম্ভব নাট্য গুণ প্রকাশ পায় ---- তাই -ই বাংলা নাটককে আকৃষ্ট করেছিল। এখানে নাটকীয়তায় ভরপুর এরূপ একটি আলকাপের উদাহরণ রাখছি সুভাষবাবুর গ্রন্থটি থেকে —

পারী।। মাঝি পার করে দে, দেরী সহে না
শ্বশুড়বাড়ী হতে বাপের বাড়ী যেতে মন ত মানে না।।

মাঝি।। আমি ঝড় তুফানে পার ত দিব না
নদীর গাং জল করে ঢলমল
হলফাতে জল তরী ও মানে না।।

পারী।।　　　পার করে দে রে মাঝি পয়সা নে হাতে।
আমার মাঝি কাজের কাজি আছে এক ঘাটে।।
আমি নারী, তুমি আনাড়ী, ওহে মাঝি ভাই।
এবার তরী ছাড়লে পরে বুঝিব তোমায়।।
মাঝির বেটা মাঝি রে, তোর নৌকায় নাইরে জুত
ভাঙ্গা নায়ে পার করিতে কিবা পেয়ে ছিল জুত।।
মাঝি বসে বসে বুঝ।।

মাঝি।।　　　উৎপাত করিস নে, ধনি বেলা যেতে দে
তোর লেগে রেখেছি তরী জুড়ে আড়ে।।
আমি যখন- নৌকা ছাড়ি দেইরে পাল।।
উজান যখন নৌকা ছাড়ি ধরি তখন গুণ।
ধনি আমার কথা শুন।।

কাজেই, সুভাষবাবুর কথা মেনে নিয়ে বলতে আমাদের এতটুকুন কুণ্ঠাবোধ করে না, "আলকাপ গান আসলে বাংলাদেশে প্রচলিত লোক নাটকের একটি রূপ। লোকনাটকের যে সমস্ত লক্ষ্মণগুলি নির্দ্ধারিত হয়েছে আলকাপ গানের এবং পালার মধ্যে তার সবগুলিই পরিলক্ষিত হয়।"

আলকাপ গানের বন্দনা গীতগুলি কিন্তু কখনো-কখনো একক ভাবে গীত হয়, কখনো আবার সমবেত কণ্ঠে জুড়ি দলও গেয়ে থাকেন।

আলকাপ ছড়াগুলি যে মূলত রাধাকৃষ্ণ বা রামসীতা বিষয়ক আখ্যায়িকা গীতগুলিকে অনুসরণ করে তর্জার আকারে লৌকিক ছড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের এ অভিমতও মেনে নিতে কুণ্ঠা নেই। এখানে একটি আলকাপ ছড়ার দৃষ্টান্ত রাখছি কিছু অংশ তুলে ধরে —

ধন্য তুমি কলির ছেলে--- জানাই গো প্রণাম।
জানাই গো প্রণাম সভাতে করিব সেলাম।।
দাদা! গরীব ভাইদের দুঃখ দেখে বাঁচেনা পরাণ,
ইহার চেয়েও দুঃখ পায় শিক্ষিত যে জন গো।
চাকরী করবে বলে ছেলে, পিতা তাদের দেয় স্কুলে।
ছেলেরা চাকরী করব বলে, তারা ডিগরী ধরে নিলে গো।

সরকার একটা চাকরী দিল,
মনে ভাবে ভাগ্য ভাল।
উপরে 'ব্যাকিং' যাদের ছিল,
তারা চাকরী কেরে নিল গো
তখন মনের দুঃখেতে, তারা বেড়ায় কেঁদে কেঁদে।।
দাদা! অজন্মা হইল দেশে 'টেষ্ট-রিলিফ' আসিল,
ম্যাট্রিকেরা ভাগ্য বলে মহুরা হইল গো।
খাট্‌ছে লোক হাজার হাজার,
দেখতে লাগে কি চমৎকার।
মজুর একশ মাটি কেটে
একটা টাকা লবে খেটে গো।
কাগজ কলম নিয়ে মহুরা,
জরিপ কর্‌তে যান বাবুরা।
বেটারা দশ মাটি কমায়,
তারা মজুরকে কাঁদায় গো।
'শ্লিপ' করতে গিয়ে মহুরা,
আট-দশজন বাড়ায় তাঁরা।
মজুরকে বলে দুটো নিও,
বাঁকি ছ'টা আমায় দিও গো।
টাকা পয়সা নিয়ে তারা,
বাড়ী চলে যায় মজুররা।

রাধাকৃষ্ণ লীলা অবলম্বনে ছড়াগুলিও বেশ মনোরম। এখানে উদাহরণ রাখছি —

রাধা উক্তি —

আমি ভরা যমুনাতে, পার হব কি মতে,
বসে বসে তাহা ভাবি
মাঝি হে — ওহে মাঝি—
তোমা বিনে, ভাই, পার করবার কেউ নাই,
অস্ত যাচ্ছে সন্ধ্যা রবি।।

কৃষ্ণ উক্তি —

চড়, কন্যা, নৌকা পরে, হাল ধরিব শক্ত করে,
ভয় করোনা রাজার কুমারী—
চার বৈঠা বাইয়া জোরে, পৌছে দিব ওই পারে,
বল বল, কন্যা, কি নাম তোমার হে।

রাধা উক্তি —

নামটি আমার রাধারাণী, সখা আমার ছিল জ্ঞানী,
হারাইলাম বিজন বিপিনে —
মাথাতে তার চূড়া ছিল, সখা আমার কোথায় গেল,
যাব আমি সেইখানে হে।

কৃষ্ণ উক্তি —

শোন বলি রাজনন্দিনী, তুমি আমার ধ্যানের ধনী
হারাইলাম বনের মাঝারে —
দেখা তোমায় পাব বলে, চলে এলাম নদীর কূলে
বসে আছি মাঝি রূপ ধরে হে।

রাধা উক্তি —

প্রিয় তুমি কি কারণে, ফেলে আস্‌লে বিজন বনে
সত্য করে বল তাই আমারে —
ষোলশো গোপিনীর কথা, মনে পড়েছিল সেথা,
তাই তে বুঝি ফেলে এসেছিলে হে।

কৃষ্ণ উক্তি —

শোন বলি, রাজনন্দিনী, তুমি আমার প্রেমের খনি
রাধা নামটি সকলের উপরে —
তাইতে তোমায় মাথায় করে, বেড়ায় কলি-দ্বাপরে
বসে আছি নদীর কিনার হে।

সিরাজদৌল্লা বলে,　　　　যুবতীর দলে

তোরা কৃষ্ণভক্ত হবি।।

আমি ভরা যমুনাতে,　　　　পার হব কি মতে,

বসে বসে তাহা ভাবি।।

এই রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক গানটিতে কৃষ্ণ উক্তির মধ্যে প্রেমের জন্য নদীর কিনারে বসে থাকার কথা যে ব্যক্ত হয়েছে স্রেফ প্রেমের হাতে ধরা দেবার জন্যেই, অর্থাৎ রাধা মিলনের কামনার কথাই ব্যক্ত হয়েছে। এই শাশ্বত প্রেমের চিরকালীন স্বরূপটিকেই কবি রবীন্দ্রনাথ সাড়া জীবনব্যাপি উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন বলেই তিনিও প্রেমের জন্য বসে থাকার কথা ব্যক্ত করেছেন তাঁর ''গীতাঞ্জলি''র একটি গানে —

প্রেমের হাতে ধরা দেব

তাই রয়েছি বসে;

আলকাপ ছড়াগীতিও বাংলা নাটককে যে খুব প্রভাবিত করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি, রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক ছড়াগীতিও পর্যন্ত। গিরীশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ থেকে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও নাট্য-অভিনেতা শম্ভু মিত্রের ''চাঁদ বণিকের পালা''তেও এ রীতি লক্ষণীয়।

ইতিপূর্বে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক ছড়ার গীতির পূর্বে আলোচ্য নিবন্ধটিতে যে ছড়াটির কিছু অংশ তুলে ধরেছি, সে ছড়াটির কথা মনে পড়ে যায় না'কি ''চাঁদ বণিকের পালা''য় যখন শুনি ছড়ার এ-ভঙ্গি --

সূত্রধরগণ।।

দক্ষিণ পাটনে যায় চাঁদ সদাগর।

গাঙ্গ ছাড়ি পশিলেন দুস্তর সাগর।।

নাবিকেরা চায়্যা দেখে ভুমি বা কোথায়

পিছনে তটের রেখা দূরে সর‍্যে যায়।

সম্মুখে প্রচণ্ড ঢেউ ফণা তুল্যে আসে।

সপ্তডিঙ্গা নিয়্যা যেন খেলে অট্টহাসে।।

আথালি পাথালি পড়ে দুরন্ত সাগর।

তারি মধ্যে থির থাকে চাঁদ সদাগর।।

তবে, এখানে লক্ষণীয় ব্যাপারটি হলো, উক্ত ছড়াটিতে পয়ারের ত্রিপদীতে প্রকাশ। ভাবেও ব্যঞ্জনার দিক থেকে কিন্তু লোকসাহিত্যের আলকাপ ছড়ার কথাই মনে করিয়ে দেয়। এইরকম নাট্যরস আলকাপ ছড়া ও গীতেও লক্ষ্য করা যায়। চাঁদ বণিকের পালাতে শুধু আলকাপ কেন, অন্যান্য লোকসঙ্গীত ও ছড়ার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যকার শম্ভু মিত্র "চাঁদ বণিকের পালা" নাটকটিতে শুধু লোকসঙ্গীতের ঐতিহ্যকে তুলে ধরেননি, লোকসংস্কৃতির অজস্র উপকরণকে সঙ্গে-সঙ্গে জনসমক্ষে হাজির করে আধুনিকতার দৃষ্টিভঙ্গি তে লোকসংস্কৃতির ধারার সঙ্গে বর্তমানের এক মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন বলা যেতে পারে। সাহিত্যের গুণগত ও রসের মেলবন্ধনের সঙ্গে জীবনবোধেরও!

এমনকি, কলকাতা মহানগরীর কথাও 'আলকাপ গানে' উঠে এসেছে। যেমন —

মা, মা, তোর জামায়ের বাড়ী আমি তো যাব না;

তোর জামায়ের বাড়ীর ঠেলা দূরের ঘাটে জল আনা।

শাশুড়ী ননদ বসে থাকে এক কুলো ধান কেউ ঝাড়েনা,

তোমার জামাই কোলকাতাতে চাকুরী করে

বছর অন্তর একদিন ফিরে,

সারা রাত্রি কাগজ মারে, ডাকলে কথা কয়না।।

গানটির বক্তব্য এখানে পরিস্কার — বিবাহিতা এক নারী তার মায়ের কাছে বলছে সে আর শ্বশুড়বাড়ীতে যাবে না। তার শ্বশুড়বাড়ীতে না যাবার অনেক কারণ আছে। প্রথমত বাড়ীর সব যাবতীয় কাজ তাকে করতে হয়। অনেক দূর থেকে জল আনা, ধান-ঝাড়া সে একাই করে। শাশুড়ী ও ননদ কেউ-ই তাকে কোনোভাবেই সাহায্য করে না। এক কুলো ধান ঝেড়েও না। তবে স্বামীগৃহ ত্যাগ সম্বন্ধে যে শেষ কথা যেটি বলেছে সেটিই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা। তা হলো স্বমীর সঙ্গসুখ থেকে সে বঞ্চিত। বছরে কেবল একদিন স্বামী গৃহে ফেরে। কাজেই একদিনের জন্য স্বামী বাড়ীতে এসে তার নিজ ব্যক্তিগত কাজের জন্য সদা-সর্বদা ব্যস্ত থাকে। ফলে, স্ত্রীর সঙ্গে দুটো কথা বলার ফুরসত পায় না। স্বামীর সঙ্গসুখ না পাওয়ার জ্বালাই তার কাছে অধিক বেদনাদায়ক। কায়িক পরিশ্রম যে কেউ নারীই মুখ বুজে মেনে নিতে পারে, যদি স্বামীর সঙ্গসুখ বা সোহাগ যদি সে যথোপযুক্ত পায়। যদি এটুকুই না পেল, তবে স্বামীর গৃহে থাকার দরকার কি? স্বামী যে বছরে একদিনের জন্য বাড়ীতে ফেরে তার কারণ হিসেবে গানটিতে বলা হয়েছে যে কলকাতায় চাকরী করার জন্য কলকাতাবাসী বলে। চাকরীর জন্য স্রেফ কলকাতাবাসী হওয়ার জন্য গ্রাম্য বধূটি মনোবেদনার তীব্র জ্বালাই প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত। কাজেই মহানগরী কলকাতা গ্রাম্য বধূটির জীবনে এক দুঃসহ জ্বালার মূলত কারণ। কলকাতাবাসী হওয়ার জন্যই গ্রাম্য বধূটি তার স্বামীর সঙ্গসুখের নায্য দাবী থেকে যে বঞ্চিত

সে আভাসটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

আলকাপ গানে এরকম বহু ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কি সামাজিক গার্হস্থ্য জীবনের, কি রাজনৈতিক! মোদ্দাকথা, জীবনের দ্বন্দ্বসংকুল ঘাত-প্রতিঘাতের নিপুণ যে চিত্রণ আমরা আলকাপ গানে পাই — এ দিকটিই পরবর্তীকালে আধুনিক সাহিত্যকে আকৃষ্ট করেছে। কাজেই আমরা নিঃসন্দেহে এ কথা অনায়াসে বলতে পারি, ভাষা-ব্যঞ্জনে সে যুগের আলকাপগানের রচয়িতাদের তেমন আধুনিক বলে স্বীকার নাও করি — মনের দিক থেকে অর্থাৎ মানসিকভাবে তারা কিন্তু ছিলেন আধুনিক একথা বলা অন্যায় হবে না।

বারমাস্যা গান

বারমাস্যা গান বা বারমাসী গান হলো সাধারণতঃ বর্ণনামূলক প্রেমসঙ্গীত। কেউ কেউ এ গানকে 'বারোষা' ও 'বারাষে' নামেও চিহ্নিত করেছেন। বারাষে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ রকমের আছে। এর মধ্যে আবার কতকগুলি কাব্যগুণগত মান বিচারে বেশ উচ্চস্তরের। এই গানেও বিভিন্ন রকমের পদ ও পালা লক্ষ্য করা যায়। এ গান সাধারণতঃ ভাটিয়ালী সুরেই গাওয়া হয়।

বারমাসীর উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে ডঃ ডুসান জ্বাবিতেল যা বলেছেন তা বেশ যুক্তি-বিচারে নির্ভরযোগ্য বলা যেতে পারে। তিনি বলেছেন —"the Baromasi originated in falk-poetry; that owing to its intrinsic attractviness and its great popularity in Bengali, it found a place again and again in the classical literature, being, of course, always reshaped and remoulded by various poets according to their poctic aims, imagination and creative ability; at the same time, however, it followed its own course of development in folk-poetry itself, being influenced in its turn by those forms and types creative in the sphere of art literature especially in Vaishnava poetry."

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতে (বাংলার লোকসাহিত্য ৩য় খণ্ড) —"সমগ্র বৎসর বা বারমাস ব্যাপী পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক পটভূমিকায় প্রধানতঃ প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার মনোভাবের অভিব্যক্তিই বারমাসীর বর্ণনামূলক সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। প্রেমে নৈরাশ্যের ভাবটিই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। সেইজন্য ইহা বিরহ-বিচ্ছেদের গান; তথাপি বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনা ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া ভাবমূলক প্রেম-সঙ্গীতের মত ইহাদের মধ্যে ভাব-গভীরতা নাই। ইহার চিত্র-প্রধান রচনা একান্ত সুগভীর ভাবকেন্দ্রিক নহে।"

বৎসরের বিভিন্ন মাস হতেই বারমাস্যার সূচনা হয়। তবে, অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ মাসেই অধিক বারমাস্যা বা বারমাসীর সূচনা হয়ে থাকে 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৩৪ সনের ৪র্থ সংখ্যায় (২৭ শে ভাগ; ১ম খণ্ড) "গ্রামীণগীতি কবিতায় বারাষে" নামে একটি প্রবন্ধে হিরন্ময় মুন্সী 'বারাষে' প্রসঙ্গে আলোচনা কালে সুন্দর কটি কথা বলেছেন — 'বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের বৈকালে যখন খররৌদ্রের তাপ অস্তগামী সূর্যের সহিত ক্ষীণ ও মলিন হইয়া আসে, তখন মাঠে মাঠে 'সবুজের ছড়াছড়ির মাঝখান হইতে এই গানের সুরের রেশ 'গাজুড়ান' বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া কেমন যেন পাগল করিয়া তোলে।

মাঠে নিড়ানী বা টাঙ্গি দিতে দিতে সারিবন্দী ভাবে দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়া বসিয়া মাথাল মাথায় সমবেত চাষী 'পরিয়াত'গণ মিলিতকণ্ঠে এই গান গাহিতে থাকে। তবে বাঁশের আড়বাঁশীতে এই গান শোনায় ভাল।''

সারাদিনের ক্লান্তি মাথায় নিয়ে এই গান প্রকৃতির স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে খেটে-খাওয়া মানুষদের কাছে নিয়ে আসে যেন অবসর বিনোদন। প্রকৃতির সিঞ্চিত রূপতৃষ্ণা সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে বারমাস্যা গানগুলিতে ভাব-ব্যঞ্জনে-চিত্রকল্পে কবিত্বশক্তিতে যা অতুলনীয়। কিছু কিছু বারমাস্যা গান ভাব-ব্যঞ্জনে এত উৎকৃষ্ট যে নিঠোল বিশুদ্ধ এক-একটি লিরিক্যাল কবিতা বলে মনে হয়। বুকের ভেতরে সদা-সর্বদা সঙ্গীতের মূর্ছনায় অনুরণিত হয়। এখানে একটি মেদিনীপুর জেলার বারমাস্যা গান তুলে ধরছি, গানটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বৈশাখ মাসের বর্ণনা দিয়ে আরম্ভ হয়ে গানটি শেষ হয়েছে চৈত্রমাসকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ বাংলা মাসের বারটি মাসেরই রূপ ও প্রকৃতির সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে গানটিতে। বাংলার বারটি মাসের প্রকৃতির রূপ-বিভা অঙ্কন করে গ্রাম্য কবি ফুটিয়ে তুলেছেন তার শিল্পের রঙ ও মাধুর্য দিয়ে নিপুণভাবে বাৎসরিক একটি দলিল। স ম্পূর্ণ চিত্রধর্মী একটি কবিতা। বৈষ্ণবীয় কবিদের ভাবধারায় প্রেম সেখানে মুখ্য। বৈষ্ণব পদাবলী গীতের মতন বিরহ-বেদনারও আভাস বিদ্যমান। প্রকৃতির বাৎসরিক রূপ - বিভাষ সঙ্গে মনোবেদনার করুণ আর্তি ফুটে উঠেছে। যা আশ্চর্যসুন্দর! গানটি এখানে তুলে ধরছি --

নাথ, আমার ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।

বৈশাখে বসন্ত জ্বালা, ছেড়ে গেল চিকন কালা,

আমরা নারী হই অবলা

কেমন করে রহব ঘরে,

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।।

জ্যৈষ্ঠেতে যমুনার জলে, ডেকেছিলে রাধা বলে,

শাড়ীর না আঁচল ধরে,

কতই না কাঁদাত মোরে,

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।।

আষাঢ়ে দু'কূল জল, পদ্ম ভাসে টল মল,

হত যদি গাছের ফল

আঙানী আনত ঘরে।

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে

শ্রাবণে বরিষা, রাম ছাড়া হলেন সীতা,

আমার বাদী কে বা ছিল,

আমার পতি নিল হরে,

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।।

ভাদ্রে ভাবি দিবা-নিশি, নয়নের নীরে ভাসি,

আমি নারী হই রূপসী,

কেমন করে রহব ঘরে।

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।।

আশ্বিনে আনন্দ মাসে বন্ধু রইল পরবাসে

আমি নারী হই অবলা,

কেমনে করে রইব ঘরে।

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।।

কার্তিকে কালিকা পূজা, বাবুগণের রং তামাসা,

আমি নারী শূন্য ঘরে,

পতি নাহি পালঙ্কের উপরে।

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।।

অঘ্রানেতে নতুন ধান, ঘরে ঘোচাবে মান

কাল বেঁধেছি রবির ধান,

ষষ্ঠী-রম্ভা ধারণ করে।

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।।

পৌষে পরমসুখী বন্ধু হলেন পরবাসী

আমার বাদী কেবা ছিল,

আমার পতি নিল হরে।

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।।

মাঘেতে মাঘ বসন্ত, ফুরাহল মনে ভ্রান্ত,

আমার কান্ত এলো না ঘরে

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।।

ফাল্গুনে ফাগুয়া খেলি,　　　　ডেকেছিল রাধা বলি,

খাট পালঙ্ক ত্যজ্য করি,

কবে পতিকে আনবো ঘরে।

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।।

চৈত্রেতে চড়ক যাত্রা,　　　　ফুরাইল মনের ভ্রান্ত,

আমার কান্ত এলোনা ঘরে

নাথ আমারে ছেড়ে রইল গিয়ে দেশান্তরে।।

এরকম বারমাস্যা গান সম্ভবত কবি রবীন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বার বার ঋতু-প্রকৃতি রূপ-গন্ধ-বর্ণ নিয়ে উঠে আসা থেকে এ অনুমান করে নিতে বোধ করি অসুবিধে নেই যে, কবি বারমাস্যা গানে ঋতুর অধিক ব্যবহার দেখে ভাবনালোকে গেঁথে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্র-ভাবনার কাব্যলোকে তাই দেখি বিভিন্ন ঋতুর সৌন্দর্যলোকের অপরূপ বীণার ঝঙ্কার বার বার ধ্বনিত হয়েছে নানা রূপ ও রঙে। কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সকল ঋতুর অবয়ব রূপ-গন্ধ-বর্ণ নিয়ে উঠে এসেছে বলেই না তাঁকে 'ঋতুরাজ কবি' বলতে আমাদের কোনো কুণ্ঠা নেই। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত সব ঋতুকেই কবি অভিবাদন জানিয়েছেন তাঁর কাব্যবীণার সুরে সুরে।

'সৌরভ' পত্রিকায় ১৩৩৪ সনে (১৫শ বর্ষ; ১০ম সংখ্যায়) বারমাস্যা গানের স্বরূপ সম্পর্কে সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন সুধী সমালোচক — "পরিবর্তমান প্রাকৃতিক পটভূমিকায় বিরহিনী নারীর সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে।" অর্থাৎ তিনি বারমাস্যা গানের দুটি উপাদানের কথা বলেছেন — প্রকৃতি বর্ণনা ও মনোবিশ্লেষণ। সাধারণতঃ এই দুটি উপাদানের সমন্বয়ে রচিত বারমাস্যা চোখে পড়েনা। পল্লী কবিরা সাধারণতঃ যে কোন একটি উপাদানকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বারমাস্যা গান রচনা করেন। এখানে এরূপ একটি গান দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরছি। গানটি মৈমন সিংহের। গানটিতে আর একটি ব্যতিক্রম ব্যাপার নজর কাড়ার মতন। গানটি জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে শুরু হয়েছে —

জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট ফল, আষাঢ় মাসের নূতন জল,

শ্রাবণ মাস কাটাইল নারীর নাইয়রে নাইয়রে,

আরে নাইয়রে।

তিন মাস গত অইল, রুপুন সাধু না আসিল,

আস্‌লা বন্ধু, রইলা কার মন্দিরে।

কত পাষাণ বান্‌ছরে সাধু বৈদেশে।

ভাদ্র মাসে আওলা কেশ, আশ্বিন মাসে বর্ষ শেষ,
কার্তিক মাস কাটাইল নারী কাতরে কাতরে,
আরে কাতরে।
ছয় মাস গত অইল, রুপ্তন সাধু না আসিল
আস্‌লা বন্ধু, রইলা কার মন্দিরে ?
কত পাষাণ বান্‌ছরে সাধু বৈদেশে।
আগুন মাসে দাওয়া মারি, পৌষ মাসে শীত ভারী;
মাঘ মাস্যা শীত নারীর অন্তরে অন্তরে
আরে অন্তরে।
নয় মাস গত অইল, রুপ্তন না আসিল
আস্‌লা বন্ধু, রইলা কার মন্দিরে
কত পাষাণ বান্‌ছরে সাধু বৈদেশে।
ফাগুন মাসে দ্বিগুণ জ্বালো, চৈত্রমাসে শরার কালা,
বৈশাখ মাসে অইল নারীর যৌবন উতলা;
বার মাস গত অইল, রুপ্তন সাধু না আসিল
আস্‌লা বন্ধু, রইলা কার মন্দিরে।
কত পাষাণ বান্‌ছরে, সাধু, বৈদেশে।

মৈমনসিংহের এই গানটিতে লক্ষনীয় ব্যাপার হলো, গানটির প্রথম দিকে না এসে শেষ দিকে এসেছে বৈশাখের কথা। এরকম নিয়মের ব্যতিক্রম বারমাস্যার অনেক গানেই লক্ষ করা যায়।

'সৌরভ' পত্রিকার ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ন (১৫শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা) "নালিতার বারমাস্যা" নামে যে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে, সেই নিবন্ধটিতে আবার বলা হয়েছে — "ময়মনসিংহ জিলার কৃষকদের বর্তমান পাটই একমাত্র সম্বল। নালিতার সহিত তাহাদের সুখ দুঃখ এমনিভাবে জড়িত যে একমাত্র এই ফসলের ভাল মন্দেই তাহাদের হৃদয় আনন্দ বা বিষাদে ভরিয়া যায়; ঘরে ঘরে স্বামী স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের বাৎসরিক যাবতীয় মিটান উহারই উপর নির্ভর করে।" মোদ্দাকথা হলো, নালিতা উৎপাদনে যাবতীয় কাজের মধ্যে সুখস্বপ্নে বিভোরতাই হলো এই বারমাস্যা গানের প্রধান বিষয়। এরূপ একটি গান এখানে তুলে ধরছি

পৌষনা মাসেতে ভাইরে পুষ্প অন্ধকারী।
নাল্যার লাগ্যা গিরস্থেরা না লয় ঘর বাড়ী।।
(দিশা ও নিলকে, শরীল করলাম কালারে ভাই
নাল্যা নিড়াইতে।
মাঘনা মাসেতে ভাইরে ক্ষেতে নিলাম আল,
লাঙ্গল ভাঙ্গলাম জোয়াল অঙ্গলাম আরও ভাঙ্গলাম ফাল।।
ফাল্গুনা মাসেতে ভাইরে ক্ষেতে নিলাম মই।
দুর্ব্বায় ভেদাল্লায় কয় আমরা যাইবাম কই।।
চৈত্রিনা মাসেতে ভাইরে রবির বড় জ্বালা।
নাল্যা ক্ষেতে গোবর ফালতে শরীর করলাম কালা।
বৈশাখ মাসেতে ভাইরে নাল্যার ফাললাম আলি
নাল্যা বেচ্য কিন্যা আনলাম অউজের লাগিল বালি।
নাল্যা যে নিড়াও গো তুমি ধানত নিড়াও না।
গোসা কর্‌য়া বইয়া থাকবাম ভাত রান্‌তাম না।
জ্যৈষ্ঠিনা মাসেতে ভাইরে নাল্যার আইল্যা পড়ে আগা।
নাল্যা বেচ্যা কিন্যা আনবাম ভাউজের লাগ্যা তাগা।
আষাঢ় মাসেতে ভাইরে নাল্যার লইল ফুল
নাল্যা বেচ্যা কিন্যা আনবাম ভাউজের লাগ্যা নাক্কুল।।
ভাদ্রনা মাসেতে ভাইরে নাল্যার লইল আলি।
নাল্যা বেচ্যা কিন্যা আনবাম ভাউজের লাগ্যা বালি।
নাক্কুল দিলা যেমন তেমন বালি দিলা ভাঙ্গা।
তোমার ঘাড় ঠেঙ্গ থইয়া আমি বইবাম হাঙ্গা।।
আশ্বিন মাসেতে ভাইরে বাড়ীর করলাম ঠাট।
ছয় দেউড়ী ছাড়াইয়া ভাউজে লার ত যায় পাট।।
অগ্রাণ মাসেতে ভাইরে সবে নয়া খায়।
নাল্যা বেচার যত টাকা খাজনা ফাজনায় যায়।
ও নিলকে শরীল করলাম কালারে ভাই
নাল্যা নিড়াইতে।

এ বারমাস্যাটি সম্পর্কে ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী তাঁর "বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস" গ্রন্থে যে কথা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য — "এই বারমাস্যাটি যে প্রাচীন, পৌষ মাস থেকে গণনার রীতিতেই তা প্রমাণিত। দ্বিতীয়তঃ বারমাস্যায় সচরাচর প্রকাশিত বিষয়কে বর্ণনা করার পরিবর্তে ভিন্নতর বিষয়কে বর্ণনা করায় অভিনবত্ব সঞ্চারিত হয়েছে। বাস্তবতার উষ্ণ স্পর্শজাত উদ্ধৃত বারমাস্যাটি সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট না করে পারে না।" যথার্থই বলেছেন বরুণবাবু। 'চৈত্রিনা মাসেতে ভাইরে রবির বড় জ্বালা', 'নাল্যা ক্ষেতে গোবর ফালতে শরীর করলাম কালা'— এই পংক্তি দুটিতে চির বাস্তবতাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন গানটির রচয়িতা। বিশেষ করে যখন গানটির মধ্যে পাই এরূপ পংক্তির উচ্চারণ -- 'আষাঢ় মাসেতে ভাইরে নাল্যার লইল ফুল', 'আশ্বিন মাসেতে ভাইরে বাড়ীর করলাম ঠাট' বা 'ছয় দেউড়ী ছাড়াইয়া ভাইজেলার ত যায় পাট' ইত্যাদি পংক্তিতে।

রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বনে রচিত বারাষে বা বারমাস্যা গান সহজ সরল সাদামাটা প্রকাশ ভঙ্গিতে কত মধুর তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখছি ---

বসন্ত বৈশাখে রাধা ভাবিত সদায়
কৃষ্ণের বিরহ প্রাণে সহন না যায়।
বলিয়া গেলেরে কৃষ্ণ 'আসিব ত্বরিত'
বিলম্ব দেখিয়া নিরীক্ষণ করি পথ।
জ্যৈষ্ঠের যন্ত্রণা যত সহন না যায়,
ঘিয়ের অনল ওঠে জ্বলিয়া সদায়।
আষাঢ়ে নবীন মেঘ ডাকে গরজিয়ে,
এত দুঃখ দিলি বিধি মোর মাথা খেয়ে।
শ্রাবণে অশেষ দুঃখ হেন নাহি মোর মনে,
এ ছার জীবন আমি রাখি কি কারণে।
ভাদ্দরে ভরিল জলে যমুনার কূল,
তাহাতে উঠিল ফুটি কমলের ফুল।
ভ্রমর ভ্রমরী যেমন মধু করে পান,
এই মত ছাড়িয়া গেছেন শ্রীকৃষ্ণ আমার।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা প্রতি ঘরে ঘর,
আনন্দের অবধি নাই গোকুল নগর।
কার্তিকে করিলেন প্রভু বৃন্দাবনে রাস,

কৌতুকে বসেছেন কৃষ্ণ গোপী চারিপাশ।

অগ্রহায়ণে অশেষ দুঃখ হেন নাই মোর মনে,

অনুক্ষণ পড়ে মনে নন্দসুত ধনে।

পৌষ মাসের পীড়া ওঠে বিপরীত,

প্রভুর বিরহ শীতে তনু হয় কম্পিত।

মাঘ মাসে মোর মরণ হত সেও ছিল মোর ভাল,

শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া যবে মথুরাতে গেল।

ফাল্গুনে ফুটিল যত নানাবিধ ফুল,

ভ্রমর ভ্রমরী ডাকে একে সমতুল।

চৈত্রেতে চিন্তিত রাধা চিত্ত নাহি রে স্থির,

অসুসুর রামধন . . . . . পিরীত।

অক্রুর হারিয়া নিল রথে নারায়ণ,

ফিরিয়া না দিলে কৃষ্ণ আমার দরশন।

শ্রীকৃষ্ণ পেয়েছিলাম অতি বড় সাধে,

ছাড়িয়া গেলরে কৃষ্ণ কোন অপরাধে।

এটি একটি বিরহ প্রেমসঙ্গীত। যদিও বারমাস্যা সাধারণতঃ বিরহ সঙ্গীত রূপেই পরিচিত। তবে, বারমাস্যা গানে প্রকৃতি বর্ণনা ও মনোবিশ্লেষণ যেমন আছে, তেমনি আছে জলবৃষ্টির গণনাও পর্যন্ত। যেমন ---

চৈতে থর থর -- বৈশাখে ঝড়পাথর।

জ্যৈষ্ঠে তারা ফুটে -- তবে জানবি বর্ষা বটে।।

পৌষে গরমি, বৈশাখে জাড়া।

প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া।।

বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়।

সে বৎসর বর্ষা হবে খনায় কয়।।

চৈতে হেরানি, বৈশাখে জাড়া।

প্রথম জ্যৈষ্ঠে ভরবে গাড়া।।

ডাক বলে এ তিন বাণী, আষাঢ় শ্রাবণ নাইকো পানি।।

বারমাস্যা গানে যেমন আমরা রাধার বিরহ বেদনার কথা, তেমনি পাই সীতার বনবাসের দুঃখ বর্ণনাও। বন্দিনী সীতার বারমাসের অন্তর্বেদনার পরিচয়ও পর্যন্ত পাওয়া যায়। আবার পাওয়া যায় রাম-লক্ষ্মণের দুঃখ-দুর্দশার কথাও।

বারমাস্যা গানে বিভিন্ন নামাঙ্করণের নজর কাড়ে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ও কাহিনী অবলম্বনে। যেমন --- রাধার বারমাস্যা, তোয়াবলী কন্যার বারমাস্যা, নীলার বারমাস্যা, শান্তির বারমাস্যা ইত্যাদি। মূল চরিত্রকে কেন্দ্র করেই যেহেতু রচিত, সেহেতু বারমাস্যার গানে সেই মূল চরিত্রের নামানুসারেই চিহ্নিত হয়। যেমন রাধার ব্যথা-বিরহ-বেদনা ঘটনার পারম্পর্যে রচিত গানগুলিকে রাধার বারমাস্যা বলা হয়। তোয়াবলী কন্যার বারমাস্যার তোয়াবলী বা তোয়া নায়িকারই নাম; নীলা নায়িকার নাম অনুসারে রচিত হয়েছে নীলার বারমাস্যা। কিন্তু শান্তির বারমাস্যা শান্তির ঘোষনা বার বার ধ্বনিত হয়েছে। এখানে একটি শান্তির বারমাস্যা তুলে ধরছি ---

ইয়ত না কার্তিক মাসে, আরে শান্তি, ধানে ভরে ক্ষীর,
শান্তি কন্যার যৌবন দেখে আমার প্রাণটি না হয় স্থির।
স্থির কর সাউধের কুমার, আরে, শান্ত কর মন,
কাউল্‌কা জলেরে যাইতে আয়ে অইব দরশন।।
সোনার বাটায় কাষ্ঠরে গিলা, আরে কুমার, রূপার বাটায় তেল,
ধীরে ধীরে শান্তি গো কন্যা, আরে জলের ঘাটে গেল।
জলভর যৈবতী কন্যা, আরে জলে দিছ মন,
কাইল যে কইছ্‌ল্যাম কথা আছে নি স্মরণ।
আছে আছে সাউধের কুমার, কুমার আরে, আমার মনে লয়,
হায়রে, পরথ্‌ম্ বয়সেরি (গো) যৈবন সু স্বামীর ধন।
ইয় মাস বাড়াইলে শান্তি, শান্তি আরে, না পুরাইলে আশ,
নর রঙ্গ ছুরত (রে) লইয়া সাম্‌নে অগ্রাণ মাস।
অগ্রাণ না মাসেতে শান্তি দ্বিতীয়ার চান্দ,
দেখা দিয়ে রাখ গো শান্তি, আরে, নগরের পরাণ।
ওষুধ নয় সে জানিরে কুমার, কুমার আরে, মন্ত্র নয় সে জানি,
কি দিয়া রাখিবাম গো আমি নগরের পরাণি?
ইয় মাস বাড়াইলে শান্তি, শান্তি আরে, না পুরাইলে আশ।
পৌষ না মাসেতে শান্তি পুষ্ণ অন্ধকারী,

আজকার রাত্রিতে, শান্তি, (তোমার) যৈবন করবাম চুরি।
পার্‌বে পার্‌বে সাউধের কুমার, কুমার আরে, গায়ে আছে বল,
তোর গলায় কলসী বান্ধ্যা আরে জলে ডুব্যা মর।
আরে, দুয়ারে বান্ধিয়া রে রাখবাম্‌ গজমন্ত হস্তী,
সঙ্গেতে জাগন্তরে রাখবাম আরে নবলক্ষ দাসী।
আরে, পাড়িয়া মারিবাম্‌ লো আমি গজমন্ত হস্তী,
ডপাড়ে পলাইয়া যাইব, আরে, নবলক্ষ দাসী।
আরে, তুমি অইও গাঙ্গের জলগো, শান্তি আরে,
আমি আনবাম আড়ি,
সেই আড়ি গলায় গো বান্ধ্যা জলে ডুব্যা মরি।
চাইর পর রাত্রির মধ্যে যে চুরার নাগাল পাই,
কান্‌ডা কাটিয়া গো আমি চন্ডিরে বুঝাই।
ইয় মাস বাড়াইলে শান্তি, শান্তি আরে, না পুয়াইলে আশ,
মাঘা না মাসেতে শান্তি, শান্তি আরে, দ্বিগুণ পরে শীত,
শীতল পাটী বিছাও আন্যা শিয়রের বালিশ।
শিতান বালিশ পৈতান বালিশ, হায়রে, বালিশ লইলাম বুকে,
হায়রে, আভাগ্যা দারুণ রে বালিশ, আরে, মুখে রাও না করে।
ইয় মাস বাড়াইলে শান্তি, শান্তি আরে, না পুরাইলে আশ।
ফাল্গুন না মাসেতে শান্তি রবির বড় জ্বালা,
আম ডাল ভরসা করে কুয়িলমে বাসা।
ডিম্‌ পার, বাচ্চারে তোল, তোল দুইলা ছাও,
বিধুকালে যথায় মরণ, আরে, তথায় চল্যা যাও।
ইয় মাস বাড়াইলে শান্তি, শান্তি আরে, না পুরাইলে আশ।
চৈত্র না মাসেতে, কুমার, চাষায় বুনে বীজ,
আনত কডরায় ভইরা খাইয়া মরি বিষ।
আর, বিষ খাইয়া মরতাম আমি জানত বাপ মায়,
তবু না সপিব যৈবন ভিন্ন পুরুষ ঠায়।

ইয় মাস বাড়াইলে শান্তি, শান্তি আরে, না পুরাইলে আশ।
বৈশাখ না মাসেতে কুমার, কুমার আরে, নবীন নালিতা,
আরে, সকলেই যে তোলে শাক্ গো আমার আঙ্গিন থিত।
রান্ধিয়া বাড়িয়া শাক্ গো ডাল্যা লইলাম পাতে,
আপন পতি নাই গো গৃহে হুইদ করবাম কাতে।
ইয় মাস বাড়াইলে শান্তি, শান্তি আরে, না পুরাইলে আশ।
জ্যৈষ্ঠ না মাসেতে কুমার গাছে পাক্না আম,
আপন পতি নাইগো বাড়ীত খাইত গাছের আম।
আম খাইত কাড়ল খাইত, আরে, খাইত গাভীর দুধ,
জোড় মন্দির ঘর বইয়া, আরে, কৈত কৌতুক।
ইয় মাস বাড়াইলে শান্তি, শান্তি আরে, না পুরাইলে আশ।
আষাঢ় মাসেতে কুমার, কুমার আরে, গাঙ্গে নয়া পানি,
হায়রে, হাঁসা হাঁসি করে খেলা উজানয় আর ভাটী।
সাকল্য জীবন রে হাসি, আরো, বনের পঙ্খী হইয়া,
সঙ্গে উড় সঙ্গেরে পড় আপন পতি লইয়া।
ইয় মাস বাড়াইলে শান্তি, শান্তি আরে, না পুরাইলে আশ।
শ্রাবণ না মাসেতে, কুমার, (আর) জলৈ ধানের পারা,
অর্‌বুলার ডাউকের গো রায়ে (আমি) শরীর করলাম সাড়া।
শরীর কর্‌লাম সাড়া , নারে , পাঞ্জল করলাম শেষ;
(হায়রে) এই অবধি ছাইড়া গো যাইবাম্ (আরো)
চণ্ডী রাজার দেশ;
ইয় মাস বাড়াইলে শান্তি, শান্তি আরে, না পুরাইলে আশ।
ভাদ্রনা মাসেতে কুমার, কুমার আরে, গাছে পাকনা তাল,
(হায়রে) নারী অইয়া যৈইবন গো আমি রাখলাম কত কাল।
কত কাল রাখিবাম্ গো যৈবন লোকের বৈরী অইয়া।
ইয় মাস বাড়াইলে শান্তি, শান্তি আরে, না পুরাইলে আশ।
আশ্বিন্ না মাসেতে শান্তি, শান্তি আরে, বছরের পরে শেষ,

বিদাও দাও বিদায় দাও, শান্তি যাইগো আপন দেশ,
আরে, তুমি অইলা লক্ষ পুরুষ আমি কড়ার স্তিরি,
স্তিরি অইয়া পুরুষ বিদায় আমি কেমনে করি।
ডাইল দিলাম চাউল দিলাম রসুই করে খাও,
জোড় মন্দির ঘর দিলাম আরে শুইয়া নিদ্রা যাও।
আরে, বারো মাসের তের কথা, কুমার আরে, লওরে তবে গণিয়া,
এই গ্রাম বানাইয়া রে দিছে আরে, জৈধর বানিয়া।

উপরিউক্ত গানটিতে লক্ষণীয় হলো 'শান্তি' শব্দটির বহুল প্রয়োগ। গানটি বর্ণনা ধর্মী। কিন্তু গানটির বিশেষত্ব হলো ছন্দবন্ধনে কাহিনী বিন্যাস। বারমাস্যা গানের মধ্যে আখ্যানমূলক সীতা-কাহিনী কিন্তু বেশ নজরে আসে। বিশেষ করে তোয়াবলী কন্যার বারমাস্যা, নীলার বারমাস্যা, এমনকি পৌরাণিক চরিত্র সীতার বনবাসের দুঃখ বর্ণনাতেও বারমাস্যা গান রচিত হয়েছে। সম্ভবত এ কারণে আশরাফ সিদ্দিকী (''লোকসাহিত্য'' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে, পৃ. ৪৪) 'গাথা'র সঙ্গে এক মিল সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। তাই তিনি নিঃসঙ্কোচে বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি এ-কথা বলতে -- ''গাথাও তার কলেবর-বাহুল্য ত্যাগ করে পরবর্তীকালে বারমাসীর মত সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে রূপ নিয়েছে।''

এখানে এ-প্রসঙ্গে একটা কথা বলা উচিত হবে, এই সংক্ষিপ্ত কাহিনী বিন্যাস ইদানীংকালে আধুনিক বাংলা কবিতাতেও ঢুকে পড়েছে লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবতার উষ্ণ স্পর্শ নিয়ে একটু ভাষা-ব্যঞ্জনে পরিবর্তিত ও পরিশীলিত হয়েছে কখনো-সখনো প্রতীকী আশ্রয় নিয়ে। বিশেষ করে কবি জয় গোস্বামী, তপন বন্দোপাধ্যায় ও অনীক রুদ্রের দীর্ঘ কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। গাথা বা বারমাসীর মতন একটা আপাত প্রচ্ছন্ন রেশ এদের তিনজনার কবিতায় মাঝে-মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানকালের এই তিনজন কবি যেহেতু অনেক পথ মাড়িয়ে এসেছেন, সেহেতু ভাষা-ব্যঞ্জনে একটু ঐশ্বর্যশালীর প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে মূল কেন্দ্রীয়-ভাবনাটা কিন্তু আমাদের 'গাথা' ও 'বারমাসী'কে স্মরণ করিয়ে দেয়। একটু তীক্ষ্নভাবে পর্যবেক্ষকের গাঢ় দৃষ্টি রাখলে এ সত্য নজরে আসে।

আবার লৌকিক বারমাসী বলে আর একধরনের বারমাসী নজরে আসে। সেখানে রাধার কথা নেই। নেই কোনো বিশেষভাবে নায়িকাকে চিহ্নিত করে বিশেষ নাম। নিতান্তই লৌকিক প্রেমের কথাই বলা হয়েছে। 'বারমাসী' শব্দটি আবার আরো একটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, — সেই ব্যাপকতর অর্থে 'বারমাসী' বলতে বিস্তৃত জীবন-কাহিনীর প্রকাশ বুঝায়। এরূপ দৃষ্টান্ত হিসেবে ''মৈমনসিংহ গীতিকা''র পালাগানগুলিকে বিশেষ-বিশেষ নামে চিহ্নিত করে বলা হয়ে থাকে 'মলুয়ার বারমাসী', 'লীলার বারমাসী', 'কমলার

বারমাসী' ইত্যাদি। এরকম বারমাসী গান বাংলার লোকসাহিত্যেও প্রচলিত আছে। তবে, বিস্তৃত এ প্রকার বারমাসীর মধ্যে নায়িকার বারমাসের দুঃখ-দুর্দশার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বারমাসী বা বারমাস্যা যাই বলিনা কেন তার স্বাভাবিক নিয়মেই এটি হয়েছে। তবে, বৈষ্ণব প্রভাব বেশ ভালোভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে সাধারণতঃ রাধিকার বারমাস্যা বা বারমাসীতে। কখনো-সখনো বারমাস্যা গানে বারমাসের পরিবর্তে দশমাসের বর্ণনাও শুনতে পাওয়া যায়। তবে তা কদাচিৎ। বারমাস্যা বা বারমাসী বা বারাষে গানে সাধারণতঃ ভাবে বারমাসের বর্ণনার পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বারমাসের বর্ণনা প্রকাশ পায় বলে বা বারমাসের কথা গানের ভেতরে উঠে এসেছে বলেই সম্ভবত এই গানকে বারমাস্যা, বারাষে বা বারমাসী গান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে আমার ধারণা। কি প্রেম, কি বিরহ-বেদনায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায় ক্যালেণ্ডারের পাতা ওলটানোর মতন এসেছে বারটি মাসের কথা। বারমাস্যা, বারাষে বা বারমাসী গানের বিশিষ্টতা এখানেই। লোকসাহিত্যের আর কোনো গানে এভাবে বারটি মাসকে টেনে এনে কাহিনী-বিন্যাসে বর্ণনায় বিস্তৃত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না।

আবদুল হাফিজ মহাশয় তাঁর "লৌকিক সংস্কার ও বাঙালী সমাজ" গ্রন্থে যে-কথা বলেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি যশোর-খুলনা অঞ্চলে প্রচলিত গানের মধ্যে অনেকটা অশ্লীলতা যেমন খুঁজে পেয়েছেন, তেমনি খুঁজে পেয়েছেন সম্পূর্ণ এক ধর্ম-নিরপেক্ষতা। তবে, সাংঘাতিক কথা তিনি যা বলেছেন তা হলো — "বারাষী গান বারোমাসী গান থেকে সৃষ্টি হয়ে ক্রমাগত ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।" তিনি যশোর থেকে সংগৃহীত এরূপ একটি গান তুলে ধরেছেন উক্ত গ্রন্থটিতে। গানটি এখানে তুলে ধরছি ---

সোনার ভাগ্নে রে
পাগল করলি অতি অল্প বয়সে।।
ভাগনে আমার পান খায়
ঢিবি দেয় মাসীর গায় (ও) রে।।
ভাগনে আমার কাঁঠাল খায়
আটা মোছে মামীর গায়
ভাগনে আমার নেলা ভুলা
না জানে পীরিতির খ্যালা
ভাগনে আমার কাঁচাকুঞ্চি
লাফ দে ধরে মামীর চুঞ্চি
সোনার ভাগনে রে
পাগল করলি অতি অল্প বয়সে।।

ভাগ্নের পরনে ছিংলে ধুতি

ভাগনে মামীরে কয় ফিরে শুতি

সোনার ভাগ্নে মণি

পাগল করলি অল্প বয়সে।।

এখানে এ কথা বলা উচিত হবে, যশোর থেকে সংগৃহীত গানটি হয়তো অক্ষম কুরুচিসম্পন্ন কোনো কবির রচনা। এই একটি গানকে কেন্দ্র করে বারাযে গান সম্পর্কে নজর ছোটো করার কোনো মানে নেই, — কেননা, রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বনে রচিত বারাযে গান বেশ উৎকৃষ্ট শিল্পরূপই বহন করে। এই প্রকৃতির বারাযে গান পাঠ করলে 'বারাযে' গান যে বারমাস্যারই সমগোত্রীয় বা বারমাস্যারই নামান্তর তা বলা যায় কোনো দ্বিধা বা কুণ্ঠা না রেখেই।

মুর্শীদি গান

'মুর্শীদি' শব্দটির অর্থ হলো গুরু। অর্থাৎ যে গানে গুরুর প্রশংসা করা হয় সেই গানকেই মুর্শীদ্যা গান বা মুর্শীদি গান বলা হয়। অনেকে আবার যেহেতু মুর্শীদ্যা বলতে কেবল স্বয়ং ঈশ্বর বা ভগবানকে বোঝেন, সেহেতু মুর্শীদ্যা গানে ঈশ্বর সম্পর্কে বক্তব্যের প্রাধান্যও লক্ষ্য করা যায়।

মুর্শীদি গান সম্পর্কে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী "মুরশিদী গান" একটি শীর্ষক আলোচনায় বলেছেন, "আরবী ভাষায় 'এরশাদ' শব্দটির অর্থ নির্দেশ। মুরশিদ তিনিই যিনি ইরশাদ বা নির্দেশ দেন। সে অর্থে 'মুরশিদ'কে সাধারণ ভাষায় 'গুরু' বলা যেতে পারে। হয়েছেও তাই। বাংলা লোকসংগীতে আমরা যে অসংখ্য মরমীয়া লোক গীতির সন্ধান পাই তাতে 'মুরশিদ' এবং 'গুরু' এই উভয় শব্দই পাশাপাশি দেখি।"

'ভারতী' পত্রিকার ১৩৩১ সনের ভাদ্র সংখ্যায় (৪৮শ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা) "মুর্শীদ্যা গান" নামে জসীমউদ্দীনের যে মূল্যবান প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, সেই প্রবন্ধে এ গানের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "৩০০ বৎসর পূর্বেও এ গান ছিল তাহা অনুমান করিলেও বোধ হয় নিতান্ত ভুল হইবে না।"

এমনকি, এ গানের ভেতরে অনিত্যতা সম্পর্কে বক্তব্য স্থান পাওয়ার জন্য তিনি বুদ্ধের কথিত মায়াবাদের সন্ধান পেয়েছেন। তাই তিনি উক্ত প্রবন্ধে এ কথা বলেন — 'ইহা বোধহয় আমাদের বৌদ্ধধর্মের শেষ নিদর্শন। আমাদের গ্রামের লোকেরা বহুদিন পর্যন্ত বৌদ্ধ ছিল। পরে মুসলমান ও হিন্দু হইয়া ইহাদের অনেকে বাহিরের কাঠামোটি বদলাইলেও অন্তরের বৌদ্ধ ভাবটি ছাড়িতে পারে নাই। আর যারা হিন্দু ছিল তারাও মুসলমান হইয়া হিন্দুভাব অনেকটা বজায় রাখিয়াছে।"

অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন "বাউল মুর্শিদী গান" শীর্ষক আলোচনায় যে-কথা বলেছেন তা-ও প্রণিধান যোগ্য --- "বাউল ও মুর্শীদি গান আমাদের দেশের লোকসংগীত। এ লোকসংগীত ধর্মভিত্তিক। মরমিয়াবাদ থেকে এদের জন্ম।" কাজেই, 'ধর্মভিত্তিক' কথাটির সূত্র ধরে জসীমউদ্দীনের মন্তব্যটি অর্থবহ বলা যেতে পারে। ক্রমে বাংলাদেশের মরমিয়াবাদের ধারাটি ধীরে ধীরে ইসলামী মরমিয়াবাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এত নতুন ধারার প্রবর্তন করে। এ সম্পর্কে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বলেন, "মুসলমান সভ্যতার অভ্যাগমে এ দেশে এই দেশী মরমিয়াবাদের সঙ্গে সুফী মরমিয়াবাদ প্রবেশ লাভ করে। এর ইতিহাস বিচিত্র এবং রহস্যপূর্ণ। এই সাধনার ধারার প্রবেশের ফলে গুরু মুর্শিদে পরিণত হয়। আর সুফী মতবাদের প্রকৃত বিকাশ ঘটেছে ইরাণে। মুসলমান সুফীদের প্রেমময় জীবন সাধনা এ দেশের অশিক্ষিত

জনসাধারণের ওপর এক অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করে। এ দেশের লোকের ধ্যান-ধারণার ও জীবন পন্থার স্বীকরণ ঘটে।"

এ কথার সমর্থন মেলে ডঃ আশরাফ সিদ্দিকীর কথাতেও ("মুরশিদী গান" শীর্ষক অলোচনায়), "... মারিফাতের গূঢ়তত্ত্ব শেখার জন্য সুফীগণ যে 'মুরশিদের' সাধনা করেছেন -- আমাদের লোকগীতিতে তা পরবর্তীকালে কখনো 'মুরশিদী', কখনও 'ফকিরালী' এবং কখনো বা মারফতী গান নামে পরিচিত লাভ করেছে।"

এ গানের বিশেষ প্রচলন দেখা যায় ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায়। এই গানের সঙ্গে যে বিশেষ বাদ্যযন্ত্রটি বাজানো হয় তার নাম সারিন্দা। কোনো মুর্শীদি গানে অবশ্য ভনিতা পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ এ গান ভাটিয়ালী সুরেই গাওয়া হয়। এই গানে করুণ ভাবেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

মুর্শীদি গানে পরবর্তীকালে চৈতন্যের প্রসঙ্গকে পরিবর্তিত করা হয়েছে তা-ও লক্ষ্য করা যায়। যেমন ---

চল যাইরে --- আমার দোরদীর তালাসেরে মন চল বাইরে।
ইস্ত্রী হৈল পায়ের বেড়ী পুত্র হৈল কাল
এড়াইতে পারলাম না রে আমি এই ভব জঞ্জালরে
মন চল যাইরে।
হালবাও হালুয়া বাইরে হস্তে সোনার নড়ী
এই পথদ্যানি যাইতে দেখছাও আমার শানাল
চান সন্ন্যাসীরে -- মন চল যাইরে।
দেইখ্যাছি দেইখ্যাছি আমরা শানাল চান সন্ন্যাসী
ও তার গলায় মালা কান্দে ঝোলা করে মোহন
বাঁশীরে, মন চল যাইরে।
জালবাও জালুয়া বাইরে হস্তে সোনার ডুরি
এই পথদ্যানি যাইতে দেখছাও আমার শানাল চান
সন্ন্যাসীরে, মন চল যাইরে।
দেইখ্যাছি দেইখ্যাছি আমরা শানাল চান বেপারী,
ও তার গলায় মালা কান্ধে ঝোলা করে
মোহন বাঁশীরে।

গানটিতে চৈতন্যের প্রসঙ্গের পরিবর্তে শানালের নামকে পরবর্তীকালে যুক্ত করা হয়েছে। এই গানটির বৈশিষ্ট্য হলো, কবি গানটিতে দরদীর সন্ধানের জন্য প্রাকৃতিক উপকরণকে মূল বলে ভাবেননি, বাড়ীর পাশে যে হালুয়া ভাই চাষ করে, কিংবা সোনার ডুরি হাতে জালুয়া ভাই জাল বায় তাদের কাছেই কবি সন্ধান করেছেন। গানটিতে লক্ষণীয় ভাটিয়ালী গানের মতোন উচ্চারণ ভঙ্গি। যাতে ভাটিয়ালী সুরেই গীত হতে পারে। তবে, মুর্শীদি গান যে মূলত ধর্মভিত্তিক তা এই গানটিতেও লক্ষ্য করা যায়। "মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য"-এ কবি রক্তশন ইজদানী সাহেবের মুর্শীদি গানের দৃষ্টান্ত এ সম্পর্কে রেখেছেন। সেই গানটি ধর্মভিত্তিকই নয় - মরমিয়াবাদের চূড়ান্ত পর্যায়কে তুলে ধরেছে। যেমন---

কোরান পড় তৌহিদ কর

দাউনে ধর মুর্শিদের,

মিছামিছি মূল্য দিস না

নৌকা বোঝাই কিতাবের।।

কিতাব তোমার কালির লেখা

চোখ না দেখলে যায় না দেখা,

অন্ধকারে বইলে একা

মানুষ খুইয়া পীরিতের।

নামের লিঙ্গ নামের যোনি

সঙ্গমেতে হয় রে শুনি

গাইবী এলেম লু'ধুনী

দাস্ত দৌলত রহমতের।।

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী যে মুর্শীদি গানকে ফকরালী ও মারফতী গান বলেও মত প্রকাশ করেছেন, --- এ প্রসঙ্গেও কবি রক্তশন ইজদানীর বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন-- "ফকিরালী গানের সঙ্গে মারফতী গানের কোন কোন স্থলে ভাবের ঐক্য লক্ষিত হলেও তার সমাজদার, গায়ক ও রচয়িতা ভিন্ন।" এখানে রক্তশন ইজদানীর প্রদত্ত একটি গান উল্লেখ করছি, গানটি পাঠ করলে সহজেই রক্তশন ইজদানীর কথার সমর্থন মেলে। গানটিতে ভাবের দিক থেকে মিলসাদৃশ্য চোখে পড়লেও, গঠনগত বাক্যবিন্যাসের দিকে মিল তেমন নেই বলা চলে। এমনকি সুরেও পার্থক্য লক্ষণীয়। একটি মারফতী গান এখানে তুলে ধরছি উদাহরণ স্বরূপ --

নিত্য নতুন বেরোয় রস
খাইলে তারে ফুরায় না,
প্রেমের গাছে রসে হাঁড়ি
পাতলো যে জনা।।

একটি খেজুর গাছ পাইয়ে
লোভে কাটে বাঙ্গালে,
আগে থইয়া গোড়া কাটে
রস নাহি মিলে।।

(ও তার) আগ ডালেতে থাকে রস
রসিক বিনে কে জানে।।

সাধারণ গিরস্থ চাষা
জ্বাল দিবার না পায় দিশা,
হালুইদারে পাইলে তারে
(করে) মিঠাই-মুণ্ডা-খানা।।

মুর্শীদি গানে কিন্তু যে ভালোবাসার কথা পাওয়া যায় তা রক্তমাংসের ভালোবাসা নয়। ভক্ত যেন ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে তাঁর হৃদয়-দেবতার কাছে নিজ অন্তরের আকুতিকে প্রকট করছেন। যেমন ---

আমি ক্যানে বা পিরীতিরে করলাম
ওই নিঠুর কালার সনেরে
ওই ডাকাইত কালার সনেরে।
সে ত ধান নহে চাউল নহেরে
তারে আমি গোলাতে ছান্দিবরে।
সে ত সোনা নহে রূপা নহেরে
তারে আমি পেঁটরায় ভরিবরে।

মোদ্দাকথা হলো, মুর্শীদা গান মানুষের মনে ভাবের উদ্রেক করে। মুর্শীদা গান আরম্ভ হয়ে গুরুর প্রতি অবিচল ভক্তির নিবেদনে। কিন্তু পরে গানগুলি রূপান্তরিত হয় ঐশী প্রেমে।

আবার, রোগী চিকিৎসার জন্য গ্রামদেশে মুর্শীদা গানের প্রচলনও দেখা যায়। এ সম্পর্কে জসীমউদ্দীন তাঁর "মুর্শীদা গান" গ্রন্থে বলেছেন, "গ্রামদেশে কোন লোক অসুস্থ হইলে যাহাদের ডাক্তার কবিরাজে বিশ্বাস নাই তাহারা রোগীর চিকিৎসার জন্য কোন মুর্শীদ ফকীরকে ডাকিয়া আনে। মাথায় লম্বা চুল, মুখে দাড়ী আর আতসী পাথরের মালা গলায় পরিয়া শিষ্যসেবকসহ ফকীর রোগীর বাড়িতে আসে। কোন কোন ফকিরের হাতে একখানা লাঠি বা রুল থাকে।

ফকীর তার চার পাঁচজন শিষ্যসহ রোগীকে ঘিরিয়া বসে। ফকীরের সামনে একখানা কুলা রাখা হয়। কুলার আগায় সিঁদুরের ফোঁটা। মাঝখানে একটি মাটির প্রদীপ। তার পিছনে সোয়া পাঁচ আনা বা পাঁচসিকের পয়সা। একখানা নতুন কাপড় তার উপরে ধান দুর্বা। ফকীর এই কুলা সামনে করিয়া বসিয়া গান আরম্ভ করে। গান গাহিতে কোন কোন ফকীরের উপর গাছা বা প্রেত আসিয়া ভর করে। কোন কোন সময় কালী, মান্দার, চুঙ্গাইপীর মা বরকত বা কলেরা ভূত আসিয়া একজনের উপর ভর করে। গাঁয়ের লোকেরা ইহাদের নিকট হইতে রোগী ভাল হইবে কিসে তাহা জানিয়া লয়।"

এরূপ একটি চিকিৎসার ঘটনার কথাও জসীমউদ্দীন বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর গ্রন্থে। তাঁর বিস্তারিত চিকিৎসার ঘটনাটি এখানে হুবহু তুলে ধরছি ---

"সেটা বোধহয় ১৯২৩ কিংবা ১৯২৪ সন। আমাদের বাড়ির সামনে পদ্মানদীর ওপারে আজাহের মণ্ডলের মা সেবার কলেরা রোগে আক্রান্ত হইল। খবর পাইয়া সেই বৃদ্ধকে দেখিতে গেলাম। সারা দিন তাহার ঘন ঘন পায়খানা ও বমি হইয়াছে। হাত পা ঠাণ্ডা এবং নাড়ী ধরিয়া দেখিলাম নাড়ী বসিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম আজকের রাত যদি রোগিনী বাঁচিয়া থাকে কাল শহর হইতে ডাক্তার আনাইয়া তাহার চিকিৎসা করাইব। এত রাত্রে পদ্মার ওপার কোন ডাক্তারই আসিতে সাহস পাইবেন না।

ইতিমধ্যে পাঁচ ছয়জন মুর্শীদা ফকীর আসিলেন। তাঁহারা রোগিনীকে ঘিরিয়া মুর্শীদি গান করিতে লাগিলেন। ঘন্টাখানেক গান করিতে সকলেই খুব ভাববিহ্বল হইয়া পড়িলেন। রোগিনী তখন উঠিয়া বসিল। গান আরও জোরে চলিতে লাগিল। এবার রোগিনী ঝুল পাড়িতে লাগিল।

প্রধান ফকীর তখন রোগিনীকে জোরে জোরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তুমি কে?"

ভাঙ্গা হিন্দীতে কাবুলীওয়ালাদের টানে রোগিনী উত্তর করিল, "আমি কলেরা।"

ফকীর বলিলেন, "তুমি এ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাও।"

রোগিনীর জবাবে কলেরা বলিল, "আমি এ গাঁয় আসিয়াছি তিন চারিটাকে লইয়া যাইবার জন্য।"

ফকীর বলিলেন, "তোকে এখনই চলিয়া যাইতে হইবে। নইলে তোকে শলা দিয়া মারিব।"

মেয়েটির জবানে কলেরা বলিল, "না না আমি যাব না।" এই বলিয়া সে কান্দিতে লাগিল।

ফকীর তখন ঝাঁটা লইয়া রোগিনীকে মারিতে উদ্যত হইলেন।

কলেরা এবার বলিল, "আমি যাইব কিন্তু যাইবার আগে আমাকে একটু তামাক খাওয়াও।"

একটি হুক্কায় তামাক সাজিয়া দেওয়া হইল।

রোগিনী জোরে জোরে হুক্কা টানিতে লাগিল। তার টানের চোটে যখন কলকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল তখন কলেরা বলিল, "এবার আমি যাই তোরা আল্লার ধ্বনি দে।"

ফকীরেরা সকলে মিলিয়া ধ্বনি তুলিল, "বল রে মোমিন আল্লা আল্লা লায়লাহা ইল্লাল্লা।"

রোগিনী গা মোড়ামুড়ি দিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ফকীরেরা তাহার মাথায় তেল পানিও কানেমুখে ফুক দিয়া তাহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিল।

ইহার পরে রোগিনী আর বমি বা পায়খানা করিল না। পরের দিন সকালে ফকীরেরা তাহাকে পানি ভাত খাইতে দিল।"

তবে, মুর্শীদা গানকে কথা-সুর ও ভাবে বেশ উৎকৃষ্ট শিল্পগুণে সমন্বিত গান বলা যেতে পারে। এখানে এরূপ কটি গান জসীমউদ্দীন-এর সংগৃহীত গানগুলি থেকে ("মুর্শীদা গান" গ্রন্থে সংকলিত) উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরছি যা শিল্পগুণে বেশ উৎকৃষ্ট মানেরতো বটেই, তেমনি গানগুলি রসের সুরধায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় এক অনাবিল ভক্তিরসে। যেমন —

১. আজ তোরে ডাকিরে সোনার চাঁদ বলে
হাস্য মুখে কও কথারে জুড়াক পরাণ ওরে প্রাণের নাথ।
তোর বাল্লকে তোরে ডাকেরে দয়াল একবার চাও ফিরিয়ারে
তুই ছাড়া ভরসা নাই আমার . . . . .
যা কর তা করতে পারবে দয়াল মহিমা তোর আছেরে।
প্রাণের নাথ।

কার ছায়ায় দাঁড়াব আমিরে
দয়াল কে আছে আমার রে প্রাণের নাথ।
তোর ছায়ায় দাঁড়াব আমিরে দয়াল

এতভাগ্য নাইরে প্রাণের নাথ।
দেওনা দেখা কওনা কথারে
দয়াল জুড়াক পরাণরে প্রাণের নাথ।
ও আমার সোনার দয়ালরে
তোর জন্যে প্রাণ সদায় কান্দে।
সদায় কান্দে আমার প্রাণ ওরে
ঘরে রইতে দিলিনা আমারে
আমার প্রাণ কেবল জ্বইলা জ্বইলা উঠেরে
পায় ধরি মিনতি করি
দয়াল ফালাইস না আমারে।
সকলেরই সকল আছে রে
আমার আছাও তুমিরে।

২. আমি কেনে বা আসিলাম রে মুর্শীদ
এই দূর প্রবাসেরে,
আমি কেন আসিলাম।
হাল বাও হালুয়া ভাইরে
হস্তে সোনার নড়ি,
এই পথদ্যানি যাইতে দেখছাও রে
আমার সানাল চান বেপারীরে
আমি কেনে আইলাম।
দেইখাছি দেইখাছি আমরা
সানাল চান সন্ন্যাসী,
ও তার হাতে আশা বোগলে কোরান
মুখে মৃদু হাসিরে
আমি কেন বা আইলাম।
জাল বাও জালুয়া ভাইরে
হস্তে সোনার ডুরি,

এই পথদ্যানি যাইতে দেখছাওরে

আমার নবীন চান সন্ন্যাসীরে

আমি কেনে আইলাম।

দেইখাছি দেইখাছি আমরা

সানাল চান সন্ন্যাসী,

ওকে হাতে আশা বগলে কোরান

মুখে মধুর হাসি।

আমি কেন বা আইলাম।

৩. আমি কেন বা আইলামরে গুরুধন

তার মিছা পরবাসে।

হাল বাও হালুয়া ভাইরে হস্তে সোনার নড়ি,

এই পথে নি যাইতে দেখছাও আমার দয়াল সন্ন্যাসী।

ও তার কান্ধে ছালা গলায় মালা

হাতে মোহন বাঁশীরে।

জাল বাও জালুয়া ভাইরে হস্তে সোনার ডুরি

এই পথে নি যাইতে দেখছাও

আমার নিমাই চান সন্ন্যাসী।

আমার গুরু বসা আছে

রাজও সিংহাসনে

কত আউলিয়া দরবেশ ঘুরতাছে

ও তার চরণ পাবার আশে।

আমার গুরু ছান করে সানুবান্দার ঘাটে

আউলিয়া মাথার ক্যাশ

ঘুরে পাগলেরি বেশে।

এখানে উপরিউক্ত দ্বিতীয় গানটিতে লক্ষণীয় ব্যাপারটি হলো, হিন্দুরা এই গানটিকে অপর পাঠে গায় ---

দেখেছি দেখেছি আমরা নবীন চাঁদ সন্ন্যাসী
ও তার কাঁন্দে ঝোলা গলায় মালা
মুখে মধুর হাসি।

এ পদটি সম্পর্কে জসীমউদ্দীনের বক্তব্য হলো, "বাংলার ভাব পাগল গৌরাঙ্গদেবকে বুঝাইতেছে। খুব সম্ভব শাহলাল এবং ভক্তেরা ইহা অন্য পাঠান্তরে গাহিয়া থাকে। এইভাবে এক সমাজের গানের কথা অন্য সমাজের গানের কথায় রূপান্তরিত হয়।" যথার্থই বলেছেন তিনি।

আবার, উপরিউক্ত উদাহরণের তৃতীয় গানটিতে বিশেষ করে 'ও তার কান্ধে ছালা গলায় মালা, হাতে মোহন বাঁশীরে।' পংক্তি দুটির সম্পর্কে জসীমউদ্দীনের বক্তব্য হলো, "এখানে কান্ধে ছানা গলায় মালা আর হাতে মোহন বাঁশী দেখিয়া মনে হয় গানটি গৌরাঙ্গ যুগে রচিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে সানালের ভক্তেরা তা পরিবর্তন করিয়া হাতে আশা বগলে কোরান মুখে মধুর হাসি করিয়াছে।" এ বক্তব্য একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যে যায় না তা গানটি আগাগোড়া পাঠেই লক্ষ্য করা যায়। কাজেই, এক সমাজ থেকে আর এক সমাজের ভিন্ন মানুষের হাতে হাতে গান যতই পরিবর্তিত হোক না কেন মূল ভাবের ঐক্যে কিন্তু এক। সেখানে মুর্শীদি গান এক অভিন্ন হৃদয়। ভক্তি-প্রেমই যার মূল কথা।

মুর্শীদি গানের মধ্যে নিপীড়িত চিরবঞ্চিত জনগণের দুঃখ-বেদনার কথাও ফুটে উঠেছে দেখা যায়। যেমন ---

তুমি কাউরে দিছ দালান কোঠা ঘর
যে তোমারে রাখে নিয়া শত তলার পর।
আমার নাড়ার কুড়ে জল পড়ে তাতে
দয়াল তোমার মন রবে কি সেইখানে।
তোমায় কেউ খাওয়ায় ঘৃত, ননী
পায়েস, পিঠা, সন্দেশ, মিঠাই
খাওয়ায় তোমারে
আমার আলো পোড়া
লবণ ছাড়া দিয়া দেখি দয়াল
তোমার ভজনে।
কাউরে দিছ বসন ভূষণ
আহ্লাদে খুশী হইয়া ভজে তোমার মন।

আমার ছেঁড়া তেনা তাও জুটে না

দয়াল কি দিব তোমারে পরিতে।

যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে মুর্শীদি গানের ভেতরে নগর কলকাতার কথা যেমন ঢুকে পড়েছে, তেমনি ঢুকে পড়েছে কিছু বাস্তব-দ্বান্দ্বিকতাময় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের কথাও। তবে, ভক্তি-মিশ্রিত রসের মাধ্যমেই ঘটেছে তার স্বপ্রকাশ। মুর্শীদি গানের স্বাভাবিক চরিত্রগুণকে বিসর্জিত করে তেমন কিছু ঘটেনি বলেই এ গান শ্রোতাদের আজো আকৃষ্ট করে। আর একটা কথা না বললে নয়, এ গানের ঐশীপ্রেম কবি রবীন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট করেছিল বলা যেতে পারে। কেননা, রবীন্দ্রসাহিত্যে ঐশীপ্রেমের ছবি বার বার উঠে এসেছে লক্ষ্য করা যায় তাঁর অনেক কবিতা ও গানে। তাঁর "গীতাঞ্জলি" কাব্যের এ উচ্চারণ --

তোমার দয়া যদি

চাহিতে নাও জানি

তবুও দয়া করে

চরণে নিয়ো টানি।

আমাদের মুর্শীদি গানের ঐশীপ্রেম ও ভক্তির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

পটুয়ার গান

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর ''বাংলার লোকসাহিত্য'' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে 'পটুয়ার গান' শীর্ষক আলোচনায় বলেছেন ''বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হইতে যদি দেশের প্রধানতঃ প্রান্তিক অঞ্চলগুলি পরিক্রমণ করিতে আরম্ভ করা যায়, তবে সেই অঞ্চলে যে বিশেষ প্রকৃতির এক শ্রেণীর সঙ্গীতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহাই পটুয়ার গান। এক সময় মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অর্থাৎ প্রধানতঃ তমলুক অঞ্চলেই ইহার ব্যাপক প্রচলন ছিল। প্রধানতঃ তাম্রলিপ্ত বা প্রাচীন তমলুকের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও দ্বিতীয়তঃ উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্র বলিয়া এই অঞ্চলেই ইহার প্রথম উদ্ভব ও বিকাশ হইয়া থাকিবে। আজিও তমলুকের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে পটুয়া নামক এক শ্রেণীর সম্প্রদায় পট আঁকিয়া গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে সঙ্গীতসহ তাহার প্রদর্শনী করিয়া থাকে। কিন্তু এই অঞ্চলে ইহা আজ প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে, বরং বাংলার লোকসঙ্গীতের রাঢ় অঞ্চল বলিয়া যাহাকে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অন্যত্র বিশেষতঃ বীরভূম অঞ্চলে ইহার প্রভাব এখন পর্যন্ত কতকটা সক্রিয় আছে।''

এবার পট ও পটুয়া সম্পর্কে দু-চার কথা বলি। পৃথিবীতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই আমরা জানি শিল্পচর্চা হয়ে আসছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়েছে ভারতের শিল্পচর্চা। ভারতের সঙ্গীত ও সাহিত্যের মতনই শিল্পকলা প্রধানতঃ অধ্যাত্ম প্রেরণা সঞ্জাত। এই শিল্পকলা আত্মপ্রকাশ করেছে যেমন পর্বতের গায়ে, গিরি - গুহায় মন্দিরে, তেমনি শিল্প-প্রকাশের মাধ্যম্ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে পটও। 'পট' শব্দের মূল অর্থ হলো বস্ত্র। কিন্তু পরবর্তীকালে বস্ত্রের উপর লিখিত চিত্র 'পট' নামে পরিচিতি লাভ করে। যারা এই চিত্রকলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েন তারা পরিচিতি লাভ করেন 'পটুয়া' নামে। প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জানা যায় ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল থেকেই পটচিত্রের প্রচলন ছিল। বিশেষ করে বানভট্টের 'হর্ষচরিতে', বিশাখা দত্তের 'মুদ্রারাক্ষসে', কালিদাসের 'শকুন্তলা'য়, ভবভূতির 'উত্তর রামচরিতে' ও রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে। বাংলাদেশে আবার দুটি শ্রেনীর পট প্রচলিত আছে। একটি অপেক্ষাকৃত ছোট-আকারের চৌকা পট, আর একটি দীঘল পট বা জাড়ানো পট। চৌকা পটে একটি মাত্র চিত্র থাকে। 'পটুয়া সঙ্গীত' দীঘল পট বা জড়ানো পটের অঙ্কিত চিত্রগুলি অবলম্বনে রচিত গান।

এই 'পটুয়া গান' বা 'পটুয়া সঙ্গীত' সম্পর্কে ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস'' গ্রন্থে কতকগুলি মূল্যবান কথা বলেছেন, ''এই পটের চিত্র এবং সঙ্গীতের বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৌরাণিক। এই সব বিষয়বস্তু মধ্যে আছে

কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, গৌরাঙ্গলীলা শিব পার্বতী লীলা ইত্যাদি। আমাদের দেশে লোকশিক্ষার যতগুলি মাধ্যম ছিল-- যেমন কথকতা, যাত্রা ইত্যাদি পটুয়া সঙ্গীতও এদেরই মত লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। আমাদের এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ রাম অবতার, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি পটের সঙ্গে যুক্ত যম পট ও যমপটের গানের উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব গানের মূল প্রতিপাদ্য মানুষকে অন্যায় ও পাপ কার্য থেকে বিরত করা।''

কাজেই, এই পটুয়া গানের উদ্দেশ্য যে মহৎ,তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার পটুয়াদের জীবনে লক্ষ্য করা যায় , ইসলাম ও হিন্দুধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব। ডঃ আশুতোষ মহাশয় আবার এই সঙ্গীতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসেবে লক্ষ্য করেছেন 'বৈষ্ণব ব. ভগবত প্রসঙ্গ'', '' রামায়ণ কাহিনী'' ও ''মনসা - মঙ্গলের কাহিনী''। এ প্রসঙ্গে পরে বিস্তারিত আলোচনায় আসছি। তার আগে গো - মাহাত্ম্য বিষয়ক প্রসঙ্গে আসি। গো - মাহাত্ম্য পটুয়া গানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বাঙালী হিন্দু নরনারীরা যেহেতু গরুকে ভগবতী-জ্ঞানে পূজা করে এবং গো - পূজার কালে কুমারী হিন্দু মেয়েরা গোকলব্রত পালন করে ও পুরুষেরাও সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন সেহেতু 'গো - মাহাত্ম্য কীর্তন' পটে যেমন চিত্রিত হয়েছে, তেমনি উঠে এসেছে হৃদয় ও মনের আবেগমিশ্রিত হয়ে ভাষা ও ব্যঞ্জনে পটুয়ার গানে। তবে গো - মাহাত্ম্য পটুয়া গানের বিষয় একান্তভাবেই লৌকিক। মুসলমান ফকিররাও এই গান গেয়ে থাকেন। এ কারণে কেউ কেউ এই গানকে গাজীর গানও বলে থাকেন। এখানে একটি এরূপ গান তুলে ধরছে। গো - মাহাত্ম্যের কীর্তনিয়া গান বলাই ভালো এ গানকে। যেমন---

গরু নাড় গরু চাড় গরু বড় ধন
ঘার ঘরে গরু নাই তার বৃথাই জীবন।
গরুর সেবা করেছিলেন প্রভু নারায়ণ
ইন্দ্ররাজা দেবগণ বসিয়া আকনে
কপিলার পৃষ্ঠে কথা কহেন সেখানে।
কপিলা ডাকিয়া তবে বলিছে বচন
তোমায় যেতে হবে মা রবনী মন্ডপে
আমার মহিমা নরলোকে কিবা জানে।
গোদানড়ী দেবে মা নারিব বহিতে
দুচক্ষে ঠুলি দিয়ে ঘুরাবে বক্র
বিনা অপরাধে বিধি লাগাবেন চক্র।
মনে মনে জনে জনে বোঝা চাপাইবেন পৃষ্ঠে

চলতে না পারিলে পাঁচুলি মারয়ে পিঠে
দুটি পা ছন্দন করে দুগ্ধ নেবে ঝেঁকে
আমার দুধের বালকেরা বেড়াব সব কেঁদে।
আমি তো যাব না মা রবনী মন্ডলে
তুমি যদি না যাও মা রবনী মন্ডলে
নরলোক পবিত্র হইবে গো কেমনে।
তোমার দুগ্ধ ছেঁকে লয়ে দেবগণের সেবা হবে।
এই কথা কপিলা কর্ণেতে শুনিল।
নির্মল ব্রাহ্মণের ঘরে অধিষ্ঠান হইল
কপিলাকে দেখে ব্রাহ্মণ ভাবিতে লাগিল।
মুরারি ঘোষ বনে সেদিন মনে পড়ে গেল।
বাবা মুরীরি ঘোষ আজ থেকে গরুর সেবা কর বাপু তুমি
গরুর সেবা করলে পরে ভাগ্য হবে ম'রে
গঙ্গা স্নানের ফল কিছু দুয়ারে বসে পাবে।
সাত দিন সাত বৌত্রর পালিত করে ছিল
প্রথম পালিতে মাতার বড় বৌত্রর হল।
পরিধান করিতে দিল বউকে দিব্য পাটের শাড়ি
গোহাল কাড়িতে দিল সুবর্ণার ঝুড়ি।
রুনুঝুনু শব্দে গোয়ালে দিলেন পা
খিঁচ - গোবর দেখে বউ কপালে মারে ঘা
বউ বলে নিগরুর ঘরেঁ যদি মোর বিবাহ হইত
তবে কেন সোনার শঙ্খয় গোবর লাগিত।
সুবুদ্ধি বউ ছিল কুবুদ্ধি ধরিল
উলট ঝাঁটার বাড়ি গরুকে মারিল।
ঝাঁটার বাড়িতে গরুর পাঁজর ভেঙ্গে গেল
পঞ্চমাসের গর্ভ সেদিন খসিয়া পড়িল।
কাঁদিতে কাঁদিতে গরু অন্য পালে গেল

অন্য পালে গেল গরু ঘুরে নাইক এল।
চালের বাতা ধরে বউ নাচিতে লাগিল
ভাল হল শ্বশুরবাড়ীর পাল ঘুচে গেল।
আজ থেকে গোয়াল কাড়া জঞ্জাল ঘুচিল
দই-দুগ্ধ বিচিয়া আসিছেন নীলবতী
তার কাছে বিদায় মাগিছেন ভগবতী।
বলে তোমার বড় বৌ আন বর না বড়
মেরেছে ঝাঁটার বাড়ি ভেঙেছে পাঁজর।
পান খায় পিকি ফেলে গোহালের ভিতর।
রাত্র প্রভাত হলে পরে দেয়না ছড় ঝাঁটি
সন্ধ্যে লাগিলে পরে দেখায় না বাতি।
বাড়া ভাত মৎস্য রাঁধা গোহালে বসে খায়
রক্ত পিনাসি মাতার গরুর নাকে হয়।
ভাদ্র মাসের দিনে যে জন গোয়ালে মাটি দেয়
ডাংরা পিলুই হয়ে তাহার গরু মরে যায়।
রবিবারের দিনে যে জন মৎস্য ভেজে খায়
উকুন এঁটুলি মাতার গরুর গায়ে হয়।
শনি-মঙ্গল বারের দিন গোবর বিলায়
দিনে দিনে গেরস্থালী মেটিয়ে যায়।
এই সকল পালন যদি পালিতে না পায়
তবে গিয়ে নবলক্ষীর পাল ঘুরে যায়।
তোমার সাক্ষাতে বউকে নর-বলি দেব।
নাপিত ডাকিয়ে বৌত্রর মস্তক মুড়াইল
জিহ্বা কাটিয়া বউ-এর কলার পাতে থুইল।
হাতের দশটি আঙ্গুল লয়ে পলিতা পাকাইল
হেঁটোর মালুইচাকি লয়ে প্রদীপ গড়িল।
মস্তকের খাপুরি লয়ে ধুপসী করিল

ধূপ-ধুনা দিয়ে কপিলা ঘরে নিল।

এক লক্ষ ছিল গাভী সওয়া লক্ষ হইল

বছর বছর পাল বাড়িতে লাগিল।

আদ্যাশক্তি ভগবতী আছেন যার ঘরে

গোহালে পরমসুখে তার যম কাঁপে ভরে।

শিবনিন্দা করো না শিবের করো সেবা

শিব দিতে পারে ইন্দ্রপদ ধনে করে রাজা।

উপরিউক্ত গানটিতে লক্ষনীয় ব্যাপারগুলি হলো --(১) গানটির শুরু হয়েছে গরুর প্রশংসা দিয়ে। (২) গরুকে ডেকে কপিলার কথা। (৩) কপিলার কথার উত্তর দেয় গুরু ইত্যাদি। গানটিতে আর একটি লক্ষীয় বিষয় হলো, যাদুবিদ্যাগত মটিফ। অদিম সমাজগুলোতে যে - বিশ্বাস প্রচলিত আছে পশুপাখি মানুষের মতোই কথা বলতে সক্ষম ---- তা এই গো-মাহাত্ম্য গানে লক্ষ্য করা যায়। আর একটু কথা বলা সমীচিন হবে, গো-মাহাত্ম্য গানে বাংলা ও বাঙ্গালীর লোকসংস্কারকে আন্তরিক ভাবেই তুলে ধরেছে।

পট গানের কৃষ্ণ-বিষয়ক গানগুলিও বেশ সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক আখ্যানে স্থান পেয়েছে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, পুতনা বধ, নন্দোৎসব, বস্ত্রহরণ, ননীচুরি, দানখন্ড, কালীয় দমন প্রভৃতি। কৃষ্ণলীলা গানের এখানে একটি উদাহরণ রাখছি-----

কাণিয়া কদম্বমূলে নাগরিয়া থানা

বনফুল গাঁথিয়ে কৃষ্ণের গলে বনমালা।

হাত বাঁকা পায় বাঁকা বাঁকা মাজাখানি,

চরণের নূপুর বাঁকা চূড়ার টানুনি।

চূড়া বাঁধে নানা ছাঁদে অলকা দুলানী

তাও দেখে ভোলে ব্রজের ষোল শ রমণী।

তার ধারে ধারে নাম লিখেছে রাধ বিনোদিনী

চার কড়ার বাঁশী নয় ঠাকুর পিতলের ছোঁয়ানি।

কোন কোন গোপী বলে, বাঁশ বাঁশিয়া নয় তরল বাঁশের ডসা

ডাকে নাম ধরে বাঁশী সদাই রাধা রাধা।

সেই বাঁশী দিবানিশি করে অপমান

সেই বাঁশীতে ভোলায় সকল ব্রজ-গোপীগণ।

পাড়ে বসন রেখে তবে জলখেলা করে,
গোপীর বসন লয়ে কানাই সেদিন ডালে বন্ধন করে।
জলখেলা করতে গোপী পার পানে চায়,
শুকান বস্ত্রখানি দেখিতে না পায়।
ঝড় নাই ঝঙ্কার নাই বস্ত্র কেবা লয়,
নন্দের বেটা চিকণ কালা গোপীর বসন ধ'রে লয়।
কে নিলে বস্ত্র সকল গোপীগণ কেঁদে কয়
বলে চল চল যাব আমরা কংস রাজার ঠাঁই,
কৃষ্ণের অভিতাপে আর জাতি কুল নাই।
কৃষ্ণ বলে বারে বারে তোমরা দিওনা কংসের তুলনা,
আমি শিশুকালে বধেছি কংসের ভগিনী পুতনা।
বলে, পুরুষ বট শ্যাম নাগর সব তোমার সাজে
আমরা যদি পুরুষ হতাম মরে যেতাম লাজে।
পরের নারীর বসন লয়ে কেবা ডালে বাঁধে।
জল খেলা সাঙ্গ হল, সকল গোপী গৃহে চলে যায়।
তখন সাজ সাজ বলে বড়াই নগরে দিল সাড়া
বড়াই বুড়ীর বাত্রায় সাজিল গোপের পাড়া।
কে কে যাবি গোপী সকল তোমরা মথুরার হাটে চল
তখন রাধে বালে ওগো দধির ভার লবে কে ?
বলে নন্দের বেটা চিকণ কালা ওকে দধির ভার লয়ে দাও
শুভ সুবর্ণার বাঁকখানি বেল্ল পাটের শিকে
কৃষ্ণের কাঁধে ভার দিয়ে গো লয়ে চলিল রাধিকে।
আমাদের যেথায় না বিকাবে দধি সেথায় নিয়ে যাব,
মনের সহিত তোমায় নগরে ঘুরাব।
কৃষ্ণ বলছে আমরা তো বইনা ভার জগতেরি সার।
রাধ প্রেমের জন্য তাইতে কাঁধে বইছি ভার।
তখন দধি দুগ্ধ ছানা মাখন লয়ে চলিল

দানখন্ডে গিয়ে তখন উপস্থিত হইল।

শীঘ্রগতি পার কর কানাই তুমি বেলাপানে চেয়ে

দহি দুগ্ধর সময় যাচ্ছে বয়ে।

দুগ্ধের লব পণ পণ নবনীর লব বুড়ি,

কড়া কমতি হলে আমি মারব চোঙ্গার বাড়ি।

বড়াই বলে কাজে নাই কানাইয়া কৃষ্ণ তোমার ভাঙ্গা লা

ডারাইছে গোপের নারী কপালে মারে ঘা।

কৃষ্ণ বলে ভাঙ্গা লয় টুটা লয় ভক্তি-ভাবের তরী

হস্তী ঘোড়া পার করেছি ওগো শ্রীরাধা কত ভারী।

সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা

শ্রীরাধাকে পার করিতে লিব কানের সোনা।

সোনা লাভ শাড়ী সকল দিতে পারি

তবু তো দুকূল যমুনার জল হেঁটে যেতে নারি।

এই ঘাটের নৌকাখানি ওঘাটে লাগাল

মথুরায় গমনে সকল গোপী চলিল।

মথুরাতে গিয়ে গোপী করে বেচা কেনা,

দ্বারে বাজ্‌ছে নহবতখানা প্রেম কাঙ্গালী যেতে মানা।

ডাকিলে উত্তর মেলে না বুঝি বিষয় গেল

এইখানে সকল খেলা সাঙ্গ হয়ে গেল।

উপরিউক্ত কৃষ্ণলীলা গানটির দুটি পংক্তি রুণা লায়লার গানে বেশ প্রত্যক্ষভাবেই উঠে এসেছে লক্ষ্য করা যায়। পংক্তি দুটি হলো— 'সব সখীকে পার করিতে লিব আনা আনা/ শ্রীরাধাকে পার করিতে লিব কানের সোনা।' আবার, রামায়ণ কেন্দ্রিক পটুয়াদের গানে সিন্ধুবধ, শ্রীরামের জন্মবৃত্তান্ত, শ্রীরামের বিবাহ, তাড়কা বধ, অহল্যা উদ্ধার, শ্রীরামের বনবাস ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। এখানে কিছুটা অংশ উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরছি ——

রাম রাম পিভু রাম কমললোচন

দিব্যাদলে শ্যাম রাম জানকীই জীবন।

রথের উপরি রঘুনাথ কিঞ্চিৎ ভূমিস্থলে

হৃদয় পেসন্ন নাম, মধুর বাক্য বলে।

বামে সীতা বসিবে ডাইনে লক্ষ্মণ
রত্ন সিংহাসনে বসে প্রভু নারায়ণ।
যাহার নাম লইলে খন্ডিবে দেহের পাপ।
পুরাণে ছিলেন বাল্মীক মনি জানিবেন আপনি।
ছিরাম জন্মিবে প্রভু জানিছে আপনি
পিতা হবে দশরথ অজির নন্দন।
রামের কথা কিবা কব বাখান
যাহার গুণে বনের বন্দী পাষাণ ভাসে জলে।
শিকার করিতে রাজা করিলেন সাজন
সিন্ধুমনির স্তপবনে রাজা দিল দরশন।
সিন্ধুমনিকে বাণ মারে সুরষ নদীর কোলে
রাম নামের ধন্যি ক'রে সিন্ধু জলেতে পড়িল।
রাম নামের ধন্যি রাজা কর্ণেতে শুনিল
হাতের ধেনুক বাণ রাজা ভূমিস্তে রাখিল।
পাতালি কোলে কোরে আসি সিন্ধুমনির নিকটে আসিল।
নেপুরের উনুঝুনু প্রভু শুনিতে পাইল।
এসো এসো বলে সিন্ধু বলে সম্ভাষণ করিল।
এক নিবেদন করি গো, মনি মহাশয়
তোমার সিন্ধু মারা গেছে সুরষ নদীর কুলে।
আরে কি কার্য করিলি রাজা কি কার্য করিলি
আমার অন্ধের নড়ি রাজা তু কেন ভাঙ্গিলি।
আমি যেমন পুত্রশোক পাইলাম আচম্বিতে
এমনি পুত্রশোক রাজা পাবি অযোধ্যানগরে।
অপুত্রবর ছিল রাজার পুত্রবর হইল
সহস্তি সহস্তি করে নাচিতে লাগিল।
মিথিলা নগরে আসি যজ্ঞ আরম্ভিল
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এসে যজ্ঞ পূর্ণ দিল

যজ্ঞ থেকে দুইটা তরু জুটিল।

মিথিলা, কৈকয়, কৌশল্যা, বাঁটিয়া খাইল

রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন চার ভাই জন্মিল।

গানের ঢঙটি পাঁচালী গানের মতোন। সুর করে টেনে-টেনে পটুয়ারা এ গান গেয়ে থাকেন। অনেক সময় রামায়ণের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেও পটচিত্র যেমন অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি রচিত হয়েছে দেখা যায় পটুয়া গান। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায় বলা যায় — "পটুয়া অতি সতর্কতার সঙ্গে রামায়ণের বিস্তৃত কাহিনী হইতে সর্বজনীন আবেদন-ভিত্তিক এবং একটি বৃত্তান্ত সন্ধান করিয়া লয়।" যেমন এখানে একটি গানের কিছু অংশ উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরছি। গানটিতে সিন্ধ মুনির বধের বৃত্তান্তটি উঠে এসেছে—

রজ রাজার পুত্র রাজা নামে দশরথ

শোভা করে বসে রাজা যত প্রজাগণ।

অপত্রিকা বলে রাজা দেশে নাহি রহিব

আজ হতে অযোধ্যা মোরা পরিত্যাগ করিব।

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়

গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট লক্ষ্মী উড়ে যায়।

নারদ মুনি বলে, কথা শুন মহাশয়,

শনিকে জিনিতে পারলে রথ শয্যা হয়।

নারদের কথা রাজা কর্ণেতে শুনিল

শনিকে জিনিবার জন্য রথ সাজাইল।

জামা জোড়া নিল ঘোড়া পায়েতে পামরী

গলাতে তুলসীর মালা বিনন্দে লগুরী।

শনি রাজা বসে আছেন ধর্ম সিংহাসনে

শনিরি রিষ্টিতে রথ ওড়ে স্বর্গ পানে।

রথ রথী সারথি ঘোড়া উড়িতে লাগিল

কোথায় ছিল জটায় পক্ষ, রাজ ধরে নামাইল।

আপনার গলের পুষ্পমালা রাজা জটায়ুর গলে দিল

জনমে জনমে রাজা মত্যতা পাতাইল।

আমার মিতে জটা তোমার আমি মিতে

ওগো বিপদে সম্পদে যেন মনে রেখো মিতে।
বনে থাকি বনের পশু রাজা মত্যতার কিবা জানি
আমার সঙ্গে মত্যতা রাজা পাতায়েছ আপনি।
এইখানে থাক মত্য রথ আগুলিয়া
আজ মৃগ শিকার করে আনি বনল কাননে।
বত একাদশী করেছিল বনের অন্দক ব্রাহ্মণ
পারণের জল আনরে বাপ গুণের সিন্ধুমনি।
নিত্য নিত্য যাই সরবরের ঘাটে
আজতো যাব না, পিতা, কি আছে কপালে।
কাল গেছে, বাপ, একাদশী আজ ব্রাহ্মণ ভোজন
শিগির করে জল আন, বাপ, করিব পারণ।
ওই কথা শুনে সিন্ধু কমুন্ডল লিল হাতে
কাঁদিতে কাঁদিতে জল আনিতে যায় সরোবরের ঘাটে।
সবোবরে জল পোরে আনন্দিত মনে
জলের ভুকভুকি রাজা কর্ণেতে শুনিল।
বনের মৃগয়া হরিণ বলে বাণেতে বধিল।

গৌরাঙ্গলীলাও পটের বিষয় হয়ে ওঠে। গৌরাঙ্গলীলার মধ্যে অবশ্য বৈরাগ্যের কথাই বেশি উঠে এসেছে পটে। কিন্তু গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ ঘটার মধ্যে যে করুণ মানবিক আবেদন ফুটে উঠেছে সেটাই সাধারণত পটচিত্রে প্রধান বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে লক্ষ্য করা যায় গৌরাঙ্গলীলা-বিষয়ক পটচিত্রে পটুয়াদের গানে। এখানে এরূপ একটি গান থেকে খন্ডাংশ তুলে ধরছি ---- যেখানে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে গৃহত্যাগের করুণ মানবিক আবেদনটি-----

ডোর নিলে, কৌপীন নিলে নিমাই করঙ্গু নিল হাতে
চলিল গো শচীর দুলাল পাতকী তরাতে।
পড়ে রইল খাট-পালঙ্গ বাঁধ বন্ধন বালা
নিমাই বিনে তোলা রইল কেশরীর মালা।
খাট পালঙ্গ পেড়ে দেখুন শচীমাতা সুখে নিদ্রা যায়
যমের ভগ্নী কালনিদ্রা শচীমাতাকে নিদ্রাতে চাপায়।

এক ডাক দুই ডাক নিমাই তৃতীয় ডাক দিল
তৃতীয় ডাক দিয়ে নিমাই সন্ন্যাস ধর্মে গেল।
কেশবী ভারতী এসে কিবা মন্ত্র দিল
সেইদিন হইতে প্রাণের নিমাই উদাসীন হইল।
রাত্রি প্রভাত হইল কোকিলে করে রা
শয়নে মন্দিরে ছিলেন শচীমাতা ঝেড়ে তোলেন গা।
কেন জনম নিলিরে বাপ নিমবৃক্ষ মূলে
হয়ে যদি মরিতি না করিতাম কোলে।
কাল তোরে দিলাম বিয়া কুলীনের ঝি
ঘরে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া তার উপায় হবে কি?
বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতা দেখুন কাঁদিতে লাগিল।

এখানে লক্ষণীয় শেষোক্ত সাতটি পংক্তিতে করুণ মানবিক যে আবেদন এই গানটিতে ফুটে উঠেছে তা সাধারণভাবে সকলকেই বেদনাহত করে। আবার,প্রধাণত পৌরাণিক আখ্যান বা কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও পটুয়ার গানে বাংলা ও বাঙালীর নিজস্ব জীবনধারাও প্রতিফলিত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়।

এক সুধী প্রবন্ধিক গুরুসদয় দত্ত মহাশয় তাঁর "পটুয়া সঙ্গীতে"র এক শীর্ষক আলোচনায় সুন্দর কটি কথা বলেছেন —" পটুয়া শিল্পীর বৃন্দাবন বাংলাদেশে, অযোধ্যা বাংলাদেশে, শিবের কৈলাস বাংলাদেশে, তাহার কৃষ্ণ, রাধা, গোপ গোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙ্গালী। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বাঙ্গালী, শিব ও পার্বতীও পুরা বাঙ্গালী। বড়াই বুড়ীর ছবি বাঙালী ঠাকুরমা ও দিদিমার নিখুঁত রসময় প্রতিমূর্তি।" যথার্থই বলেছেন তিনি। পটুয়ার গানে চাষ পালা, শিবের মাছ ধরা ইত্যাদি যে আখ্যানগুলি উঠে এসেছে তা থেকে এ সত্যই নিরূপিত হয়। যেমন --

চারিদিকে বাঁধ বেঁধে মধ্যে রাখেন বায়
এলো জাল ফেললে ঠিকনে দিলেন খুটো
হস্তে টিপনে জল ছেঁচেন মুঠো-মুঠো
হস্তে জল ছেঁচেন দুর্গা মুখে গীত গায় —
জলের ঝপঝপানিতে লক্ষ যোজন ধেয়।
যেখানে না পায় মৎস্য তুলে মারে বাড়ি
ভাঙ্গে না শিবের ধান ছিঁটে করেন গুড়ি।

রাঢ় অঞ্চলের পট শিল্প ও শৈলী বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে তার ঘরানারও পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে রাঢ় দেশের পটশিল্প ও শৈলীর বলিষ্ঠ আদর্শ যখন শিথিল হতে আরম্ভ করলো তখন অনেক আদর্শ বিচ্যুতিও ঘটে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ---"সেই সময় এক শ্রেণীর পট রাঢ় দেশেও অঙ্কিত হইয়াছিল। তাহা বিশেষ কোন একটি বিষয়-বস্তুর পরিবর্তে বিভিন্ন বস্তু লইয়া অঙ্কিত হইত। তাহাকে পঞ্চককল্যানী পট বলিত। পূর্ব বাংলার কোন কোন অঞ্চলে এক শ্রেণীর পঞ্চককলাণী পটেরই প্রদর্শনী হইত, একই কোন বিষয় আনুপূর্বিক তাহাতে স্থান পাইত না।" দক্ষিণ - পূর্ববঙ্গে আবার আর এক শ্রেণীর পট প্রচলিত ছিল, তাকে বলা হতো গাজীর পট। এই গাজীর পট সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় যে মত ব্যক্ত করেছেন তা প্রণিবান যোগ্য - "মুসলমান ধর্মপ্রচারক ও ধর্মযোদ্ধাকে গাজী বলিত। তাঁহার অলৌকিক শক্তির নানা কল্পিত কাহিনী বর্ণনা করিয়া গাজীর পট অঙ্কিত হইত, তাঁহার অলৌকিক শক্তির মধ্যে একটি শক্তি ছিল তাঁহার সুন্দর বনের ব্যাঘ্রকে দমন করিবার শক্তি। সুতরাং তাঁহাকে ব্যাঘ্রারূঢ় করিয়া ব্যাঘ্রকূলকে দমন করিবার বৃত্তান্ত লইয়াও পট চিত্রিত হইত। পূর্ব বাংলার পঞ্চককল্যাণী পটে রামাণ-ভাগবত-গৌরাঙ্গ - লীলা প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে গাজী সাহেবের ব্যাঘ্র দমনের চিত্র প্রদর্শিত হইত।"

আবার, গাজীর গানের ভেতরেও ব্যাঘ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ করে ব্যাঘ্র তাড়াবার কথা। যেমন একটি চট্টগ্রাম অঞ্চলের গান ---

গাজী এখনকার দিনে --- শাশুড়ির বউ ঝগড়া করে গুয়া বাগানে (ধুয়া)।।

বাঘ মারিতে যায়রে গাজী জঙ্গলার ভিতরে।

চৌদ্দশ বাঘ মারিয়া গাজী থলিয়াতে ভরে।।

বাঘের পিঠে বাড়ি দিল হুকার করিয়া।

ভাইর পুতের বৌরে বাঘে নিল খোপায় কামড় দিয়া।

গোয়ালিয়ার পোলায় যায় দধির ভার লইয়া।

তিন মাসের বাছুর ফেলে চেঙ্গরা বাঘে খাইয়া।।

ঝিয়েরে না দিয়া বুড়ি নাতিরে না দিয়া।

চৌদ্দ কুড়ি পিঠা খাইছে খেতা মুড়ি দিয়া।।

কামের কথা শুন্‌লে মাগীর গায়ে উঠে জ্বর।

বিয়ার কথা শুন্‌লে বুড়ি খুশিতে জরজর।

হায়রে আবাগ্যা বুড়ী খোপার লাগি কান্দে।

কচু পাতার ডিবলা দিয়ে মস্ত খোঁপা কান্দে।।

গাজী এখনকার দিনে —— শাশুড়ী বউ ঝগড়া করে গুয়া বাগানে।. . .

যদিও, পশ্চিমবাংলার পঞ্চকল্যাণী পটে গাজীর বিষয় কিছু থাকে না। কিন্তু সাহেব পট বা সাঁওতালী পটে অবশ্য সাহেবদিগের বা সাঁওতালের কিন্তু দিনযাপনের ঘটনা ও স্থানভিত্তিক স্থানীয় বিষয় লক্ষ্য করা যায়।

মোদ্দাকথা হলো। পটুয়াদের গান আজো একদম লুপ্ত হয়ে যায়নি। তবে আগের মতোন এর জনপ্রিয়তা নেই। জনপ্রিয়হীন হওয়ার মূল কারণ অবশ্যই পরবর্তীকালে পটুয়াদের গানে রুচিহীনতার অবাধ প্রবেশ। তবে, একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলার জীবন ও সাহিত্যে পটুয়াদের গান এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কারণ হিসেবে গরুসদয় দত্তের কথার প্রতিধ্বনি করে বলা যায়---

"ইহা কোল অভিজাত সমাজের ভাববিলাসব্যঞ্জক সাহিত্য নয় —— জতির সাধারণ জনগণের প্রাণ যে অনাবিল ও বিলাস — কলুষহীন ভাবধারার ও কল্পনাধারার জীবন্ত প্রবাহে ভরপুর ছিল তাহার এবং বাঙ্গালী ----হিন্দুর গভীর অন্তশ্চরিত্রের ও ধর্ম বিশ্বাসের রসপূর্ণ অথচ সহজে স্বাভাবিক ও সরলতা মাখা রূপায়ণ।

বৌদ্ধ পরবর্তী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার আত্ম-সংস্কৃতির ও সভ্যতার মূল উৎসের সন্ধান এই পটগীতে বা পটুয়ার সঙ্গীতগুলিতে যে রূপ সহজ,সরল, সুস্পষ্ট ও অনাড়ম্বর ভাবে পাওয়া যায়, সেরূপ আর কোথাও — পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।"

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩৪৬, অগ্রহায়ণ সংখ্যা) "পটুয়া সঙ্গীত" শীর্ষক একটি নিবন্ধে সুন্দর একটি কথা বলেছেন — " সঙ্গীত ও চিত্রকলার এরূপ অপূর্ব সমাবেশ আমরা অন্যত্র পাইনা।" যথার্থই বলেছেন তিনি। পটচিত্র ও সঙ্গীত এ কারণে পরবর্তীকালে আধুনিক কবিদের মনে এক আলোর সন্ধান দিয়েছে। আধুনিক কবিতার ভেতরে তাই ছবির পর ছবি গেঁথে-গেঁথে ভাষা-ব্যঞ্জনে কাব্যরচনার ঝোঁক বিশেষ করে কবি জীবনানন্দ দাস, অমিয় চক্রবর্তী ও সমর সেনের কবিতায় ছবির পর ছবি গড়ে তোলার এক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে এ-ভাবনার তীব্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় কবি বিনয় মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতে। এমনকি, সত্তরের কবি জয় গোস্বামীর কবিতাতেও এ-ভাবনার তীব্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

খেমটি গান

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া অঞ্চলে নাচ গানের একশ্রেণীর ব্যাবসায়িনী আছে, এদেরকে বলে নাচনী। কেউ কেউ বলে খেমটি। নাচ্‌নীরা নাচের সময় যে গান গেয়ে থাকেন এবং এদের পৃষ্ঠপোষক রসিকেরা যে গান গেয়ে থাকেন তাকেই বলা হয় খেমটি গান বা খেমটি ঝুমুর। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলের উত্তর পশ্চিম সীমান্তেও এ গানের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

এই খেমটি গানওয়ালা নাচ্‌নীদের জীবন ইতিহাস বড়ই করুণ ও বেদনাদায়ক। নিম্নশ্রেণীর পরিবার ভুক্ত সুশ্রী মেয়েরাই সাধারণত এই পেশায় জড়িয়ে পড়েন। ছোটবেলো থেকে দেখতে সুশ্রী হওয়ার জন্য ও সুকণ্ঠের অধিকারী হওয়ায় তাদের বাবা-মায়ের আর্থিক ফয়দা তোলার জন্য একপ্রকার গৃহে তাদেরকে নৃত্যগীতে তালিম নিতে বাধ্য করেন। নৃত্যগীত শিক্ষায় একটু পারদর্শী হয়ে উঠলে এবং বয়ঃ প্রাপ্তের সঙ্গে সঙ্গে এইসব শ্রেণীর মেয়েরা গঞ্জুদিগের কাছে দাসী হয়ে যান আজীবন ভরনপোষন ও অর্থের বিনিময়ে। এইসব নাচ্‌নী মেয়েদের কোনকালে বিবাহ হয় না। বলা যায়, সমাজে তাদেরকে পতিত মনে করে সকলে। এজন্য তাদেরকে ঘরের বউ করে তোলার কথা কেউ ভাবতে পারে না। ফলে এসব মেয়েরা সংসারে গৃহিনীর মর্যদা লাভ থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হয়। সন্তান ধারন করে তাই মা-হবার সাধ এদের পূরণ হয় না। আবার গঞ্জুদিগের কাছে এদের রূপ ও যৌবন যতদিন স্থায়ী থাকে, ততদিন কদর। তবে, শেষজীবনে এরা মনের দিক থেকে অসহায় বোধ করলেও গঞ্জু কর্তৃক বিতাড়িত হয় না, গঞ্জুদিগের বাড়িতে আমরণ পর্যন্ত জীবনযাপন করার অধিকারটুকু বজায় থাকে। তবে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে খুব দুঃখ - কষ্টে জীবনযাপন করতে হয় তখন। যেন কোনরকমে দিন অতিবাহিত করা আর কি! এই নাচ্‌নীদের জীবন-সম্পর্কিত অবলম্বনে নাট্যকার ও কথাশিল্পী বৈদ্যলাথ মুখোপাধ্যায় একটি সুন্দর গল্প লিখেছেন। গল্পটির নাম 'নাচনী'। দেশ পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে।

তবে, এই নাচ্‌নী বা খেমটিওয়ালীদের অবাঙালীদের কাছেই শেষপর্যন্ত কাটে প্রায় সবটা জীবন। ছোটবেলায় যেহেতু বাবা-মার ঘরে বাংলা ঝুমুর গানে তালিম নেওয়ার ফলে তা সমস্ত জীবনব্যাপি গেয়ে থাকেন, কেবল বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সংমিশ্রণে আসার জন্য তাদের উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটে। তবু অবাঙালী উচ্চারণেও তারা বাংলা ঝুমুর গানকে ব্যবহার করে। প্রয়োজনে তার কিছু কিছু ওরাঁও এবং ভোজপুরী হিন্দি গানও শিখে নেয়। ফলে বাংলা, হিন্দি, ওরাঁও প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার শব্দ গড়ে ওঠা তাদের গানগুলি এক বিচিত্র জগাখিচুরির রূপ ধারণ করে। তখন গানের সুরের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য এমন কিছু লক্ষ্য করা যায় না যা অভিভূত করে। সুরের মধ্যে মোদ্দাকথা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনা।

বাংলার লোকসঙ্গীত অবাঙালী অঞ্চলে পরিবর্তনের ফলে রূপ নির্মিতিতে কেমন প্রকাশ ঘটেছে, তার কিছু উদাহরণ এখানে তুলেধরা যেতে পারে। মধ্যভারতের যাশপুর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বাঙালীনাচ্‌নীদের গান থেকে কটি দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরছি —

১. ঠাকুরজী যায় গঙ্গা নাহায় রে।
ভাই মোরা ভরিয়া যায় লা।।

২. চকোরা ফুলি গেলা হরিয়র মাই।
চকোরা ফুলি বড়া শোভয়।।

৩. নহিয়ারা নহিয়ারা মতি করু সঙরো।
নহিয়ারা দেখলি তোহার।।
কাঠিকের ঘর না হ মাটিকের ছাব না।
উপরে ত খেড়ক ডব না।।

৪. দুইও সাইতিন চালা মাছে র মারে,
কাশা নাদী বানা ভিতরে।
ছোটকী যে লেল ফাটন নাচুয়া
বড়কী যে ভোট মকরী।।

এই রকম আর কি! ঝুমুর গানের মিষ্টি লিরিক্যাল মেজাজটি অনেকখানিই খুন্ন হয়ছে বলা যেতে পারে। যা নাচ্‌নীরা পূর্বে পিতৃগৃহে ছোটবেলা থেকে নিজেরা রপ্ত করেছিল।

তবে, নাচ্‌নীদের নাচের ব্যবসায়ের মধ্যে শালীনতার যত অভাবই থাকুক না কেন, বাংলা খেমটি ঝুমুর যে গানগুলি ওরা গাইত তার সুর ও কথা যেমন মিষ্টি --- তেমনি কিন্তু এদের গীতগুলি অবশ্য রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিষয়কে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে। প্রেমের স্বর্গীয় রূপের প্রকাশই ঘটে নাচ্‌নীদের গাওয়া গানে। এখানে বাংলার নাচ্‌নীদের নাচের এরূপ খেমটি ঝুমুর গানের দৃষ্টান্ত উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরছি। উদাহরণ হিসেবে বাংলার নাচ্‌নীদের কয়েকটি খেমটি ঝুমুর গান এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ রাখছি এ কারণে ---- এই গানগুলি পাঠ করলেই সহজে পাঠকেরা বুঝতে পারবেন সাহিত্যগত গুণসমন্বিত এই গানগুলি সুরছন্দে এবং লিরিক্যাল মেজজে কত হৃদয়স্পর্শী, বিশেষ করে মধ্যভারতের যাশপুর অঞ্চলের সংগৃহীত গানগুলির থেকে মেজাজ ও শিল্পগুণে যার আসমান জমিন ফারাক। যেমন --

১. শুনগো বিন্দে, দিবানিশি প্রাণ কাঁদে গো;
আমি থাকিতে না পারি ধৈর্য ধরিয়া।
গো বৃন্দে, এখনও না এল কালিয়া।।

২. শুনগো, সহচরি, আনগো গরল খেয়ে মরিগো,
আজি এ জীবন রাখিব কার লাগিয়া।
গো বৃন্দে এখনও না এল কালিয়া।।

৩. প্রেম কি সহজে হয় আগাম দিগাম ভেবে কয় গো,
ভেবে দেখ মন, ছিটা দুধে না বসে আর সর গো।।
খুলে কথা গোচরে বল।।
ধ্বনি বলগো খুলে কথা গোপনে বল।।

৪. গাঁথিব ফুলেরই মালা, যতনে সাজাব কালা,
আমি ঘুচাব মনের জ্বালা, দুঃখ যাবে দূরে।
বন্ধু, হৃদয় মাঝারে শ্যামকে রাখিব আদরে।
না আইলে নন্দবালা কেমনে মিটাব জ্বালা!
থাক থাকপ্রাণবল্লভ বাঁধা প্রেম-ডোরে হৃদয় মন্দিরে।
শ্যামকে রাখিব আদরে।।

খেমটি নামক এই নৃত্যগীতিটির আবার কুইলাপালে অধিক প্রচলিত না হলেও সেখানে বিভিন্ন মেলাতে নাচের সঙ্গে এই গান প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে ''পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোক-সাহিত্য'' গ্রন্থে ডঃ সুভাষ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন -----

''সেই অনুষ্ঠান থেকেই গান শ্রবণ করে কুইলাপালের যুবক-যুবতীরা বিশেষ করে যুবকেরা আনন্দের সময়ে এই গান নিজেদের মধ্যে গেয়ে থাকে। তবে কুইলাপালে এটা দেখা গেছে যে কোনো গৃহস্থ নারী এই গান সহজে সকলের সামনে গায় না। খেমটি গান সেইজন্য সাধারণতঃ এই অঞ্চলের নিষিদ্ধ গান বললেও চলে।''

খেমটি নাচ কলকাতাব শহুরে বাবুদের কাছে আনন্দ-উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল, এবং খেমটি নাচনেওয়ালীদের নিয়ে খেমটি গান উপলক্ষ্যে জমিদারবাবু মহারাজদের মধ্যে একটা স্ফুর্তির ফোয়ারা বইত তা কালীপ্রসন্ন সিংহের ''হুতোম প্যাঁচার নক্সা'' গ্রন্থটি থেকে আমরা জানতে পারি। কালক্রমে এই খেমটি গানের নাচনেওয়ানলীদের মধ্যে এক অশ্লীল বারাঙ্গনাবৃত্তিও ঢুকে পড়ে। কলকাতা শহরে এই খেমটি নাচের বারঙ্গনাবৃত্তির যে প্রসার ঘটেছিল এবং তারা জমিদারবাবুদের সপরিবারকে যেমন গান গেয়ে আনন্দ দান করতেন, তেমনি কেউ কেউ কোনো জমিদারবাবুদের স্ফুর্তির খোরাক হিসেবে বে-আব্রু হয়ে যেতেন। বলা যায়, এই খেমটি গান ও খেমটি গানের নাচ্নীদের নিয়ে কলকাতার জমিদার মহলে একটা মজলিশের কুরুচিপূর্ণ কালচার গড়ে উঠেছিল। এই কাল্চার ''হুতোম প্যাঁচার নক্সা''

গ্রন্থে কালীপ্রসন্ন সিংহ বলেছেন শ্লেষাত্বক ভাবে ----

" খ্যামটা বড় চমৎকার নাচ! সহরের বড়মানুষ বাবুরা প্রায় ফি রবিবারে বাগানে দেখে থাকেন। অনেক ছেলেপুলে, ভাগ্নে ও জামাই নিয়ে একত্রে বসে --- খ্যামটার অনুপম রসাস্বাদনে রত হন। কোন কোন বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান — কোনখানে কিস না দিলে প্যালা পায় না -- কোথাও — বলবার যো নয়!

বারোয়ারিতলার খ্যামটা আরম্ভ হলো,যাত্রার। যশোদার মত চেহারা দু'জন খ্যামটাওয়ালি ঘুরে কোমর নেড়ে নাচতে লাগলো, খ্যামটাওয়ালারা পেছন থেকে "ফণির মাতার মণি চুরি কল্লি, বুঝি বিদেশে বিঘোরে পরাণ হারালি" গাচ্চে; খ্যামটাওলিরা ক্রমে নিমন্তুন্নেদের সকলের মুখের কাছে এগিয়ে অগ্‌গরদানি ভিকিরির মত প্যালা আদায় করে তবে ছাড়লেন! রাত্তির দু'টোর মধ্যেই খ্যামটা বন্ধ হলো --- খ্যামটাওয়ালিরা অধ্যক্ষ মহলে যাওয়া-আসা কত্তে লাগলেন, বারোইয়ারিতলা পবিত্র হয়ে গ্যালো।"

কাজেই, উপরিউক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের কথাগুলি থেকেই বোঝা যায়, খেমটি গানের নাচ্‌নীদের জীবন কেমন করুণ ও দুর্বিষহ ছিল। প্রয়োজনে এই খেমটি নাচনেওয়ালীরা একপ্রকার শালীনতা বিসর্জন দিতে বাধ্য হতো অর্থের বিনিময়ে বা জীবিকানির্বাহের রসদটুকু আরোহণের জন্য।

যেহেতু, খেমটি গান কলকাতা শহুরে বাবু-সম্প্রদায়ের ও জমিদারবাবুদের মনোরঞ্জন ও আমোদ - প্রমোদের একটি বিশেষ দিক হিসেবে গণ্য হতো, সেহেতু কলকতা শহরে খেমটি গানের তখন বেশ রমরমা আসর জমতো। এই রমরমা আসর ও জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখেই সম্ভবত নাটকের দিকপাল শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী গিরীশচন্দ্র তাঁর নাটকে খেমটি গানকে গ্রহণ করেছিলেন কথা ও সুরে। "জনা" নাটকের ১ম অঙ্কের ১ম দৃশ্যই যা লক্ষণীয়। যেমন ---

প্রাণ কেমন করে সজনি।
কেন এলনা গুণ মণি।
ভুলে ত থাকে না সই,
শুকালে কমল বল এলো কই,
কোমল প্রাণে কত সই,
কেন এল না, বল না, আপনি গো চল না;
কিসে রমণী বাঁচে ধনি বিহনে হৃদয় মণি!

"মায়াতরু" নাটকেও এই খেমটি গান লক্ষ্য করা যায় ----

না জানি সাধের প্রাণে

কোন প্রাণে প্রাণ পরায়ে ফাঁসি,

আমি তো প্রাণ দেবো না,

প্রাণ নেবো না

আপন প্রাণে ভালবাসি।

চপলা করে খেলা, ধরে গলা,

বেড়াই সদাই অভিলাষী

তারা তুলে পরবো চুলে,

করবো চুরি চাঁদের হাঁসি।

আবার। " প্রফুল্ল" নাটকেও খেমটি গানের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। নাটকের ২য় অঙ্কের ৩য় দৃশ্য যা লক্ষণীয় -----

(ও আমার) ঘরে থাকা এই চোটে মুস্কিল

ড্যাগরা নাগর বরণ দু-পোড়,

বদনখানি বাদার বিল।।

মরিস কি আঁকা বাঁকা, চেপ্টা নাকে নয়ন ঢাকা,

অস্তে গেছে বাছার দাড়া উল্টৈ ঠোঁটে মজার দিন।।

বলা যায়, খেমটি গান শহুরের শৌখিনবিলাসী বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য বাংলা নাটককে প্রভাবিত করেছে, এযুগে অবশ্য হিন্দী ছায়াছবিতেও খেমটি গানের সুর ও নৃত্য মাঝে-মধ্যে নজরে আসে। একটা কথা বলা এখানে উচিত হবে, খেমটি ঝুমুর বা খেমটি নাচের গান যেহেতু ভাব - প্রধান সঙ্গীত --- বিরহ এবং বিচ্ছেদের ভাবই প্রধাণতঃ যেখানে প্রকাশ পায় সেহেতু এ গান পরবর্তীকালে আধুনিক বাংলা গান ও কবিতাতেও প্রভাব বিস্তার করেছে।

এখানে বিরহ এবং বিচ্ছেদের ভাবযুক্ত দুটি খেমটি ঝুমুর গানের উদাহরণ তুলে ধরছি। যা ভাব ও বিষয়বস্তুতে বেশ মর্মস্পশী, সহজেই হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয় এক বেদনার মধুর রসে রসসিক্ত করে----

১. আগে মোরে দিয়ে আশা এখন কেন নৈরাশ গো,

এই মিনতি করি আমি না বাসি আর পরগো।

খুলে কথা গোচরে বল ধনি বলগো।

খুলে কথা গোপনে বল।।

২.　　যাও হে, আসিতে বল বল ঝাট করি,

শ্যাম বিনা উপবাসী --- আমরা আছি দীনাচারী।

কুলে রইতে নারি গো।

চিতে না মানে শ্যাম ভারী।।

দুঃখিনীরা দুঃখনীরে বিদেশীরা ভাঙে হাঁড়ি গো,

পর পুরুষের রূপ হেরি আমরা পাসরিতে নারি গো;

কবিওয়ালাদের কবিয়াল গানের মধ্যেও খেমটি নাচ ও গানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এক কথায় বলা যায়, শহুরে জমিদারবাবু ও বাবুসম্প্রদায়েরা মনোরঞ্জনের জন্য সম্ভবত খেমটি গানের ধাঁচে গান রচনা করতেন। কবিয়ালরা তালে তালে নৃত্যের সঙ্গে গান পরিবেশন করতেন। এ কারণে খেমটি গানের মতন প্রেম বিষয়কেও তারা বিষয়বস্তু রূপে গণ্য করতেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর " বাংলার লোকসাহিত্য" গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে বলেছেন ---" অনেক সময় উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালার গানের ভাষাও যেন খেমটি নাচের গানের মধ্য দিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।" আশুতোষবাবুর কথা থেকেই সমর্থন মেলে কবিওয়ালাদের গানেও খেমটি গানের প্রভার পড়েছিল। কাজেই জনপ্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রেখেই বলা যায় কবিওয়ালারা বাবুসম্প্রদায় ও জমিদার বাবুদের মনোরঞ্জন হেতু খেমটি গানের ভাষাকে গ্রহণ করেছিল। একপ্রকার জীবননির্বাহের জীবিকার তাগিদেই। কবিগান যে ঝুমুর গানের কাছে ঋণী তারও সমর্থন পাওয়া যায় "গৌড়াঙ্গ সংস্কৃতি " গ্রন্থের লেখক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কথায়।

ঝুমুর গান যেহেতু সৃষ্টির দিক থেকে হাজার বছরের পুরনো, এবং ঝুমুর গানের ধারারই অনুসৃত ব্যাপারটিকে মেনে নিয়েছেন।

নাচ্‌নীরা নৃত্য ছাড়া বৈঠকী আসরে আবার শুধু গানও গাইতেন। বেশ জমতো সে সব গানের আসর। এরূপ আসরকে বলা হতো নাচ্‌নী বৈঠকী ঝুমুর। এসব গানের আসর শহুরে জমিদারবাবুদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় ছিল। মাঝে-মধ্যে তারা এরূপ বৈঠকী আসর বসাতেন। এখানে এরূপ বৈঠকী আসরের কটি গান উদাহরণ হিসেবে এখানে তুলে ধরছি -

১.　　কুঞ্জেতে আসিবে হরি কুঞ্জ সাজাও সহচরী,

বাসর সাজাব নামা ফুলেতে ও নলিতে,

চল চল যাব ফুল তুলিতে।।

ফুলের বিছানা করি, ফুলের বালিশ করি

আলস ভাঙিব শ্যামের কোলেতে।

ওগো নলিতে চল চল যাব ফুল তুলিতে।।

২. গাঁথিব ফুলেরই মালা, যতনে সাজাব কালা,
আমি ঘুচাইব মনের জ্বালা, দুঃখ যাবে দূরে।
বন্ধু, হৃদয় মাঝারে শ্যামকে রাখিব আদরে।
না আইল নন্দবালা কেমনে মিটাব জ্বালা
থাক থাক প্রাণবল্লভ বাঁধা প্রেম-ডোরে হৃদয় মন্দিরে।
শ্যামকে রাখিব আদরে।

৩. উচ্চস্বরে বাজে বাঁশী শ্রীরাধার নাম ধরি,
বাঁশীর স্বরে মরিল বনের হরিণী।
নব নব নবরঙ্গিণী ব্রজের গোপিনী কি খেনে জন্মিল বাঁশী.
বাঁশী করে সর্বনাশী।।
এমনি পিরিতের ধারা কুলায় যেমন ক্ষেপার পারা,
ছাড়া জাল শরে বিন্ধা হরিণী।
মথুরা বলেন গো রঙ্গ পিরিতি করা হইল দায়,
না শুনিলে গুরুজনার বচন, মরি।

যাইহোক, খেমটি নাচ ও গানকে কেউ কেউ বাঈজী নাচগানও বলতো। খেমটি নাচের নাচ্‌নীওলাকে বাঈজী বলা হত।" বাংলার লোক-সংস্কৃতি" গ্রন্থের লেখক ওয়াকিল আহমদের ভাষায় —"বাঈজীরা দক্ষ পেশাদার নর্তকী। তারা নাচ-গান করে গ্রামের জমিদারদের ভোগলালসা নিবৃত্ত করত। বাঈজীনাচের ভাব ভোগসর্বস্ব হলেও আঙ্গিক উচ্চকলার নিদর্শণ বহন করে। খেমটা নাচের ভাবভঙ্গি আদিরসাত্মক।"

সঙ্গীতের এক প্রকার তালের নাম হলো খেমটা। যেহেতু বিশেষ নির্দিষ্ট একপ্রকার তাল নাচ্‌নীদের গানে ব্যবহৃত হতো বলেই তালের নাম অনুসারে গানেরও নাম করা হয় খেমটি গান। খেমটা ছয় মতান্তরে চার মাত্রার তাল, যথা --- ধাটে ধেঁ নাতে নে তাটে ধেঁ নাধে নে। অথবা ধাগোধি নাতিন নাগধি নাতিন। তবে, বাদ্যযন্ত্ররূপে এই গানে ঢোল বাঁশী, করতাল প্রভৃতি ব্যবহার হয়ে থাকে খেমটি নাচ গ্রামের বিয়ের মজলিশেও বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে একসময় অনুষ্ঠিত হতো। শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়" মাসিক বসুমতী," পৌষ, ১৩৫২-সংখ্যায় "বাংলা নাচ ও উদয়শঙ্কর" শীর্ষক লেখাটিতে বলেছেন মেয়ে মহলের কাছে খেমটি নাচের কদর সম্পর্কে,"তখন খেমটাওয়ালীদের আদর ছিল রীতিমত। বিশেষ করে মেয়েলী উৎসবে খেমটা নাচকে একটি প্রধান অঙ্গ বলে মনে করা হত।" এমন কি, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে হিন্দুদের পূজো উৎসবেও খেমটা নাচের চল ছিল। অবশ্য এখানে একটা কথা বলে রাখা

উচিত হবে, কলকাতা শহরে দুর্গা পুজো উপলক্ষে একসময়ে জমিদারবাবু বাড়ীতে যাত্রা গানের আসরের সঙ্গে কোথাও কোথাও খেমটা গানের আসর বসত। বারোয়ারী পূজোতেও খেমটি গানের যে আসর বসত তার সমর্থনতো পাওয়া যায় কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতুম প্যাঁচার নকসা" গ্রন্থে। দীনেশচন্দ্র বাবু তাঁর আত্মজীবনী "ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য" গ্রন্থে লিখেছেন, "খেমটা নাচ ও বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা তখন আসর মাত করিয়া দিত।"

খেমটি গান ও নাচ আবার মুসলমান সম্প্রদাযের মেয়ে মহলেও বেশ প্রচলিত ছিল। বগুড়া জেলার একটি আঞ্চলিক মেয়েলী গানে যার সমর্থন পাওয়া যায় -----

সরুয়া মান্‌জা দীঘল ক্যাশ,
মান্‌জা ক্যানে হ্যালে না।
ও খেমটাওয়ালী, তুই লাচোন
ক্যানে জানিস না।
জানি কিনা জানি লাচোন,
ব্যাজ ক্যানে তোল না।

বাদ্যের তালে তালে এখানে কোমর দুলিয়ে নাচার উল্লেখ লক্ষনীয়। খেমটি নাচের তাল বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নাচতে হয়, আর গানের কথাকে সঙ্গে সঙ্গে নাচের অঙ্গ-ভঙ্গিমায় ফুটিয়ে তুলতে হয়। "The Folk Dance of India" গ্রন্থে প্রজেশ বন্দোপাধ্যায় খেমটি নাচের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বলেছেন "In this kind of dance (Khemta) the most intricate footwork wove into the dance complicated and delightful patterns. The movement of the feet required great agility and long practice. The dancers also brought into play their eyes, as much as any other part of the body, and much movement of the lips which required skillful muscle control in order to convey an impression of effortless balance."

পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতেও খেমটি গানের ব্যপক প্রচলন লক্ষ করা যায় গ্রাম্যমেলা ও উৎসবে। এক ধরনের নৃত্য ব্যবসায়িনীরা নাচের সঙ্গে এই বিশেষ লোকগীতিটি পরিবেশন করেন। এই নাচ-গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে বাঁশি, ধামসা, ঢোল ইত্যাদি বাজে। সাধারনতঃ গ্রামের মেলার প্রান্তে কোন বটগাছের নীচে চাটাই বিছিয়ে এ গানের আসর জমে। রসিক পুরুষ ধুঁয়া ধরে গান শুরু করে -----

প্রেম করা তো সহজ নয়, আর প্রেম কি শুধু হয় গো,
প্রেমের পাগল হয় গুরুজন, প্রেমে জাতি কুথা যায় রে,

প্রেমে যায় জীবন এমনি প্রেমের ধারা,
মন যে আমার ক্ষেপার পারা,
না বুঝে ডুব দিলে শেষে হারাবে জীবন।
ও প্রেম করো পারে মন,
প্রেমে জাতি কুল যায় রে, প্রেমে যায় জীবন।
প্রেম-সরোবর মাঝে আর দুটি কমল ফুটে আছে,
হাত বাড়ালে কমল, নিশ্চয় সরল,
প্রেমে জাতি কুল যায় রে প্রেমে যায় জীবন।
রায় হরিদাস বলে আর ভুলো না মায়াজালে,
এ কূল ও কূল দুকূল যাবে শেষে হারাবে জীবন।

প্রেম যদিও খেমটি গানের মূল বিষয় যা ইতিপূর্বে বলেছি। তবে, এই প্রেম কিন্তু কখনো লৌকিক ও কখনো রাধাকৃষ্ণের নামে অলৌকিকও। একটা জিনিস এই খেমটি গানকে শিল্প-মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে তা হলো --- খেমটি নৃত্য ব্যবসায়িনীদের জীবন যতই গ্লানিতে পূর্ণ ও টইটুম্বুর হোক না কেন, কিন্তু তাদের গানের মধ্যে আছে এক অতীন্দ্রিয় প্রেমের মাধুর্য এবং সরলতা। যা সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। এখানে এরূপ দুটি উদাহরণ রাখছি ----

জ্বালিয়া মোমের বাতি, অকারণে গেল রাতি,
গাঁথিয়া বাসকি ফুলের মালা,
সখী, আমার রহিল বাঁশী
তোমার ঐ পীরিতি আজি হইল বাজে।
হায় রে দারুণ বিধি, শাশুড়ী হয়েছে বাদী,
ঘরে আছে ননদিনী আমার বিচ্ছেদের পালা,
আমার প্রাণে সহে না দারুণ শাশুড়ীর গঞ্জনা।
শাশুড়ীর চার বেটা ঘরে ঘরে লাগায় ল্যাঠা,
হেন স্বামীর ঘরে সুখ তো হল না।
আমার প্রাণে সহে না।।

২. শ্যামের বাঁশিটিকে আমি, কেড়ে নেব জনম্‌কে।
যখন, কানাই, বাজাও বাঁশি তখন গৃহে রান্দি বসি,

শাশুড়ী ননদের ঘরে আমি না রহিতে পারি ফাঁকে।
যখন আমি সহি গো জলে, শ্যামের দেখা কদম তলে,
কত ছলে ডাকে আমার নাম কে,
আমি কেড়ে নেব বাঁশিটা জনম্‌কে।

কেবল প্রেমই নয়, ভাদুগানের মতোন বাঁশপাহাড়ীর খেমটি গানে পারিবারিক ও সামাজিকতার অনেক কথারই প্রতিধ্বনিত রূপ পাওয়া যায়। উপরিউক্ত প্রথম গানটিতে নায়িকা বিরহ-বেদনা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, আবার মোমের বাতি জ্বালানোর মধ্যে নায়িকার অকারণ রাত্রি জাগরণের কথাও পাই ---'জ্বালিয়া মোমের বাতি, অকারণে গেল রাতি,' প্রথম পংক্তিটিতেই। তেমনি শাশুড়ীর গঞ্জনা ও ননদের যাতনায় নায়িকা বধূর আর্তনাদও ফুটে উঠেছে গানটিতে সরল অভিব্যক্তির মধ্যে ----

'হায় রে দারুণ বিধি, শাশুড়ী হয়েছে বাদী, / ঘরে আছে ননদিনী আমার বিচ্ছেদের পালা, / আমার প্রাণে সহে না দারুণ শাশুড়ীর গঞ্জনা।' আবার বধূ অত্যাচারের কথাও নায়িকার মুখ দিয়ে উঠে এসেছে গানটির শেষ কটি পংক্তিতে। বধূর কপালে যে স্বামী গৃহে সুখ সইল না এবং স্বামী গৃহে বাস করা যে বধূর পক্ষে কত কঠিন ও মর্মান্তিক তা - ও ফুটে উঠেছে। হতভাগ্য অত্যাচারীত বধূদের এরূপ জীবনের কথা ভাদুগানে খুবই পাওয়া যায়। খেমটি গানেও এরকম সুন্দর প্রতিচ্ছবি বেশ বিষ্ময়কর।

শুধু প্রেমই নয়, প্রেমের উচ্চ আধ্যাত্মিকতা ছাড়াও বাস্তব চাহিদার কথাও পাওয়া যায় খেমটি গানে নায়িকার আকাংঙক্ষার মধ্যে। তাই নায়িকার কাছে বাস্তব চাহিদা হিসাবে উঠে এসেছে দৈনন্দিন ভেগ-বিলাসের সামগ্রি হিসেবে আনারকলি শাড়ী, লাল রঙের ব্লাউজ, হিমানী, পাউডার, কানের মাকড়ি পর্যন্ত। বাঁশপাহাড়ীর সংগৃহীত গানে যা লক্ষ্য করা যায়। যেমন -----

১. আয়না লিব, চিরুনী লিব, নারকোলার তিলকা লিব,
পিং দিয়ে মাথা বাঁধব. কারো বারণ শুনব না।।
আনারকলি শাড়ী লিব, বেনারসী শাড়ী লিব,
লাল রং এর বেলাউজ লিব, লাল বই অন্য লিব না,
দেশে উঠেছে গয়না, আমি কুলেতে রইব না।

২. কি যুগের শাড়ী উঠেছে, উঠেছে বাজারে
সায়া শাড়ী কিনে দাও, শ্যাম, পরিব পরবে

ভালবাসিব তোমারে।

রঙিন রঙিন ছিট ব্লাউজের তরে, হে শ্যাম, ব্লাউজের তরে,

আরো লিব পাঁচ টাকা, হে শ্যাম -----

হিমানী পাউডারে, হে শ্যাম, হিমানী পাউডারে।

আরো লিব পাঁচ সিকা সানলাইট সাবানে।

৩. মনের কথা বলব তোমারে।

বাজার হতে চেন মাকুড়ি এনে দেবে মোরে,

ভালবাসব তোমারে।

হাতে শাঁখা পায়ে তোড়া আধুলী মোহরী,

আরো যদি দাও হে মোরে বিছা কোমরে,

ভালবাসব তোমারে।

শিলিক শাড়ী, ফরিদ শাড়ী, উঠেছে বাজারে ---

নতুন ছিট উঠেছে বেলাউজের তরে,

দুটাকা লাগবে মোরে হিমানী পাউডারে,

আরো যদি দাও হে ফুলান তেলের তরে।।

পায়ে জুতা মাথায় ছাতা উরয়ালের তরে।

দশ আনা লাগবে মোরে পিন কাঁটা ডোরে।।

প্রেমের জন্য রাধাকেও যেমন ঘর ছাড়ার জন্য প্রতিবেশীর নিন্দা সহ্য করতে হয়, ঠিক এরূপ নিন্দার কথাও পাওয়া যায় বাঁশ পাহাড়ীর খেমটি গানে। খেমটি গানে প্রেমের মধ্যে নায়িকার মনের বেদনা লক্ষণীয়, যা নিতান্তই লৌকিক। কিন্তু রসে বৈষ্ণব সাহিত্যের সমতুল। প্রেমে নায়িকার বেদনার পূর্ণ আকুতির মধ্যে রাধাভাব অবশ্য লক্ষণীয় -- --

আমারো পিরিতি দেখি সইতে নারে পাড়ার লোকে,

যে যা বলে বলুক লোকে, আমি ছাড়ব না তোমারে।

তুমি ভুইল না আমারে, আমি ভুলি না তোমারে।

তোমার ঐ অঙ্গ হেরি, আমার এই অঙ্গ ধরি

ঐ ভাবনায় আর কত দিন

তোমার ঐ ভাবনা বইবো কত দিন।

দেখ আধা দিনে হে না যাইও পাসরি।

তুমি ভুইলো না আমারে আমি ভুলি না তোমারে।

এই গানটিতে যে শাশ্বত প্রেমের রূপ পরীলক্ষিত হয়েছে তা বোধ করি বলার আপেক্ষা রাখে না। প্রেমের জন্য নায়িকার দুর্দমনীয় হয়ে - ওঠার এই ব্যাপারটি পরবর্তী কালের আধুনিক বাংলা কাব্য ও গানকে বেশ গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। 'মৌচাক' সিনেমাটির গানে প্রেমের জন্য নায়িকার দুঃসাহসী হয়ে - ওঠার পরিচয় পাওয়া যায় একটি গানের কলিতে --- 'প্রেম করেছি, বেশ করেছি, করবই তো'।

খেমটি গানে নায়িকার সরল প্রেমের অভিব্যক্তি কত সুন্দর ও মধুর হয়ে উঠতে পারা যায় বেদনার রসে সিক্ত হয়ে, যা শিল্পগুনে ও প্রকাশভঙ্গিতে একটি আধুনিক কবিতার মতন। এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঠিক এরূপ একটি খেমটি গান তুলে ধরছি -----

সরল দেখে প্রেম করিলে

এত কেন নিঠুর হোলে।।

আমি মরি তোমার তরে।

বঁধু আমায় ফিরে চাও না।।

অবলারে দুঃখ দিয়ে

কখনই ভালো হয় না।।

অবলারে শেল দিয়া।

কখনই ভালো হয় না।।

হেসে হেসে কইতে কথা।

বসতে আস্যে আমার হেথা।।

দিবানিশি করছে আনাগোনা।

আমার হতে কোন রমনী

তোমায় ছেড়ে দেবে না।।

সারদা সিংহেতে কয়।

যখন ফুলে মধু রয়,

মধু ছাড়া ভ্রমর কোথাও রয় না।।

আজ ডাল ভ্যাঙ্গে ফুল শুকাই গেল,

ভ্রমর তো আর ফিরে চায় না।।

যদিও খেমটি নাচের ও গানের এখন তেমন আগের মতন রমরমা বাজার নেই। কোন কোন স্থানে এর অল্প প্রচলন আজও আছে। দেশ থেকে এখনও একদম লুপ্ত হয়ে যায় নি। আবার কোনো-কোনো স্থানে বিশেষ করে বিহারী বা অবাঙালীদের মধ্যে হিজড়া শ্রেণীর লোকেরা দল গঠন করে এই খেমটি নাচ-গানের ধারাকে বিকৃতরূপে বহন করে চলেছেন। এই হিজড়া শ্রেণীর দলেরা বিয়ের মজলিশেও নাচ-গানের জন্য ডাক পান। কখনো-সখনো জীবিকার তাগিদে রুজি-রোজগারের জন্য পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারেও তারা নাচের আসর বেশ জমিয়ে দেয়। এদের নাচকে হিজড়ে নাচ বলা হয়। এক কথায় বলা যায়, খেমটি নাচের বিকৃত রূপই হলো হিজড়ে নাচ। নাচের সঙ্গে অবশ্য হিজড়েরা গানও গেয়ে থাকেন। যা আগে বলেছি খেমটি গানে বিকৃত রূপ হিসেবে রচিত সেসব গান।

কিন্তু খেমটি গানের যে আলাদা একটা সাহিত্য মূল্য আছে তা অস্বীকার করার কোনোমতেই উপায় নেই। প্রেম-বিষয়ক, বিরহ-বিচ্ছেদের গানগুলিতে যে সরল অভিব্যক্তি উঠে এসেছে এবং লৌকিক জীবনের সুখ-দুঃখের কথা যেভাবে উঠে এসেছে তা ফেল্‌না নয়। কাব্যসুষমায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার না হলেও একেবারে গুণগত মানে তুচ্ছ নয়। প্রাণের স্পর্শ সেসব গানে বিদ্যমান। আর একটা কথা বলা উচিত হবে, খেমটি গানে উত্তর ও প্রত্যুত্তরে পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ অর্থাৎ চাপান ও যে উতোর আছে তা আধুনিক হিন্দি ছায়াছবির গানকে বেশ প্রভাবিত করেছে, নায়ক-নায়িকার মুখ দিয়ে গানের সুরে উঠে এসেছে। বিশেষ করে রঙ্গ-রসের প্রেম বিষয়ক গানেতে। ভাব ও ভাষা কখনো-সখনো অনেকটা খেমটি গানের মতন। যদিও বাদ্যযন্ত্রের অনেক ব্যবহারের ফলে সুরের ও রসমাধুর্যের বৈচিত্রে হিন্দি গান জাত বিচারে খেমটি গানের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে। তবে, পরোক্ষ প্রভাব যে রয়ে গেছে তা অনেক গানেই লক্ষ করা যায়। কখনো-সখনো প্রত্যক্ষ প্রভাবও যে চোখে পড়ে না বলা যাবে না।

সারিগান

পূর্ববঙ্গে বর্ষাকালে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে নৌকাবাইচের যে সব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে , এবং কোথাও-কোথাও প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে --- তখন প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকালে এবং প্রতিযোগিতার শেষে ঘরে ফেরার সময় যে গান গাওয়া হয় তাকেই বলা হয় সারিগান। পূর্ববঙ্গে এটি একটি জনপ্রিয় গান। সাধারণত নদী, নৌকা ও জল সারিগানের প্রধান বিষয়। তবে, সারিগানে বিবিধ বিষয় লক্ষ্য করা যায় --- রাধাকৃষ্ণ, হরগৌরী ও নিমাই সম্পর্কিত গান, লৌকিক নরনারীর প্রেমাত্মক গান, পরস্পর আক্রমণাত্মক গান প্রভৃতি। হিন্দুসমাজে মনসা ভাসানের দিন অর্থাৎ শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এবং বিজয়ার দিন অর্থাৎ আশ্বিনের শুক্লা দশমীতে যে নৌকাবাইচের আয়োজন করা হয় তাতে সাধারণত রাধাকৃষ্ণ ও হরগৌরীর গান হয়ে থাকে। অবশ্য মুসলমান সমাজে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে কোনো লৌকিক উৎসব উপলক্ষে বা বার্ষিক অনুষ্ঠানের দিন নৌকাবাইচের আয়োজন করা হয়। এসময়ে খাল-বিলে জল থাকে। মুসলমান সমাজের নরনারীরা সাধারণত প্রেমমূলক সারিগান ও হাস্যকৌতুক ও আক্রমনাত্মক সারিগান গেয়ে থাকে।

এই গানের সঙ্গে নাচও যুক্ত থাকে। এ সম্পর্কে ''বাংলার লোক-সংস্কৃতি''গ্রন্থে ওয়াকিল আহমদ ''সারিনাচ'' শীর্ষক আলোচনায় সুন্দর কটি কথা বলেছেন, ''নৌকার বেশীর ভাগ লোক বৈঠা টানে। গানের বয়াতি ও নাচের দু'একজন ব্যক্তি নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে ও গান গায়। বৈঠার তালে তালে নাচ হয়, সঙ্গে ঢোল, কাঁসিও থাকে। গানের ভাবের সঙ্গে নাচের ভাবের তেমন সম্পর্ক থাকে না। তারা নাচের জন্য নাচে। নিছক আনন্দোল্লাস এর মুখ্য উদ্দেশ্য। নাচের ভাবভঙ্গিতে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস নেই।'' ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর ''বাংলার লোকসাহিত্য'' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে সারিগান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই সারিনাচ সম্পর্কে বলেছেন, ''চলন্ত ছিপের উপর এই নৃত্যের মধ্য দিয়া উচ্চ কোন গুণ প্রকাশ পাইতে পারে না।''

যাইহোক, বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্রই নৌকাবাইচের চল আছে। দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার এই নৌকাবাইচ খুব জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব ময়মনসিংহে একে 'আরং' উৎসব বলা হয়।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩১১ ও১৩১২) ডাঃ মোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য মহাশয় ''নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা'' শীর্ষক একটি দীর্ঘ আলোচনায় সারিগান সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, ''যত প্রকার গ্রাম্য কবিতা আছে তাহার মধ্যে সারিগীতই শ্রেষ্ঠ'' (১ম সংখ্যায়)

শ্যামচাঁদ গুপ্ত মহাশয় আবার তাঁর রচিত ''সারিগান'' গ্রন্থে সারিগানের সংজ্ঞা নিরূপণ

করতে বলেছেন, "সারি সারি বসে বা দাঁড়িয়ে গান করার জন্যে এই গানের নাম সারি গান। প্রাচীন সারিগানগুলি গঙ্গা বন্দনা, দান ও বিরহ অবলম্বনে রচিত। তবে তুলনামূলক বিচারে সারিগানে দান লীলার বর্ণনাই অধিক। লেখক দান লীলার আধিক্যের মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে বর্ষায় নৌকারহণ করা কালে, সহজেই বৃন্দাবনের রমনীদের মথুরায় দধি, দুধ প্রভৃতি বিক্রয় করতে যাওয়ার চিত্র স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। তাই সারিগানে দান লীলার আধিক্য।" তিনি আরো বলেছেন, "বর্ষার সঙ্গে বিরহের যোগও অত্যন্ত গভীর। তাই দান লীলা ব্যতীত বিরহ বর্ণনার আধিক্যও এই গানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের সারিগানে অবশ্য গঙ্গাবন্দনা, দানলীলা ও বিরহ ব্যতীত মান, মাথুর, গোষ্ঠ প্রভৃতি পালাও লক্ষ্য করা যায়।"

তবে, ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর "বাংলার লোকসাহিত্যে" গ্রন্থের ১ম খণ্ডে কটি কথা যা বলেছেন তা মেনে নিতে কুন্ঠা নেই। বিশেষ ক.র তাঁর যথার্থতা হিসেবে কতকগুলি কথা — "প্রেমভাব ইহার প্রধান ভাব, তবে প্রেম ব্যতীতও অন্যান্য করুণ রসাত্মক ভাবও ইহার অবলম্বন হইয়া থাকে। সহজ আনন্দের অর্থহীন অভিব্যক্তিও অনেক সময় ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়।" একটি গানের উল্লেখও করেছেন তিনি। যে গানটিতে আশুতোষবাবু সহজ আনন্দের অর্থহীন অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছেন, যেমন —

আজকে পরবের দিনে মান্য কোথায় রবে না।
জামাই গোরব সভা করো না।
ওহে, নাও কিনিবার গেলাম আমি তারাপুরের বাঁয়ে,
চল্লিশ টাকা নায়ের দাম
তার পঞ্চাশ টাকা খোসা।
জামাই, আজকে পরবের দিনে মান্য কোথায় রবে না।
ওহে দায়ের মিঠা বালুরে
কুড়ালের মিঠা শিল,
ভাল মানষের জবান মিঠা
কামিনীর মিঠা কিল।

উচ্ছ্বসিত বর্ষামুখর থৈ-থৈ জলরাশির জন্য কত ব্যাপক ও আবেগে প্রেমমগ্নতায় ডুবুডুবু ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসে গদ্‌গদ্ তা লক্ষ্য করা যায় অনেক সারিগানে। কাজেই, প্রেমভাবই যে সারিগানের মধ্যে প্রধান ভাব বোঝা যায়। এ কারণে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের কথা 'প্রেমভাব ইহার প্রধান ভাব' মেনে নিতে এতটুকু কুন্ঠা নেই। এখানে এরূপ দুটি গান তুলে ধরছি, যেখানে প্রেমভাবই প্রধান —

১. ও রায়কিশোরী, তোর সনে মোর কথা ছিল কি?
ঐ কাল জলে চান করাব সই,
ও সই রে, ডাল ভাঙ্গিয়া বাতাস করি।
তোর সনে মোর কথা ছিল কি?
বেড়াই আমি তোমার লাগে,
অন্নধারী হলাম সাথী, তোমার লাগে,
ঘুরছি আমি রাত্রি দিনে করিছ কেন চাতুরী?
তোর সনে মোর কথা ছিল কি?

২. সোনা বন্ধু রে পিরীত কর‍্যা ছাড়্যা যাইও না।
পিরীত কর‍্যা ছাইড়া গেলে দেহে পরাণ থাক্‌বে না।।
পিরীত রতন পিরীত যতন পিরীত গলার হার।
পিরীত কর‍্যা যে জন মর্‌ছে সাফল জীবত তার।।
পিরীত রতন পিরীত যতন পিরীত বড় লেঠা।
ছাড়াইলে ছাড়ানি যায় না টেংরা মাছের কাঁটা।।
পিরীত বিষমরে জ্বালা যার অন্তরায় লাগে।
এক চইক্ষে নিদ্রা গেলে আরেক চইক্ষে জাগে।।
এই পিরীত কর‍্যাছিল রাধার সনে কানু।
রাধে বাজায় করতাল কানাইয়া বাজায় বেণু।
এই পিরীত কর্‌ছে রে ভাই ডাগ্‌ওয়ার সনে পাত।
পোরদা পোরদা অইয়া গেলে তেও না ছাড়ে সাথ।।

উপরিউক্ত উদাহরণের দ্বিতীয় উদাহরণটিতে লক্ষণীয় হলো, 'পিরীত' কথাটির এগারো বার প্রয়োগ ও 'পিরিতি' শব্দটির প্রয়োগ। প্রেমভাবের চূড়ান্ত প্রকাশ স্বরূপ 'পিরীত' শব্দটির বহুল প্রয়োগ ঘটেছে এবং 'পিরিতি' শব্দটিও প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। এমনকি, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক সারিগানে এই প্রেমভাবের বিভোরতা আবার তীব্রভাবে উপস্থিত। যেমন —

১. সুন্দরী লো, বাহির হইয়া দেখ
শ্যামের বাঁশী বাজাইয়া যায় কে।।
অষ্ট আঙ্গুল বাঁশী নারে মধ্যে মধ্যে ছেদা।
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী কলঙ্কিনী রাধা।।
মরাল বাঁশের বাঁশী নারে তরই বাঁশের আগা।

অবলা নারীর প্রাণে দিল কত দাগ।।
বাঁশীটি বাজাইয়া কৃষ্ণে বইল কদম ডালে।
লিলুয়া বাতাসে বাঁশী রাধা রাধা বলে।
সেই পারে কদম্ব গাছ বৈশ কান্দে কাগা।
শিশুকালে কৈরা রে পীরিত যৌবল কালে দাগা।

২. আজি আনন্দের সীমা নাই কাঁজি দরশনে।
বিরজায় তরণি বায় মোহিনী মোহনে।। ধুয়া।
রাধিকার গুণগান করিছে সঘনে।
মুরলী বাজায় কৃষ্ণ সুচাঁদ বদনে।।
প্রেমধারা বহিতেছে ভকত লোচনে।
তাল মানে ভক্ত নাচে মুগ্ধ গুণ গানে।।
সারদা সকল সখী বীণার বাজনে।
গাইছে যুগল গুণ সুধা আলাপনে।।
জয় জয় রাধা জয়কৃষ্ণ বৃন্দাবনে।
সখা সখী ভাবে মত্ত নাম মধুপানে।

জয়নারায়ণ ঘোযাল "করুণনিধান বিলাস" (১৮১৩-১৮১৪) এ সারিগান প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন ---

বাঙ্গাল বুলিতে শাড়ি ঝুলেতে গাইবে
দুই পাশে দাঁড়ি মিলি সঙ্গে স্বর দিবে।।

জয়নারায়ণবাবুর কথা থেকে সারিগান যে পূর্ববঙ্গে নৌকাবাইচদের মধ্যে কত জনপ্রিয় ছিল তা বোঝা যায়।

জয়নারায়ণবাবুর "করুণনিধান বিলাস"-এ সারিগানের রাগ ও তালাদির উল্লেখ লক্ষণীয় ---

১. শাড়ী গীত।।
রাগিনী বাঙ্গাল।।
তাল একতালা।।
রমনী তরনি বায়;
প্রেম ভরা সেই নায়ঃ
বিকিকিনি আনন্দ বাজারে।

হাতে বঠ্যা বায় তায়ঃ

কঙ্কণে সুতাল ভায়ঃ

রসঘাটে লাগিল সত্বরে।।

দুর্ব্বা দল কুঞ্জবেলা তিন প্রহর।।

২. দাড়ি মাঝি ব্রজশিশু হইব সকল।

নটবর বেশভূষা হবে অবিকল।।

কনক বঠ্যায় হালি পঞ্জনি সহিত।

নানারঙ্গ পতাকায় হইবে শোভিত।।

ঋতুমত সারিগান মল্লারে মীলিব।

বরষা রাগিনী যত তাহার সহিত।।

কালজলে আল করি তরণি রচিব।

তার মধ্যে হিণ্ডোলাতে আমরা ঝুলিব।।

৩. দিবসেতে তরিমধ্যে জলেতে ভ্রমণ।

দাঁড়ি মাঝি সখীয়ে শোভা অগণন।।

বসন ভিজিয়া অঙ্গে হইল দর্পণ।

যুগল কিশোর রূপ তাহাতে দর্শন।।

নদনদী দুই কূলে অতি রম্যবন।

তার ছায়া গোপী অঙ্গে হয়্যাছে পতন।।

নানারাগে সারিগান জুড়ায় শ্রবণ।

কেহু কাচে কেহু নাচে তোষয়ে মোহন।।

ডঃ বরুণ চক্রবর্তী মহাশয়েব মতে (বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস), ''অবশ্য 'করুণানিধান বিলাসে' সঙ্কলিত সারিগানগুলি যে অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা হয়ত নয়, কবি নিজেও কিছু কিছু অংশ পরিবর্তিত করে থাকতে পারেন, তবু দেড়শতাধিক বৎসর পূর্বে – বিশেষত যে কবি ইংরিজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, তাঁর কাব্যে সারিগানের উল্লেখ ও বর্ণনা যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।''

যাইহোক, জয়নারায়ণবাবুর সঙ্কলিত সারিগানেও একটি জিনিস লক্ষণীয়, সারিগানে প্রেমে বিভোরতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে 'প্রেম ভরা সেই নায়;/বিকিকিনি আনন্দ বাজারে' পংক্তি দুটিতে।

পূর্ববঙ্গের এই সারিগান সম্ভবত কবি রবীন্দ্রনাথকেও মুগ্ধ করেছিল। এ কারণে রবীন্দ্রনাথের গানে বিশেষ করে মাঝি-মাল্লাদের কথা এসেছে। এবং সারিগানের প্রেমের বিভোরতার বিষয়ও রবীন্দ্রনাথের কবি-মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল বলা যেতে পারে। সারিগানের প্রেমবিভোরতাই রবীন্দ্রমানসকে জারিত করেছিল বলেই না আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথের হাতে আমরা এমন গান শুনতে পাই "গীতঞ্জলি" কাব্যে —

আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধরে আজ বোস্‌রে সবাই,
টান্ রে সবাই টান্।

নিমাই সন্ন্যাসের বিষয় যে সারিগানে উঠে এসেছে তা আগেই বলেছি। এখানে এরূপ একটি সারিগানের দৃষ্টান্ত রাখছি। গানটিতে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা জানা যায়। যেমন ---

কেমন বাঁচিবে তোর মা --
আরে ও নিমাই সন্ন্যাসেতে যেওনা।
যখন জন্মিলে নিমাই নিম তরুতলে
আমি বাছিয়া রাখিলাম নাম নিমাই চাঁদ তোমারে।
সন্ন্যাসী না হইও, বৈরাগী না হইও
ওরে ঘরে বসে কৃষ্ণনাম আমারে শুনাইও।
সোনার নদীয়া ছেড়ে যাবে গোরা রায়,
ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়ার বল কি হবে উপায়।
কাঁচা সোনার বরণ অঙ্গে ছাই যে মাখিবে,
শচী মায়ের বুকে তাহা কেমনে সহিবে।

এই গানটিতে শচীমাতার ও বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য বেদনাভরা হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে। স্বামীর জন্য বাঙালী স্ত্রীদের যেরূপ আকুলতা এবং পুত্রের জন্য জননীরা যেরকম ব্যাকুল হন, এখানে সারিগানে সেকথাই বলা হয়েছে।

নৌকাবাইচের সময় যেহেতু সারিগান গাওয়া হতো, সেহেতু যে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে বাইচের নৌকা নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন কালে সারিগান গাওয়া হতো। গায়কগণ বৈঠার তালে তাল দিয়ে গাইত। যেমন—

জয় দে লা, রামের মা, তোর গোপাল আইল ঘরে।
ধান্য দুর্বা বরণ-কুলা দে লো ঐ গলুয়ার কপালে।।

নড়িয়া বরিয়া তোমার গোপাল নে যাও ঘরে।।
জয় দে লা, রামের মা, তোর গোপাল আইছে ঘরে।
সাত সাগরের পার থিকা সে আন্‌ছে বরণমালা।
দুধের বাটী ক্ষীরের নাড়ু আনো থালা থালা।।
যেই দেবতার দয়ায় আসে তোমার গোপাল ঘরে।
সেই দেবতা পবন ঠাকুর পেন্নাম যাই তারে।।

আবার, যশোহর জেলায় পূর্বে বিজয়া-দশমী উপলক্ষ্যে যখন নৌকাবাইচের অনুষ্ঠান হতো, সেখানেও নৌকাবাইচদের সারিগানে বিজয়ার বেদনার সুর শুনতে পাওয়া যেত। যেমন ---

সোনার কমল ভাসিয়ে জলে আমার মা বুঝি কৈলাসে চলিল।
হাস ম'ষ দিয়ে, মাগো, কল্লেম তোর পূজা,
কোথায় ফেলে গেলি এ'সব, ও মা দশভুজা। (সোনার কমল)
মাগো কার বাড়ী গিয়াছিলে, কে ক'রেছে পূজা,
কার জনম ক'ল্লে সফল হ'য়ে দশভুজা। (সোনার কমল)

সারিগান সম্পর্কে আর একটি কথা বলা উচিত হবে, যেহেতু সারিগান হলো নৌকাবাইচের গান --- সেহেতু রাধাকৃষ্ণ-প্রসঙ্গের মধ্যে যেখানে নৌকার উল্লেখ আছে, সেই সকল অংশই সারিগানের প্রধান উপজীব্য হয়েছে। কৃষ্ণলীলায় নৌকাখণ্ড, পারখণ্ড ইত্যাদি নৌকা সম্পর্কিত প্রসঙ্গ। এদের মধ্য থেকেই সারিগানের ভাব ও চিত্র সংগ্রহ হয়ে থাকে। যেমন---

আরে, ও কানাই, পার ক'রে দে আমারে।
আজিকার মথুরার বিকিদান করিব তোমারে।।
তুমি ত সুন্দর, কানাই, তোমার ভাঙ্গা না'।
কোথায় রাখিব দইয়ের পশরা কোথায় রাখ্‌বা পা।।
শুনে কানাই বলে তখন, শোন রসবতি।
ভরাকালে ভরা গঙ্গে কেন এ'লে যুবতি।।
আগা নায়ে রেখে দই মাঝখানাতে বস।
ফুটিক্ ফুটিক্ ফেল জল লজ্জায় কেন ভাস।।
সর্ব সখী পার করিতে নেব আনা আনা
রাধিকারে পার করিতে নেব কানের সোনা।।

মোদ্দাকথা, বর্ষাকালে পূর্ববঙ্গে নৌকাবাইচদের নিয়ে অজস্র গান আছে। পূর্ববাংলায় নৌকা বাইচদের মধ্যে গান গাওয়ার প্রচলন অধিক বলা যেতে পারে। আসরাফ্ সিদ্দিকী তাঁর "লোকসাহিত্য" গ্রন্থে বলেছেন -- "নৌকা বাইচের সময় নৌকার পালগুঁরার কাছে সোনার মালা বা গামছা ঝুলিয়ে প্রধান গায়েন দাঁড়িয়ে থাকে। অধিকাংশ গানগুলিই তালের। গানটির পংক্তি যেখানেই শেষ হ'বে সেখানেই গায়ের নৌকার গলুইর দিকে ঝুঁকে পায়ের গোড়ালি দিয়ে ঠোকা দেবে --- তাতে নৌকা আরও গতিবান হয়। অনেক সময় নৌকার অন্যান্য বৈঠাধারিগণ কেবল ধুয়াটি গায়। কোন কোন সময় সম্পূর্ণ গানটিও দোহার ধরে গায়। নৌকা বাইচের প্রথম দিকের কথাগুলি কিছুটা শ্রম সংগীতের মত।" খুব যথাযথ কথা বলেছেন আশরাফ সিদ্দিকী। নৌকা বাইচের কাম বেশ শ্রমসাধ্য ব্যাপার, সেহেতু শ্রমকে লাঘব করার জন্য (মানসিকভাবে) সংগীতের দরকার। শ্রমসংগীতের কথা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও বলেছেন তাঁর "বাংলার লোকসাহিত্য" গ্রন্থের ১ম খণ্ডে। তিনি বলেছেন, "শ্রমিকগণ একযোগে কোন গুরুভার কর্ম সম্পাদন করিবার কালে কার্যের তালে তালে অনেক সময় একসঙ্গে কতকগুলি উক্তি সুর করিয়া বলিয়া থাকে।" তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেছেন ---

আরও জোরে -- হেঁইও!
সাবাস জোয়াল -- হেঁইও!
একটু আরও -- হেঁইও!

যদিও এই কথাগুলিকে লোকসঙ্গীতের মর্যাদায় ফেলা হয় না। বর্তমানে রেললাইন স্থাপন কালে শ্রমিকরা গাঁইতি ও সাবোল চালনাকালে এরূপ কথা উচ্চারণ করে থাকে। আশরাফ সিদ্দিকী কিন্তু কেবল নৌকা চালানোর আরম্ভ কালে এরূপ উচ্চারণ লক্ষ্য করেছেন। যেমন ---

হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো।
আরও জোরে হেঁইয়ো।।
সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো।
আগের নাও পাছে গেলো হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো।।
পাল্‌নো নারে পারলোনা।
হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো।
আরও জোরে হেঁইয়ো . . .

নৌকার যখন পূর্ণগতি এসে যায় তখনই সত্যিকারের বাইচ গান শুরু হয়। আশরাফ সিদ্দিকীর মতে গায়েন তখন গলার সুর চড়িয়ে গেয়ে ওঠে। এখানে দৃষ্টান্ত রাখা যেতে পারে। যেমন ---

'রঙের নাও রঙের বৈঠা রঙে রঙে বাও— পাতাম কাঠে নৌকো আমার উড়াল দিয়া যাও – রে – উড়াল দিয়া যাও। রঙে রঙে বাওরে বৈঠা রঙের দোহার গাইয়া মধুমালার দেশে ডিঙি শীঘ্র যাওরে বাইয়া।।— রঙের নাও রঙের বৈঠা . . . .।।'

সিদ্দিকীর মতে, "মধ্যে মধ্যে নৌকায় গতি আনার জন্য আবার জোরে বৈঠা ফেলা হয় এবং প্রধান গায়েন নৌকার পালগুঁয়ায় জোরে লাথি দিতে দিতে আবৃত্তি করে।" যেমন-

হেঁইয়ো জোয়ান হেঁইয়ো।
সামনে চলো হেঁইয়ো।।
আগে চলো হেঁইয়ো।
ঢাকা চলো হেঁইয়ো।।
ঢাকা যাইতে হেঁইয়ো।
পদ্মা নদী হেঁইয়ো।।
পদ্মা নদীত্ হেঁইয়ো।
আটু পা'নি হেঁইয়ো।।. . .

সিদ্দিকীর অভিমত হলো, "একাধিকক্রমে কোন কিছুতে শক্তি প্রয়োগ মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ! 'হেঁই য়ো জোয়ান হেঁইয়োর' পরে অপেক্ষাকৃত কোমল লয়ের গানগুলি কিছুটা '**relief**' ও এনে দেয়।" কথাগুলি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এখানে সিলেট ও ময়মনসিংহের বাইচগান উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরছি। যেমন —

১. সিলেটের বাইচ গান ঃ

ও রঙের গুঁরারে ও রঙের বৈঠারে রঙে রঙে বাইয়া যাওরে।।
(ধুয়া) হারে তাড়িয়া নাড়িয়া নারে তাইরে নাইরে না।
হারে চলিল রঙের ঘোড়া শূন্যে উড়াল দিয়া।।
হারে পান খাইতে সুপারী লাগে আরও লাগে চুন।
হারে ঘুষিয়া ঘুষিয়া জ্বলে পীরিতের আগুন।।
হারে পীরিত যতন পীরিত রতন পীরিত গলার হার।
হারে পীরিত কইরা যেজন মরে সফল জনম তার গো —
সফল জনম তার।।
হারে তাড়িয়া নাড়িয়া নারে তারি নারি নারি।।
হারে বন্ধুর দেশে যাইবা যদি কর তাড়াতাড়ি।।. . .

২. আইজ তোরে ঘুংগুরা দিল কে বাছা নীলমণিরে —

আইজ তোরে ঘুংগুরা দিল কে (ধুয়া)।

ওরে গেছিলাম গেছিলাম দত্তের পাড়ায়,

ওরে সুন্দর দেখিয়া তারা ঘংগুরা দিল রে . . .।

৩. ময়মনসিংহের বাইচ গান ঃ

হারে রাম গেল বনবাসে রেইলা হইল রাঢ়ী।

হারে উগার তলে কাইন্দা মরে কোদালের আছাড়ি।।

হারে ছোটকালের পীরিত যেন কাঠালের আঁঠা।

হারে ছাড়াইলে না ছাড়ে ভাই এ বিষম ল্যাঠা।।

হারে পীরিত পীরিত বলে লোকে পীরিত বড় লজ্জা।

হারে রসিক দেইখাঁ পীরিত কইরো নইলে বিষম জ্বালা।।

হারে সতী নারীর পতি যেমন মজিদের চূড়া।

হারে অসতী নারীর পতি ভাঙা নায়ের গুঁরা।।

হারে ভাঙা নায়ের গুঁরা যেমন লটর বটর করে।

হারে অসতীরও পতি তেমনি জলে ডুইবা মরে।।

উপরিউক্ত গানগুলিতে লক্ষণীয়, 'হারে' কথাটির ওপর প্রস্বর (**accent**) পড়ায় পায়ের তাল দিতে বাইচদের সুবিধা হয়। বরং এভাবে বলা ভালো, পায়ের তাল দেওয়ার সুবিধের জন্যই 'হারে' শব্দটির বহুল প্রয়োগ হয়েছে। আর একটি কথা বলা এখানে উচিত হবে, বিশেষ করে ময়মনসিংহের গানটির 'হারে ছোটকালের পীরিত যেন কাঠালের আঁটা' পংক্তিটির প্রভাব পরবর্তীকালে প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারীর বাউলগানেও উঠে এসেছে, যেমন —'পিরীতের কাঁঠালের আঁটা লাগলে পারে ছাড়ে না' পংক্তিটি এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

পূর্ববঙ্গের বাইচগানে আবার হাস্য-কৌতুক ও রসিকতাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন সিলেটের একটি বাইচ গান —

তোরা বাওরে বাও — রঙী বাঁশের বৈঠারে মাধব লইয়ার নাও (ধুয়া)।

উড়িয়া যায় শূন্য পাখী তার পায়ে নেপুর, মাথাত্ খাচরাইরা কান্দে বৈরাগী ঠাকুর।

এরকম অনেক বাইচ গানে লক্ষ্য করা যায় হাস্য-কৌতুক ও রসিকতা।

বাইচগানের শুরুতে যে 'শ্রমসঙ্গীত' প্রচলিত আছে, কালক্রমে অনেক কর্মের মধ্যেই এরূপ 'শ্রমসঙ্গীত' শোনা যায়। ছাদ পিটানোর গানের মধ্যেও যেমন এ সুর লক্ষ্য করা যায়, তেমনি পূর্ববঙ্গে কোনো কোনো অঞ্চলে তাঁত চালাইবার সময় শ্রমকে লাঘব করবার জন্য

তাঁতীরা গান গেয়ে থাকে। পূর্ববাংলার মুসলমান তাঁতীদের একটি গান এখানে তুলে ধরছি।
[illegible] —

মরি হায় রে, আল্লা হায়,

আমি কি করিব কোথা যাব না দেখি উপায়।

কলিকাতা আইসা আমি ঠেক্‌লাম বিষম দায়।।

আমি পরথমে বন্দনা করি শিক্ষাগুরুর পায়।

ঐ, যে-গুরুতে হাত ধ'রে শিখায় ডাইনে বাঁয়।।

দেখেন, অন্য দফায় যেমন তেমন এই দফায় জোম।

ঠেইলা নিব এইভাবে শনি, রবি, সোম।।

তালিমে বলে মুন্সী চল হাটে যাই।

সোলার নৌকায় পাখায় উইঠা পরীক্ষা চালাই।।

তবে, শ্রম-সঙ্গীতের মধ্যে সারিগানের মতোন কোনো উচ্চাঙ্গ সাহিত্যিক গুণ নেই। নেহাৎই সাদামাটা। ডঃ আশুতোষবাবুর কথা অনুসারে বলা যায়, "প্রায় সর্বত্রই অসংযত হৃদয়োচ্ছ্বাসের অর্থহীন অভিব্যক্তি মাত্র।"

এমনকি, সারিগান গণ আন্দোলনের জন্য রচিত গানের মধ্যেও ঢুকে পড়ে তার আপন সুর ও ঢঙ নিয়ে। এখানে একটি উদাহরণ রাখা যেতে পারে। যেমন সারিগানে যেখানে শোনা যেত ঃ

সাবধানে গুরুজীর নাম লইও রে সাধুভাই

সাবধানে গুরুজীর নাম লইও।

গণ আন্দোলনের জন্য রচিত গানের মধ্যে আমরা শুনি ঃ

কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষান ভাই রে

কাস্তেটারে দিও জোরে শান।।

ফসল কাটার সময় এলে কাটবে সোনার ধান

দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে তাহার জান রে।...

শুধু কি গণ আন্দোলনের জন্য রচিত গানে, বাংলা নাটক ও আধুনিককাব্যকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। দিনেশ দাসের 'কাস্তে' কবিতায় যখন বিশেষত বলেন —

বেয়নেট হোক যত ধারালো —

কাস্তেটা ধার দিয়ো বন্ধু!

শেল আর বম হোক ভারালো

কাস্তেটা শান দিয়ো, বন্ধু।

এখানে সারিগানেরই প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখি। আবার, সারিগানের শ্রম-সঙ্গীত-এর ধারাই বিশেষ করে ঢুকে পড়ে বাংলা নাটকে। গিরীশচন্দ্র ঘোষের "হরগৌরী" নাটকে ও অমৃতলালের "সাবাস বাঙালী" ও ক্ষীরোদ প্রসাদের "আলিবাবা" নাটকে বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়। এখানে উল্লেখ রাখছি "সাবাস বাঙালী" নাটক থেকে —

গানটি তাঁতীর গান ঃ

দেখ দাঁত -- পেড়ে কি সরেশ সাড়ী

করেছ তাঁতির তাঁতে।

সেই আমার তাঁতির তাঁতে যে হাল ফাঁদে।

মরে বাঁচে বামার কথাতে।

তারই মাকু তারই যানা

তারই পোড়েন তারই টানা,

আমি লাটায়েতে খাটিয়ে সূতো

পাট করেছি নিজের হাতে।

এরকম অজস্র উদাহরণ রাখা যেতে পারে।

সারিগানের শ্রেষ্ঠত্ব মূলত তাঁর রাগ-রাগিনী ও তালের উল্লেখের জন্য। সারিগান যে কত কবিত্বশক্তিতে ভরপুর ছিল তা বোঝা যায় সারিগানের রূপক ব্যবহার দেখে। যেমন —

নাও দৌড়াই রে, হিলচিয়ার খালে।

পাগলা কুত্তাকামড় দিল বুইড়া বেটির গালে।।

কাজেই, সব দিক বিচার-বিবেচনা করে সারিগানকে লোকসঙ্গীতের একটি উজ্জ্বল উঁচুমানের গান হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে, যা আপন মহিমায় মহিম্বানিত। বিশেষ করে আর একটি কথা বলা সঙ্গত হবে, সারিগানের চিত্র ও ভাব পরবর্তীকালে বাংলা আধুনিক কাব্যকে অলংকৃত করেছে, এবং বাংলা আধুনিক কাব্যে এক প্রাণসঞ্চার করেছে। যদিও এখন সারিগানের জনপ্রিয়তা তেমন রমরমা নয়। তবে, একদম নিঃশেষ হয়ে যায়নি। বলা ভালো, পরিবর্তিত হয়ে যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাঝি-মাল্লারদের গানে ও শ্রম-সঙ্গীতের মধ্যে নিজের আপন অস্তিত্বকে প্রদীপের শিখার মতোন প্রজ্জ্বোলভাবে জ্বালিয়ে রেখেছে।

ঝুমুর গান

ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পারগণা জেলার বিভিন্ন আদিবাসী জাতির মধ্যে যে সব লোকগীতি বা লোকসঙ্গীত প্রচলিত ছিল, তারই একটি হলো ঝুমুর গান। এককালে আদিবাসীদের মধ্যেই এই সঙ্গীতের প্রচলনের সীমাবদ্ধতা ছিল। উত্তরে সাঁওতাল পরগণা থেকে শুরু করে দক্ষিণে সমগ্র ছোটনাগপুর ও পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশের পূর্বভাগ পর্যন্ত আদিবাসীদের মধ্যে ঝুমুর গানের প্রচলন ছিল বেশ ব্যাপকভাবে। তবে, সাঁওতাল পরগণার মুণ্ডাভাষী সাঁওতালদের মধ্যে ঝুমুর গান সবচেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁদের সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণে ঝুমুর গানের প্রচলন ছিল যেন বাধ্যতামূলক। বলা যায়, যেহেতু পশ্চিমবাংলার পশ্চিম-সীমান্ত সংলগ্ন সাঁওতাল পরগণার আদিবাসী সাঁওতালরা ছিল এক দো-ভাষী জাতি -- সেহেতু বহুকাল ধরে তাদের মাতৃভাষার সঙ্গে বাংলাভাষাকে তারা গ্রহণ করেছিলেন বলেই উৎসব ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাংলাভাষায় সঙ্গীত রচনা করে গাইবার ঝোঁক বাড়ে। এ কারণে সাঁওতাল পরগণা ও মানভূম জেলার সর্বত্র সাঁওতালদের মধ্যে ঝুমুর গান ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত এই বাংলা ঝুমুর গানই কালক্রমে লোকসঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আদি ঝুমুর গান ছিল সব রকম লোকসংস্কার থেকে মুক্ত। তাতে ছিল প্রধাণত বাস্তব জীবনের সমস্যার নানা কথা। বলা যায়, কালক্রমে বাঙালীর বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত এবং উচ্চতর সঙ্গীতের প্রভাবই ঝুমুর গানের রূপ, সুর ও ভাবের ক্রমশ পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এর ফলেই উপজাতীয় ঝুমুর গান ধীরে ধীরে বাংলা লোকসঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

আমরা জানি, প্রত্যেক আদিবাসীদেরই নৃত্যগীতের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকে। সেই স্থানটিকে আখ্ড়া বলা হয়। আখ্ড়াতেই সাঁওতাল যুবক-যুবতীগণ সমবেত ভাবে দলবদ্ধ হয়ে নৃত্যগীতে প্রারম্ভে সর্বপ্রথম একটি বন্দনাগীত গেয়ে থাকেন। মানভূম জেলার প্রচলিত এরূপ একটি বন্দনাগীত হলো --

আখড়া বন্দিরা, গুরু, ভালা গীতা গাই।

গুরু রামলক্ষ্মণ সাদরে বাজাই।

সীতামণি ঝুমুরে খেলাই।

উপরিউক্ত বন্দনাগীতটির দিকে দৃকপাত করলেই বোঝা যায় 'ঝুমুরে খেলাই' কথাটির মধ্যে মানভূম জেলার সাঁওতালদের ঝুমুর গানের জনপ্রিয়তা। এককথায় বলা ভালো, ঝুমুর গান ছিল তাদের জীবনের আমোদ-প্রমোদ, আচার-অনুষ্ঠানের এক বীজমন্ত্র! তবে, সাঁওতালদের মধ্যে যে ঝুমুর গানের প্রচলন ছিল সেসব গানগুলি আকারে ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। চারটি পদের

অধিক নয়। কোনো কোনো সময় তিনটি পদও থাকে। দ্বিতীয় পদটির সাধারণত একবার পুণরাবৃত্তি করে চারটি পদ পূরণ করতে হয়। একটা কথা এখানে বলা সমীচীন হবে, ছোট চারটি পদের ঝুমুর গানেই কবিত্বশক্তির দক্ষতা বেশ তীক্ষ্ন। কোথাও এতটুকু শিথিলতা নেই। রস-ব্যঞ্জনের নিখুঁত বাঁধুনিতে বেশ উৎকৃষ্ট। এখানে এরূপ একটি উদাহরণ রাখছি ---

কোন সে মেয়ে জীবনটা যার শেষ হল ঐ
ও বন্ধু, গঙ্গা এবং যমুনাতে ওর খোঁপার ফুলটা ভাসে
ছোট্ট মেয়েটি অল্প সময়ে শেষ হল ঐ
ও বন্ধু, গঙ্গা এবং যমুনাতে ওর খোঁপার ফুলটা ভাসে।

এই উপরিউক্ত ঝুমুর গানটির লক্ষণীয় ব্যাপার হলো অসম্ভব কবিত্বশক্তি। প্রকাশে সাবলীল, এতটুকু কৃত্রিমতা নেই। আর দ্বিতীয় পদটির পুণরাবৃত্তি যা রস ও ভাবকে এতটুকু খাটো করেনি। এটাই সার্থক ঝুমুর গানের একটি উজ্জ্বল দিক। সাঁওতালিদের এই ঝুমুর গানগুলি আকারে ক্ষুদ্র হলেও বেশ গীতল এবং একালের অণুকবিতার মতোন ব্যঞ্জনাধর্মী। তবে, সাঁওতালিদের অধিকাংশ ঝুমুর গানগুলির বিষয় প্রেম। আবার এই ঝুমুর গানগুলি কিন্তু একালের অনুকবিতার মতোন বেশ চিত্রধর্মী। চিত্রকল্পের ব্যবহারেও বেশ মুন্সীয়ানা লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশই ঝুমুর গান অবশ্য রূপকাশ্রয়ী। এজন্যই ঝুমুর গানগুলি রসঘন পুষ্ট। এখানে এরকম দুটি ঝুমুর গান উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরছি ---

১. বাড়ী হেঁটে পুখরী,
পুখরীতে ফুলের বাগান।
কার বেটি এত রসিকা গো,
আধরাতি ফুল তুলি যায়।

২. ছোট মোট বাঙন বেটী
ভাঁড়ার পড়ে চুল।
মোচড়ে বান্ধিবে কেশ
কদম ফুলের পারা।।

এই গান দুটিতে লক্ষণীয় বিষয়টি হলো, রূপকের সার্থক ব্যবহার নজরে এলেও কিন্তু এখানে পদের মিল না থাকার জন্য এতটুকু রসহানি ঘটেনি। ভাব-ব্যঞ্জনা প্রকাশে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। যদিও প্রেম সাঁওতালি ঝুমুর গানের ভেতরে প্রাধান্য পেলেও কিন্তু অনেক ঝুমুর গানেই লৌকিক বিষয়ও উঠে এসেছে। এবং তা সার্থকভাবেই।

তবে, সাঁওতালদের মতোন ওঁরাও আদিবাসীদের মধ্যে যে ঝুমুর গানের প্রচলন আছে, তা কিন্তু সামান্য দীর্ঘও, কখনো-সখনো আট থেকে দশটি পদ পর্যন্ত থাকে। পদগুলি কিন্তু সংক্ষিপ্ত আকারের। অনেকটা চর্যাপদের মতোন। সাদ্রি ভাষায় রচিত ওঁরাওদের একটি গান যেমন ---

এসো কা বরখা বড়ী জোর।
ভীংজয় সোরে সোর।।
এসো কা বরখা বড়ী জোর।
রোপলি হম্ রোপা ধান।
বদ্‌রী গরজে অসমান্।।
বনমে নাচত হৈঁ মোর।
এসো কা বরখা বড়ী জোর।।
খেত চাঙ্গৈঢ় কিসান ঠাঢ়।
ভরল নদীকে দেখে বাঢ়।।
অন্নধান না হোবেঃ থোর।
এসো কা বরখা বড়ী জোর।।

এই গানটির বিশেষত্ব হলো, পদের মিলবিন্যাসে কাহিনী-গাঁথা। যা মুগ্ধ করে। তবে, সাঁওতালি ঝুমুর গানের লৌকিক প্রেম যে কিভাবে বাংলাদেশের সীমায় প্রবেশ করে রাধাকৃষ্ণের প্রেমে স্বর্গীয়তা লাভ করেছে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বিশেষ করে সাঁওতালি ঝুমুর গানের সঙ্গে বাংলা ঝুমুর গানের তুলনা করলেই তা দেখা যায়। যেমন ---

ছোট নদী ছোট জল
বড় নদী বড় জল।
হাতের শাঁখা মাজাইতে
কানের সোনা পড়ি গেল।
তাতে আমি খুঁজিতে বিলম্ (বিলম্ব)।।

নদী থেকে জল নিয়ে আসবার পথে প্রণয়প্রিয় পুরুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য ঘরে ফিরতে দেরী হয়। তাই অগত্যা মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে দেরীতে ফেরার কারণস্বরূপ প্রণয়িনী বলছে গানটিতে --- বড় নদীতে জল বেশি, তাই তাতে কিছু পড়ে গেলেও খুঁজতে দেরী হয়। হাতের শাঁখা মাজার সময় তার কানের দুল খসে জলেতে পড়ার দরুন তার দেরী হয়েছে। এই গানটিকে সামনে মেলে ধরলে কি আমাদের শ্রীরাধিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় না? বাংলাদেশের পটভূমিকায় এই গানটিকে কি কেবল লৌকিক রূপের প্রকাশ বলে মেনে নেওয়া

যায়? না, মানা সম্ভব! ঠিক এরূপ আর একটি গান এখানে তুলে ধরা যেতে পারে —

যখন আমি জলকে বা যাইতেছিলাম,
তখন তুমি কদমতলে বঁশীও বলায়।
ন বঁশী বলায় হে, জলে কলসী ডুবে নাই।।

অর্থাৎ আমি যখন জলের ঘাটে যাচ্ছিলাম তখন তুমি কদমতলায় বাঁশী বাজাচ্ছিলে। তুমি আর বাঁশী বাজিও না, এখনো যে আমি কলসী জলে ডোবাতে পারিনি। এই সঙ্গীতটি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় বাংলাদেশের রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী সাঁওতাল জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু এ অনুমান সত্যি নয় — বরং যেটা ঘটেছে তা হলো ঠিক উল্টোটাই। বংশীবদন-প্রীতি তেমনি কদম্ব (করম্) বৃক্ষও তাঁদের কাছে করম্ নামে পরিচিত। ভাদ্রমাসে এই বৃক্ষের শাখা রোপণ করলে নৃত-গীতাদি দ্বারা উৎসব পালন করা হয়। এই উৎসব বর্ষাকালে হয়। বর্ষাকালে বৃক্ষ রোপণের এই উৎসবই করম্ নামে পরিচিত। এ কারণে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, বাংলাদেশে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর মধ্যে যে কদম্ব বৃক্ষ ও শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদনের বৃত্তান্ত এত ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করেছে তার মূলে আছে বাংলার প্রতিবেশী আদিমজাতিদের বংশ-প্রীতি ও করম্ (কদম্ব) উৎসব উদ্‌যাপনের ইতিহাস। যা বোধকরি কোনোমতেই আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই।

এই করম্ উৎসব উপলক্ষে বহু গান বাঁধা হয়। করম্ অর্থাৎ কদম্ব গাছ যে আদিবাসী জাতিদের কাছে কত প্রিয় তা বোঝা যায় কদম্ উৎসবের উদ্‌যাপনের ব্যাপকতা দেখে। করম্ উৎসব উপলক্ষে আদিবাসীদের মধ্যে যে গানের কথা ও সুর বাঁধা হতো তার শিল্পগুণে দরদী কবি-হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে বাংলাভাষায় ভাষান্তরিত একটি করম্ গানের উল্লেখ করছি, যা শিল্প নৈপুণ্যে অসাধারণ —

করম করম করম রাজা
ও করম তোমার জন্যে ঐ ত রাজার ছাতা
করম তুমি আমাদের ধান চাল সব দাও
করম তুমি আমাদের মিষ্টি এবং গরু বাছুর দাও
করম তোমার জন্য ঐ রাজার ছাতা।

উপরিউক্ত গানটি থেকে সহজেই বুঝতে পারি আমরা, করম্ উৎসব তাদের যেমন প্রিয় উৎসব, তেমনি বর্ষা তাদের প্রিয়ঋতুও বটে। বর্ষাকে তারা অন্নদাতা বলেই জানে। এ কারণে করম মানে তাদের আরাধ্য উপাসক-দেবীর কাছে তারা তাদের সংসারের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে। কামনা করে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী।

নাচের সঙ্গে ঝুমুর গানের গভীর সম্পর্কের ফলে নাচের নাম অনুযায়ী ঝুমুর গান হয় বিভিন্ন রকমের। মোটামুটি নাচের নাম অনুসারে ঝুমুর গানকে ছটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় -- দাঁড়শালিয়া ঝুমুর, ছো নাচের ঝুমুর, খেমটি ঝুমুর, পাতা নাচের ঝুমুর, ভাদুরিয়া ঝুমুর, করম নাচের ঝুমুর। এই ছয়শ্রেণী ঝুমুর গান সম্পর্কে একটু আলোচনায় আসি। যেমন—

১. দাঁড়শালিয়া ঝুমুর ঃ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে দাঁড়শাল নৃত্য উপলক্ষে যে গান গীত হয়, তাকেই দাঁড়শালিয়া ঝুমুর বলা হয়। এ নাচ পুরুষরাই করে। মেয়েদের কোনো সম্পর্ক নেই। এ নাচের সঙ্গে বিশেষ কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানের সম্পর্ক নেই। নিতান্তই আমোদ-প্রমোদের জন্য পুরুষেরা এ নাচ করেন। তবে দাঁড়শালিয়া ঝুমুর আকারে সংক্ষিপ্ত। দু থেকে চারটি সাধারণত পদের হয়। ধর্মের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও কদাচিৎ দাঁড়শালিয়া ঝুমুরে কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গও চোখে পড়ে, যেমন -

পথ মাঝে নট সাজে, সখি দাঁড়াই যে বা কে গো,
কে কে কালোপারা বাঁশী ধরা কে গো,
মুখ ভরা বাঁশীটি গলে মালা দোলে গো,
তুলে কে পরাণে দোলে গো, সখী পরাণে দোলে গো।

(পুরুলিয়া)

২. ছো নাচের ঝুমুর ঃ ছো নাচ পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় নৃত্য। ছো নাচ বাংলাদেশের মুখোশ নাচের একটি শ্রেণী। অবশ্য অনেক সময় এ নৃত্য মুখোশ ছাড়াই পরিবেশিত হয়। ছো নাচের বিষয়বস্তু প্রধানত রামায়ণ। দেব-দেবীর কাহিনীকে নিয়ে এ নাচ পরিবেশিত হয় প্রধাণত। তবে, অধ্যাপক সুধীর করণ কিন্তু ছো নাচের প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে রামায়ণের কথা অস্বীকার করেন। তাঁর অভিমত হলো, "শিবের গাজন উপলক্ষ্যেই এই নৃত্যগীতির উদ্ভব। যা মূলতঃ গাজনের সং ছিল, তাই পরে রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সং-কৃতিকে বর্জন করে।" ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আবার ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর অভিমত হলো নৃত্যের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক থাকলেও -- "তবে এখন আর ইহা ধর্মানুষ্ঠান নহে, ভক্তির ভাব যে তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় তাহাও নহে -- নিতান্ত সহজ আনন্দানুষ্ঠান ব্যতীত ইহা এখন আর কিছুই নহে।" তবে, এ নাচের চল পুরুলিয়াতেই অধিক। পুরুলিয়ার একটি নিজস্ব আদিবাসীসমাজের ঘরানার নৃত্য হিসেবে ছো নাচের ঝুমুরকে চিহ্নিত করা হয় প্রধাণত পুরুলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে এর ব্যাপক প্রসারের জন্য। দুটি ছো নাচের ঝুমুরের উদাহরণ রাখছি যা ছন্দ-নৈপুণ্যে অসাধারণ —

ক. সিন্দুর ভূষিত অঙ্গ মুষিক বাহন
প্রথমে বন্দনা করি গণেশ চরণ।

(পুরুলিয়া)

খ.	পিতৃসত্য পালিবারে শ্রীরাম লক্ষণ,
চতুর্দশ বর্ষ বনে করেন গমন।।

(ঐ)

কদাচিৎ আবার ছো নাচের ঝুমুরেও রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়।

৩. খেমটি ঝুমুর ঃ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া অঞ্চলে নাচনীরা নৃত্যকালে যে গান গায়, এবং এদের পৃষ্ঠপোষক রসিকেরা যে গান গান তাকেই খেমটি ঝুমুর বলা হয়। এই ঝুমুর গানের প্রধাণ বিষয় হলো রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা। মেদিনীপুর জেলাতেও এই খেমটি ঝুমুরের প্রচলন আছে। এখানে পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলার একটি করে খেমটি ঝুমুর গান উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরছি বৈষ্ণবকাব্যের রাধাকৃষ্ণ লীলার প্রেম কাহিনীর মতোন বেশ গীতল ও রসগ্রাহী। যেমন ---

ক.	শুনগো বিন্দে, দিবানিশি প্রাণ কান্দে গো,
আমি থাকিতে না পারি ধৈর্য ধরিয়া।
গো বৃন্দে, এখনও না এল কালিয়া।

(পুরুলিয়া)

খ.	গাঁথিব ফুলেরই মালা, যতনে সাজাব কালা,
আমি ঘুচাইব মনের জ্বালা, দুঃখ যাবে দূরে।
বন্ধু, হৃদয় মাঝারে শ্যামকে রাখিব আদরে।
না আইলে নন্দলালা কেমনে মিটাব জ্বালা
থাক থাক প্রাণবল্লভ বাঁধা প্রেম-ডোরে হৃদয় মন্দিরে।
শ্যামকে রাখিব আদরে।

(মেদিনীপুর)

৪. পাতা নাচের ঝুমুর ঃ আদিবাসীদের মধ্যে সখীত্ব বা বন্ধুত্ব পাতাবার জন্য যে নৃত্যের চল আছে তাকেই বলা হয় পাতা নাচ। এই সখীত্ব বা বন্ধুত্বের মাধ্যমেই সাধারণত আদিবাসীরা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী নির্বাচন করে থাকেন। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই তাই এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে। পরে আদিবাসীসমাজ থেকে এই নৃত্যটি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত হয়। এ নৃত্যটিকে যাদুবিদ্যাগত বলে মনে করা হয়। এর মূল কারণ হলো পাতা নাচের ঝুমুরে সাধারণ জীবনের সমস্যা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি এসেছে রামায়ণ ও ভাগবত প্রসঙ্গও। এখানে উদাহরণস্বরূপ দুটি গান উল্লেখ করছি ---

ক.　　ছানা কাঁদে মাই মাই, মুড়ি দিল মান নাই।
থাম বাছা দু'পহরে রাঁধি, তোর বাপের গাল সইতে নারি।

খ.　　ও তোরা দেখ বেজোবাসী,
এমন সুন্দর রামকে কে করল সন্ন্যাসী।
(মেদিনীপুর)

এখানে উপরিউক্ত উদাহরণের (খ) গানটিতে রাম ও কৃষ্ণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সুরের দিক থেকে অনেকটা পদাবলী কবিতার মতোন। যা স্বাভাবিক কারণে আকৃষ্ট করে।

৫. ভাদুরিয়া ঝুমুর ঃ এ গান ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতে পশ্চিমবাংলার সীমান্তের আদিবাসীদের ভরা বর্ষার প্রাকৃতিক বন্দনাগীত। নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভাদুরিয়া ঝুমুর গান গাওয়া হত। তবে ডঃ আশুতোষবাবুর মত বাদ দিয়ে বলা যায় বর্ষার সময়ে নৃত্য ছাড়াও ভাদুরিয়া ঝুমুর রচিত হয়ে থাকে। এই ভাদুরিয়া গানের বিষয়বস্তু আদিবাসীদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মান-অভিমান প্রভৃতি। গানগুলি আকারেও সংক্ষিপ্ত। এখানে একটি উদাহরণ রাখছি —

ভাদর মাসে পিয়া পরদেশে
বলে দিও হে যেন নাগর আসে।
না দেখি হাটে না দেখি বাটে,
গুণমণিরে মন ভাঙ্গিল কিসে।।
(পুরুলিয়া)

৬. করম নাচের ঝুমুরের কথা আগেই বিস্তারিত ভাবে বলেছি। তবে, করম উৎসবে আদিবাসীদের মধ্যে যে শস্যোৎসব উপলক্ষে পূজা করা হয়, সেই উৎসব উপলক্ষে করম রাজা ও করম রাণীর আনুষ্ঠানিক বিয়েও দেওয়া হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতে, "করম রাজা সূর্য এবং করম রাণী পৃথিবীর প্রতীক।.... করম বা পাহাড়ী কদম্ব বৃক্ষের একটি শাখা মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া তাহা ঘিরিয়াই নৃত্যগীত চলিতে থাকে। মূলতঃ আদিবাসী সমাজেই এই অনুষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়াছিল, বর্তমানে সেই অঞ্চলের বর্ণ হিন্দুগণও ইহা পালন করিয়া থাকেন। ভাদ্র মাসের শুরু পক্ষের একাদশী তিথিতে ইহার অনুষ্ঠান হয়। একটি গাছের ডাল মাটিতে পুতিয়া রাখা হয় বলিয়া ইহাকে ডালগাড়াও বলা হয়।"

এ নৃত্যটিতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই অংশ গ্রহণ করেন। সামগ্রিকভাবে বলা যায় করম নৃত্য যাদুবিদ্যাগত। অবশ্য করম ঝুমুরের প্রধান বিষয় হলো লৌকিক।

তবে, সাহিত্যের গুণগত দিক দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলে যে সত্যটি আমাদের

চোখের সামনে স্পষ্ট হয় তা হলো -- ঝুমুর গান সামগ্রিকভাবে বৈষ্ণবসাহিত্যকে প্রভাবিত করে কৃষ্ণ-রাধিকার লীলাকাহিনীতে ঢুকে পড়ে বৈষ্ণবসাহিত্যকে আরো পুষ্ট ও রসগ্রাহী করে তুলেছে। আবার আর একটি জিনিষ লক্ষণীয় তা হলো ঝুমুর গান তার সাহিত্যের গুণগত চিরন্তনতা রক্ষা করে চলেছে আধুনিক কবিদের কাব্য-নাটকের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আধুনিক কবি বিশ্ববরেন্য রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মূলত বৈষ্ণবসাহিত্যের আরশিতে প্রতিবিম্বিত হয়ে ঢুকে পড়েছে বলা যেতে পারে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের "মানসী" কাব্যগ্রন্থের 'বধূ' কবিতাতে যা লক্ষণীয় —

দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো!
সদাই মনে হয়—আঁধার ছায়াময়
দিঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।
ডাক্ লো ডাক্ তোরা, বল্ লো বল্ --
'বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চল্।'

এখানে চিরবিরহিনী রাধিকার কথাই কি আমাদের মনে করিয়ে দেয় না? বলতে কুণ্ঠা নেই, বাংলা আধুনিক কাব্যের লিরিক মেজাজটি কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে প্রধাণত বৈষ্ণবকবিতার মাধ্যম হয়ে ঝুমুর গানেরই। ঝুমুর গান বলা যায় রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ হাত ধরে তাঁর কাব্য হয়ে লিরিক-কবিতার একটি ঝরনার প্রস্রবণ হয়ে আধুনিক কবিতার অঙ্গনে হৈ-হৈ করে নীরবে ঢুকে পড়েছে। যা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

আমরা সাধারণত কালো প্রেমিকপুরুষ বলতে একমাত্র কৃষ্ণকেই বুঝি। কিন্তু, সাঁওতালদের গায়ের রঙ যেহেতু কালো — তাদের প্রেমিকযুবকের উদ্দেশ্যে সাঁওতালি ভাষায় প্রেমবিষয়ক যে ঝুমুর গানের নিদর্শন পাওয়া যায় সেখানেও তাই কাল-পুরুষের কথা স্বাভাবিক কারণে এসেছে। যেমন —

'হেট কুলি উপর কুলি
কিসের লাগি এত আনাগোনা।'
'বার টাকার শিকড়ি
তের টাকার মাকড়ি
কাল-ছোঁড়া নিয়ে গেল
তা'তে আমি কুলি আনাগোনা।'

আবার, গোকুল এবং মথুরার মাঝে যমুনার ব্যবধান যেমন শ্রীরাধিকার কাছে দুরন্ত হয়ে উঠেছিল, তেমনি সাঁওতালি বাংলা ঝুমুর গানেও প্রেমিক- প্রেমিকার মিলনের নামে এক

দুরতিক্রম্য নদীর ব্যবধানের কথা শুনতে পাওয়া যায় ---

মায়ে বাপে আমায় জনম দিল।
দশে পাঁচে আমার বিহা দিল।।
নদীপারে আমার শ্বশুর বাড়ী।
স্বরগের জল পড়ে নদীতে বান।।
আসা যাওয়ার আমার বারণ হইল।
আগু ত মন দৌড় পিছে ত বেঙ্
আঁখির লোর পড়ে মনে মনে।।

বলা যায়, এরকমভাবে সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের বিভিন্ন ভাষায় রচিত আদিবাসীর ঝুমুর গানগুলি বিচার-বিশ্লেষন করলে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, বাংলার লোকসঙ্গীতের রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর পটভূমিকা রূপাঙ্কনে এর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।

আবার, সাঁওতালি ঝুমুর গানগুলি যেহেতু বাংলাদেশের লৌকিক প্রেমসঙ্গীতের মতোন একটি নির্দিষ্ট ধারায় অগ্রসর হয়নি বলে একটা স্বতস্ফূর্তঃ সঙ্গীতের স্বাধীন বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে অনেক সাধারণ বিষয়ও বাংলা সাঁওতালি ঝুমুর গানে উঠে এসেছে। যেমন ---

সারাদিন সারারাত
বাজালি রে রসিক
এখন বলে যাব যাব
কোন পথে পালাবি রে রসিক
মাঝ কুলি আছে জিঞ্জিরি।।
হেট কুলি আখাড়া
উপ কুলি আখাড়া।।
আখাড়া বড় রে জমক।
তুমি হো না আইলি দাদা
আমি হো না গেলি রে
আখাড়া বড় রে জমক।।

একটা কথা বলা সমীচীন হবে, এই ঝুমুর গানগুলি আদিবাসী সমাজজীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় এবং এই গানগুলি বাংলা লোকসঙ্গীতের একটা নতুন দিক খুলে দেয়।

প্রধাণত মানভূম জেলার বাঙালী নর্তকীদের দ্বারা বাংলা ঝুমুর গান ছোটনাগপুরে, রাঁচী ও পালামৌ জেলায়, উড়িষ্যার গাংপুর, মধ্যপ্রদেশের যশপুর প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছে। বাঙালীরা আবার অল্পদিনের মধ্যে ধীরে ধীরে ঝুমুর গানগুলিকে আত্মস্থ করে নিজস্ব সংস্কৃতিধারার সঙ্গে যে যুক্ত করে নিয়েছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বাঙালীরা যখন রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর মধ্যে সে গানের সঞ্চার ঘটালেন, এরকম একটি ঝুমুর গান এখানে উল্লেখ করছি, যা একান্তই বাঙালীর সাংস্কৃতির উপকরণ হিসেবে পরীগণিত ---

সই, সাধে বাদে আগুন জ্বেলেছি।
আদর ক'রে কালনাগিনী
বুকে নিয়ে খেলেছি।
নাহি জানি সুধার আশা,
পিয়াসে চাই পিয়াসা,
জ্বলে মরি তবু করি শ্যাম-প্রেমের আশা।
বিরহে যতন করে আশা জলে ফেলেছি।।

ক্রমশ ঝুমুর গানের মধ্যে নানা বৈচিত্রও এসেছে। যেমন আধ্যাত্মিক বিষয় থেকে বৈরাগ্য পর্যন্ত। এখানে এরূপ দুটি গানের উদাহরণ রাখছি ---

১. আধ্যাত্মিক বিষয়ক ঃ

হে করুণাময় হরি!
আর কবে করিবে কৃপা বুঝিতে না পারি।
তুমি হে ভব-কাণ্ডারি, আছি তোমার ভরসা করি,
হে ভব-তুফান হতে কেমনে হে তরি।।
অধম পাতকিগণে উদ্ধারিলে কত জনে,

২. বৈরাগ্য বিষয়কঃ

ঘরেতে অন্‌ধন বাহিরেত গরুবাছুর
সব কিছু মিছা।
বনের কাঠ গাঁয়ের আগুন
সঙ্গে নিয়ে যায়।।

ঝুমুর গানেব সুর ও কথা কিছু পরিবর্তিত রূপে আবার বাংলা কীর্তন গানেতেও ঢুকে পড়েছে। যাঁরা কীর্তন গানের চর্চা করেন তাঁরা বোধকরি এ-কথা স্বীকার করবেন একটি

কারণে, ছোটনাগপুরের আদিবাসী ওঁরাও জাতির নৃত্যসম্বলিত লোকসঙ্গীতের একাংশের নাম ছিল কীর্তন। মোদ্দাকথা হলো, ঝুমুর গান তাঁর সুর ও কথা-বৈচিত্রের জন্যই নানাভাবে লোকসঙ্গীতের প্রায় প্রতিটি স্তরেই তার ছায়া প্রসারিত করে।

ঝুমুর গানের মধ্যে এমনই এক সঙ্গীত গুণ ছিল যে বাংলা নাটকেও ঢুকে পড়েছে লক্ষ্য করা যায় মধুসূদনের হাত ধরে। মধুসূদনের "শর্মিষ্ঠা" নাটকের গানে লক্ষ্য করা যায় বিশেষ করে ভাষা ও সুরের মধ্যে ঝুমুরের উজ্জ্বল উপস্থিতি —

আমি ভাবি যাব ভবে, -- সে তো তা ভাবে না।
পরে প্রাণ দিয়ে পরে -- হল কি লাঞ্ছনা।
করিয়ে সুখেরি সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা
বিষম বিবাদী বিধি, প্রেমনিধি মিললো না।
ভাবলাভ আশা করি, মিছে পরের ভাবনা।
সেজে আছি ম্রিয়মান বুঝি প্রাণ রইল না।

এমনকি, "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যেও মধুসূদন ঝুমুর গানের রীতিকেই সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন দেখা যায়। একদিকে আধ্যাত্মিকতা বর্জিত নিছক লৌকিক রাধাকৃষ্ণ প্রেম, অন্যদিকে ভাষা, ছন্দ, উপস্থাপনার ক্ষেত্রে লোকগীতির ঝুমুরের রীতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। এখানে লৌকিক ঝুমুর গান তুলে ধরে সাদৃশ্য রাখছি -- "ব্রজাঙ্গনা" কাব্যের 'বংশীধ্বনি' কবিতার বিষয়বস্তু ও রচনা রীতির সঙ্গে সাযুজ্যের মূলগত কোনো প্রভেদ নেই। লৌকিক ঝুমুর গানটি যেমন —

অমন বাঁশি ফুকতে তারে বারণ কর গো সহচরি,
মরি মরি হায়, আর গৃহে রহা দায় গো,
সদা বাজে, বাজে হৃদয় মাঝে
জ্বালা অবলা পরাণে সইতে নারি
প্রাণের বেদন প্রাণে জানে,
বলেঁ কি জানাবো আনে গো
নহি-কুলবতী নারী
ওহো গুমবি গুমরি প্রাণে মরি মরি।
রান্নাশালে কান্নার জল
পোড়া নারীর এই ত বল গো।
দুর্যোধনা কবে তা হবার নহে
গৃহে দুরন্ত শ্বাশুড়ী ননদী বৈরী।
(পুরুলিয়া চড়িদা গ্রাম থেকে সংগৃহীত)

"ব্রজঙ্গনা" কাব্যের 'বংশীধ্বনি' কবিতায় অনুরূপ বিষয়বস্তুর ভাবসাদৃশ্য ও রচনা রীতি লক্ষ্য করা যায় —

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
মৃদুমৃদু স্বরে নিকুঞ্জ বনে,
নিবার উহারে শুনিত ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে,
এ আগুনে কেনে আহুতি দান?
অমনি পারে কি জ্বালাতে প্রাণ?

এমনকি, গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদ প্রসাদের হাত হয়ে যে বাংলা নাটক এক নতুন গতি পেয়ে বাংলা নাটকের এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে, --- তাঁদের নাটকেও ঝুমুর গান অনায়াসভাবে ঢুকে পড়েছে কখনো গীত আকারে, কখনো বা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গানের আকারে। গিরিশচন্দ্রের নাটকে ঝুমুর গান লক্ষ্য করা যায় নিছক লৌকিক প্রেমের মধ্যে——

প্রাণময়, প্রাণনাথ আমার
ব্যথা কারো দিলে প্রাণে বাজে ব্যথা তাঁর।
ব্যথা পেয়েছ প্রাণে, প্রাণে বসে প্রাণনাথ জানে,
চাওরে ব্যথিত তাঁর বদন পানে,
প্রেম বিনা কি নেভে জ্বালা,
জ্বালিবে হৃদয় কমল ঢাললে তার গরল,
কোমল কমল শুকিয়ে যাবে,
তার পূজা হবে না আর।

আবার, 'রঙ ঝুমুর' গীত বলে ঝুমুর গানে যে গীত আছে --- যা সাধারণতঃ নাচনী ও রসিক দুজনে মিলে নৃত্য সহযোগে প্রশ্ন ও উত্তর-এর মাধ্যমে গান গেয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। যা অনেকটা কবিলড়াইয়ের মতোন আর কি! সেই 'রঙ ঝুমুর' গীতের প্রচ্ছন্ন প্রভাবই গিরীশচন্দ্রের নাটকে লক্ষ্য করা যায়। গিরিশচন্দ্র সম্ভবত বুঝেছিলেন — বাঙালী জনমানসে ঝুমুর গানকে বাদ দিয়ে সেযুগে নাটকে গীতিরস সঞ্চালন করা মানে আত্মহত্যার সামিল। বরং এভাবে বলা যেতে পারে, ঝুমুর গানের লিরিক্যাল দিকটি ও গানের কথার মধ্যে এক ধরনের নাটকীয়তা গিরিশচন্দ্রকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এ কারণে তিনি তাঁর নাটকে গীতগুলির উপস্থাপনা কালে ঝুমুর গানকে সচেতনভাবেই গ্রহন করেছিলেন। কখনো সরাসরি ভাবে গীত আকারে, কখনোবা প্রশ্নোত্তরে গানের মাধ্যমে। গিরিশচন্দ্রের মতোন ক্ষীরোদপ্রসাদও ঝুমুর গানের রীতিকে গ্রহণ করেছেন সচেতনভাবেই। "আলিবাবা" নাটকের কথোপকতনে

।। লক্ষণীয়.— বিশেষ করে ২য় দৃশ্যের ১ম অঙ্কেই কটি পংক্তিতে যা স্পষ্ট নজরে আসে—

আয় — আয় বাঁদী তুই বেগম হবি,
খোয়াব দেখেছি;
আমি বাদশা বনেছি,

বলতে কুণ্ঠা নেই, ঝুমুর গান বাংলা নাট্যসাহিত্যেতো বটেই, এমনকি বাংলা ছড়ার জগতেও কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো অপ্রত্যক্ষভাবে ঢুকে পড়েছে। ঝুমুর গানকে এ কারণে বাংলা সাহিত্যজগতের একটি আদি ও চিরন্তন প্রাণবীজ রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যে বীজ পরবর্তীকালে আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্যগানে ঢুকে পড়ে, মহীরুহ রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। এবং তা এক নতুন আলোময় দীপ্তির বর্ণচ্ছটায় রাঙিত হয়ে নতুন উজ্জ্বলতার দীপ্তিতে। তা সচেতনভাবেই হোক, বা অচেতনভাবেই হোক — তাঁদের দুজনার সৃষ্ট সাহিত্যভাবনালোকে ঝুমুর গানের বীজ যে ঢুকে পড়েছে তা বোঝা যায় তাঁদের সাহিত্যের মগ্নপাঠে। রবীন্দ্রনাথের "গীতবিতান"-এ বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। হয়তো তেমন তীব্র নয়, ক্ষীণ আভাস আছে।

তাছাড়া, রবীন্দ্রগানে ঝুমুর গানের সুরের মতোন এক নাটকীয় ঝংকার যে আছে, তা রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে একটু সচেতনভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। আর একটা কথা বলা বোধকরি সমীচীন হবে, ঝুমুর গানের লিরিক-মেজাজটি যে রবীন্দ্রনাথ অধিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর কাব্যভাণ্ডারের দিকে তাকালে। শব্দ যেন তাই তাঁর সৃষ্ট কাব্যে সবসময় সঙ্গীতের মতোন, পাঠে পাঠকের হৃদয়ে গুণ্ গুণ্ করে।

ঝুমুর গান, বিশেষ করে তার লিরিক-মেজাজটির জন্য ও প্রতীকী ব্যঞ্জনায় অলংকৃতের জন্য বলা যায় আজো আধুনিককালের জনসমাজে আদরনীয়।